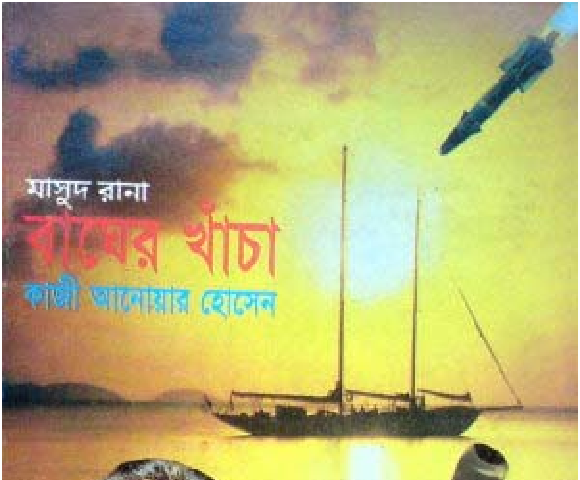

মাসুদ রানা
বাঘের খাঁচা
কাজী আনোয়ার হোসেন

মাসুদ রানা

বাঘের খাঁচা

কাজী আনোয়ার হোসেন

এক

মনটা যেন ময়ূর, সে-ময়ূর পেখম তুলে নাচছে।

এই উল্লাস আর পুলক অকারণ নয়। দীর্ঘ বহু বছর শিকল ভাঙার পরম যে আকাঙ্ক্ষাটি সুপ্ত ছিল অন্তরে, সেটি এতদিনে পূরণ করতে পেরেছে সে, নিজেকে তাই নোঙর ছেঁড়া তরী বা সুতো কাটা ঘুড়ির মত লাগছে, পুরোপুরি ‘লক্ষ্মীছাড়া হতে পেরেছি’ ভেবে আনন্দে আত্মহারা। লক্ষ্মীছাড়া হওয়া নিষিদ্ধ, কিন্তু নিষেধের বেড়া ভাঙতেই তো রোমাঞ্চ।

লক্ষ্মীছাড়া মাসুদ রানা এখন নিজেকে নিয়ে কি করবে তাই ভেবে দিশেহারা।

ইচ্ছা জাগলেও, কাঁচাপাকা দুই ভুরুর নিচে তীক্ষ্ণ দুটি চোখের সজাগ, সতর্ক দৃষ্টি যে ওকে সারাক্ষণ নজরবন্দী করে রাখে, তা থেকে নিজেকে আড়াল করা কিছুতেই সম্ভব নয়–যেখানেই যাক ও, যত দূরেই যাক, কঠিন-কোমল একজোড়া চোখ ওকে অনুক্ষণ যেন অনুসরণ করে বেড়ায়, ছুটিতে থাকলেও বলে যেতে হয় কোথায় যাচ্ছে বা কোথায় ওকে পাওয়া যাবে। সেই অলঙ্ঘনীয় নিয়ম ভেঙেছে ও, ভেঙেছে পিতৃপ্রতিম প্রবাদপুরুষটির মুহূর্তের দুর্বলতা বা অসাবধানতার সুযোগে।

মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খানের নির্দেশেই মেডিকেল বোর্ড গঠন করা হয়েছিল। রুটিন চেক-আপ ধরে নিয়ে

তেমন গুরুত্ব দেয়নি রানা, ডাক্তারদের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট সেরে একটা অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে চলে এসেছিল দক্ষিণ আমেরিকায়। কাজ শেষ হতে একটা ছুটির দরখাস্ত ফ্যাক্স করে পাঠিয়ে দিল ঢাকায়, আর তারপরই বসের টেলিফোন এল—'মেডিকেল বোর্ড রায় দিয়েছে, টেনশন-ফ্রী ছুটি দরকার তোমার। ছুটি মঞ্জুর করা হলো—জবাবদিহি লাগবে না, যেখানে খুশি যাও, যা খুশি করো।'

'ইয়েস, স্যার! থ্যাঙ্ক ইউ, স্যার!' বলে চিৎকার করতে ইচ্ছে হয়েছিল, কোন রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে তার বদলে বলল, 'জ্বী, ঠিক আছে, স্যার।' তারপরও, যতক্ষণ লাইনে ছিল, একটা ভয়-ভয় ভাব কাবু করে রেখেছিল ওকে, ঘোড়েল বুড়ো এই বুঝি বেয়াড়া কোন শর্ত জুড়ে দিয়ে সদ্য দান করা স্বাধীনতা নিল কেড়ে। যা খুশির মানে এই নয় যে অলঙ্ঘনীয় নিয়মগুলো ভাঙো, শুধু এই কথাটা মনে করিয়ে দিলেই তো সর্বনাশের আর কিছু বাকি থাকত না।

প্লেনে চড়ে দক্ষিণ আমেরিকা থেকে উত্তর আমেরিকায় চলে এল রানা, হারিয়ে গেল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। ও যে এখন ফ্লোরিডার মায়ামিতে, পরিচিত কাকপক্ষীটিও সে খবর জানে না। তবে রানা নিজেও কি জানে যে ওর অবচেতন মনই এখানে ওকে টেনে এনেছে? এমনকি, অবচেতন মনটাকেও যে সেই ঘুঘু বুড়ো নিজস্ব কৌশলে নিয়ন্ত্রণ করছেন, এ-ব্যাপারেও কি রানা এই মুহূর্তে সচেতন? মনে হয় না।

ওর সামনে একদল শিশু-কিশোর, এক ফেরিঅলাকে ঘিরে সুতো পেঁচানো লাটাই আর রঙিন ঘুড়ি কিনছে। ওদেরকে পাশ কাটিয়ে এল, ভাবছে, হোটেল থেকে সুইমিং ট্রাঙ্কস নিয়ে বেরুলে আটলান্টিকে কিছুক্ষণ সাঁতরানো যেত।

এই মুহূর্তে আনন্দে প্রায় দিশেহারা ও, দু'চোখের সামনে যা

দেখছে তাই ভাল লাগছে–দীর্ঘ পামবীথিকা, সৈকতের চিকচিকে বালি, সী-গাল, সোনালি ডানার গাঙচিল, কচি রোদ, নীল আসমান, সাদা মেঘ, রৌদ্র ও সমুদ্রস্নানে মত্ত লোকজন, প্রায় বিবসনা নারীর দেহসৌষ্ঠব।

অকস্মাৎ কি যেন একটা মুহূর্তের জন্য ঢেকে দিল সূর্যটাকে, ছায়া পড়ল চোখে।

আকাশে তাকাতেই লম্বা লেজঅলা ঘুড়িটাকে লাটিমের মত দ্রুত পাক খেতে দেখল রানা, সূর্যটা ঢাকা পড়ছে বারবার। তারপর, অন্যরকম এক পাগলামি শুরু করল–গোত্তা খেলো ঘুড়ি। পড়বি তো পড় সরাসরি সাগরে। সুতো অনুসরণ করে ওর দৃষ্টি ফিরে এল ছয় কি সাত বছরের এক ছেলের ওপর।

বোকা হয়ে গেছে ছেলেটা, হাঁ করে ডুবন্ত ঘুড়িটার দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ, তারপর ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

মায়া হলো রানার–এ যেন আত্মপ্রেমই, অবচেতন মনের কোনও এক গোপন ঘুপচিতে বোধহয় লুকিয়ে আছে বালক মাসুদ রানার এই একই ক্ষোভ ও বেদনা। এগিয়ে গিয়ে ছেলেটার মাথায় হাত বুলিয়ে ফেরিঅলাকে ডাকল ও। হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে চোখ মুছল ছেলেটা, নতুন ঘুড়ি পেয়ে খুশি আর ধরে না।

বালিতে হাঁটু গেড়ে ঘুড়িটায় সুতো বেঁধে দিল রানা। তারপর ওটাকে ওড়াবার চেষ্টায় শুরু হলো মজার এক খেলা–রানা ঘুড়ি নিয়ে সরে গেল কয়েক গজ, ছেলের হাতে লাটাই–চলল ঘুড়িটা আকাশে তোলার চেষ্টা। রানা ছেড়ে দিলেই সুতোয় টান দেবে ছেলেটা, কিন্তু টাইমিং ঠিক হচ্ছে না দুজনের। শেষপর্যন্ত ঘুড়িটা যখন আকাশে উঠল, খিলখিল করে হাসছে ছেলেটা; রানার মনে হলো যেন হাসছে ওর নিজের বুকের ভিতরটাই। এই সময় ছুটে এলেন গাউন পরা, মোটাসোটা এক বৃদ্ধা; চোখে মোটা ফ্রেমের

চশমা, এক হাতে স্বচ্ছ কাগজে মোড়া স্যান্ডউইচ, বাঁধানো দাঁতে সোনালি দ্যুতি। ছেলেটার নানী বা দাদী হবেন।

'লেমন! ভদ্রলোককে বিরক্ত করে না,' বৃদ্ধার পিছন থেকে বিকিনি পরা এক তরুণী নরম সুরে শাসন করল ছেলেটাকে। রানা তাকাতে চোখাচোখি হলো, লালচে ঠোঁটে হাসি ফুটল ক্ষীণ।

'না কোরো না, বাপ,' বলে রানার হাতে স্যান্ডউইচটা গুঁজে দিলেন বৃদ্ধা। 'আমার নিজের তৈরি।' রানার দৃষ্টি তরুণীর ওপর স্থির হয়ে আছে দেখে হেসে উঠে আবার বললেন, 'ওর মা, আমার মেয়ে...'

তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিল রানা, যেন কোন অপরাধ করে ফেলেছে। 'অসংখ্য ধন্যবাদ,' বলে মোড়ক খুলে স্যান্ডউইচের ঘ্রাণ নিল। 'উফ্, দারুণ তো!' সেটায় একটা কামড় বসিয়ে মাথা নুইয়ে সম্মান জানাল বৃদ্ধাকে, তারপর ঘুরে হাঁটা ধরল ফেরিঅলার দিকে, বাকি পয়সা ফেরত নেবে।

শিশু-কিশোরদের ভিড় ঠেলে এগোতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে রানা। ওকে দেখে ফেরিঅলা পয়সা গুনছে। এই সময় আবার সেই বিকিনি পরা তরুণীর কণ্ঠস্বর ভেসে এল পিছন থেকে, এবার রীতিমত তীক্ষ্ণ ও ঝাঁঝাল। 'লেমন, এবার তুমি সত্যি মার খাবে!'

প্রথমে ঘাড় ফেরাল, তারপর ঘুরে দাঁড়াল রানা। নাতিকে ছেড়ে ইতিমধ্যে মেয়ের দিকে অনেকটা এগিয়ে গেছেন বৃদ্ধা। তরুণী শুয়েছিল তোয়ালের ওপর, এই মুহূর্তে বিব্রত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে। নতুন ঘুড়িটার দিকে তাকাল রানা, মতিগতি দেখে মনে হলো এটারও সলিল সমাধি ঘটতে পারে। সুতো অনুসরণ করে ছেলেটার হাতে ধরা লাটাইয়ের দিকে ফিরে আসছে ওর দৃষ্টি, মাঝপথে আটকে গেল। নিজের পথে হাঁটছিল, থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে নীল সুট পরা প্রকাণ্ডদেহী এক যুবক—বুকের

সামনে সুতো, তার পথরোধ করেছে।

প্রাণপণ চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত ঘুড়িটাকে সামলে নিল লেমন, সাগরকে নিচে ফেলে আবার আকাশে উঠতে শুরু করল সেটা, তাই দেখে খিলখিল করে হেসে উঠল সে। ওই হাসির শব্দেই তার দিকে ফিরে তাকাল যুবক। পরমুহূর্তে লাফ দিয়ে সুতোটা ধরল, দু'হাতের হ্যাঁচকা টানে ছিঁড়ল ওটা, তারপর ছেড়ে দিল–অবাধ স্বাধীনতা পেয়ে কয়েক সেকেন্ড বেহেড মাতলামি করল ঘুড়ি, তারপর সাগরে পড়ে হারিয়ে গেল।

মনটা কি এক দুঃখে গুমরে উঠল রানার। তবে একই সঙ্গে ওর যেন একটা অন্তর্দৃষ্টি খুলে গেছে। নিয়ন্ত্রণহীন স্বাধীনতা কি করুণ পরিণতি ডেকে আনতে পারে, ঘুড়িটা যেন তারই প্রমাণ রেখে গেল। তারপর আবার ওর দৃষ্টি কেড়ে নিল বিশালদেহী যুবক।

লেমনের অসহায়, করুন মুখ, তার মায়ের হতচকিত ভাব, বৃদ্ধার মুখ থেকে নিভতে শুরু করা হাসি, কিছুই ওর চোখে পড়ল না–একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে প্রকাণ্ডদেহীর দিকে। তার প্রতিটি নড়াচড়ায় বেপরোয়া উদ্ধত ভাব, সরল একটা রেখা ধরে সৈকত থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে, সামনে কেউ পড়লে না থেমে ধাক্কা দিয়ে পথ করে নিচ্ছে। মুখটা দেখার পর থেকে স্থির হয়ে গেছে রানা, মনের ভেতর বেজে উঠেছে সতর্ক সংকেত।

মালুই সুকায়া এখানে কি করছে? একটু চেষ্টা করতেই মনে পড়ল, তার আরেকটা নাম আছে–মুড়া রত্নাকর। তামিল টাইগার গেরিলা বাহিনীর একজন দুর্ধর্ষ কমান্ডার লোকটা। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ, লাওস আর কম্বোডিয়া থেকে অস্ত্র, গোলাবারুদ আর মাদকদ্রব্য কিনে সড়কপথে থাইল্যান্ডে আনে, সেখান থেকে জাহাজে তুলে আন্দামান সাগরের মনুষ্যবিহীন দ্বীপ ল্যান্ডফল ও বাংলাদেশের সেন্ট মার্টিন দ্বীপে জমা করে। অস্ত্র ও গোলাবারুদ

কিছু তুলে দেয় বাংলাদেশী একটা মৌলবাদী গোষ্ঠির ক্যাডার আর রোহিঙ্গা সন্ত্রাসী ক্রেতার হাতে, বাকি সব চালান দেয় টাইগারদের নিজস্ব ঘাঁটিতে। ভারতীয় এক জাতীয় দৈনিকে মালুই সুকায়ার ছবি সহ একটা রিপোর্ট ছাপা হয়েছিল, এ-সব তথ্য সেই রিপোর্ট পড়েই জেনেছে রানা।

মনোযোগ ছুটে গেল ফেরিঅলার ডাকে। 'স্যার, নিন, আপনার...'

'রাখো।' ফেরিঅলার বাড়ানো হাতটাকে পাশ কাটিয়ে সুকায়ার পিছু নিল রানা।

'স্যার!' ফেরিঅলা হতভম্ব।

ইশারায় লেমনকে দেখিয়ে দিল রানা। 'বাকি পয়সায় যে-ক'টা ঘুড়ি হয় বাচ্চাটাকে দিয়ে এসো।' লোকজনের ভিড়টাকে আড়াল হিসেবে কাজে লাগিয়ে সাবধানে এগোচ্ছে ও, দেখতে চায় মালুই সুকায়া ওরফে মুড়া রত্নাকর কোথায় যায়, তার কোন সঙ্গী আছে কিনা। হঠাৎ ছ্যাঁৎ করে উঠল বুকটা। সুকায়া যেমন চওড়া হাতি, তার সঙ্গী তেমনি লম্বা জিরাফ। লোকটার পরনে সৌদি নাগরিকদের প্রিয় পোশাক, মাথা ও মুখের দু'পাশ ঢাকা সাদা আলখেল্লা। এক হাতে তসবি, অপর হাতে মোবাইল ফোন, পায়ের দু'পাশে দুটো ব্রিফকেস। চিবুকের কালো দাড়িতে হাত বুলিয়ে সুকায়াকে কি যেন বলল সে। লোকটাকে চেনে রানা, কিন্তু কোথায় দেখেছে বা কি পরিচয় মনে করতে পারছে না। রাজাকার নয়, কারণে বয়সে মেলে না। ধর্মান্ধ কোনও রাজনৈতিক দলের ক্যাডার? উঁহুঁ, তাও নয়। তারপর হঠাৎ করেই মনে পড়ল। মুসলিম ব্রাদারহুড নামে নতুন একটা তালেবান অনুসারী মৌলবাদী গোষ্ঠি মাথাচাড়া দিয়েছে বাংলাদেশে, সেই গোষ্ঠির এক নেতা হারিস মোহাম্মদ, এ হলো তার ছেলে আমান মোহাম্মদ।

এককালের রাজাকার হারিস মোহাম্মদ সম্প্রতি বাংলাদেশের রাজনীতিতে বিষফোঁড়া হয়ে উঠেছে। তার সঙ্গে মিয়ানমার-এর নাসাকা বাহিনী, রোহিঙ্গা সন্ত্রাসী গ্রুপ, পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই ও ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠি 'উলফা'-র গোপন সম্পর্ক এখন ওপেন সিক্রেট। তবে হারিস মোহাম্মদের সঙ্গে তামিল টাইগারদের সরাসরি সম্পর্ক আছে, এরকম কোন তথ্য রানার জানা ছিল না। এখন বুঝল, নিশ্চয়ই আছে, তা না হলে তার ছেলে আমান মোহাম্মদ মালুই সুকায়ার সঙ্গে মায়ামিতে কি করছে? দু'জনকে প্রায় একযোগে ঘাড় ফেরাতে দেখল রানা। তারপর দু'জনেই হেসে উঠল। তাদের হাসিতে যোগ দিল তৃতীয় এক লোক। একে রানা চেনে না। প্রথমদর্শনেই মনে হলো, সুট পরা ব্রুট। ফর্সা লোকটা; লালচে চোখ; খুলিসাঁটা, চ্যাপ্টা কান; ঠোঁট মুড়লেও ওপরসারির দাঁত পুরোপুরি ঢাকা পড়ে না। ইঁদুরের মত সরু ফর্সা মুখে অসংখ্য কালো দাগ। সম্ভবত ছোটবেলায় ভুগেছে, দুনিয়ার বুক থেকে গুটিবসন্ত যখন নিঃশেষ হয়নি। হাসতে হাসতেই রওনা হলো তিনজন, পাম গাছের নিচ থেকে যাচ্ছে পার্কিং লটের দিকে। ওরা কেউ ওকে চেনে কিনা জানা নেই, তাই অত্যন্ত সাবধানে পিছু নিল রানা। সেই সঙ্গে প্রশ্নকর্তা ও উত্তরদাতা, মনটা দু'ভাগে ভাগ হয়ে রহস্যময় আলাপ জুড়ল।

'লক্ষণ সুবিধের মনে হচ্ছে না। জানতে পারি, জনাব, কি করছ তুমি?'

'ঢেঁকি স্বর্গে গিয়েও ধান ভানে।'

'দুঃখিত, ঠিক বুঝলাম না। স্বাধীনতা চেয়েছিলে, কিন্তু এখন তো দেখা যাচ্ছে নিজেই নিজের স্বাধীনতা হরণ করছ! শিকল ভাঙার সেই উল্লাস আর পুলক, মিথ্যে হয়ে গেল সব?'

'নিয়ন্ত্রণহীন স্বাধীনতায় উল্লাস আর পুলক যতই থাক, তা ম্লান হয়ে যায় দেশের বিরুদ্ধে গভীর কোন ষড়যন্ত্র আবিষ্কারের কৃতিত্বের কাছে। আমি সেই কৃতিত্ব অর্জনের সুযোগ খুঁজছি।'

'নিজের হাতে লাগাম ধরে রেখে বস্ তাহলে ঠিক কাজটিই করেন?'

'আমার চোখ খুলে দিয়েছে লেমনের ঘুড়ি। সুতো ছেঁড়ার পর ওটা মাতলামি শুরু করেছিল। পরিণতিও দেখেছি, কাজেই অধিক মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। বস্? আমাদের বস্ প্রতিটি নিয়মের ভবিষ্যৎ পরিণতি দেখতে পান–তাঁর আছে তৃতীয় একটি নয়ন।'

আড়াল থেকে বেরুতে হলো রানাকে, কারণ পার্কিং লটটা ফাঁকা জায়গায়। ওখানে আগে থেকেই একটা ট্যাক্সি অপেক্ষা করছিল, আমান মোহাম্মদ তার দুই সঙ্গীকে নিয়ে ওটার পাশে থেমেছে। নিজেদের মধ্যে আলাপ করছে ওরা। কি নিয়ে কথা হচ্ছে জানার বিনিময়ে নিজের মানিব্যাগ খোয়াতে রাজি আছে রানা। আশপাশে আর কোন ট্যাক্সি নেই দেখে অস্থিরতা অনুভব করল ও। পাশেই একটা বুকস্টল, তাড়াতাড়ি একটা কাগজ কিনল।

তিনজনকে পাশ কাটাবার সময় খবরের কাগজ পড়ার ভান করছে রানা। শুনতে পেল মালুই সুকায়া তামিল ভাষায় বলছে, 'কলম্বো বাতাসে মিলিয়ে যাবে...'

'শেষ পর্যন্ত আল্লাহ যদি মুখ তুলে তাকান, সত্যি যদি ট্রিপলহেডার হাতে পাই, ইনশাল্লাহ আমার প্রথম দুটো টার্গেট হবে শহীদমিনার আর স্মৃতিসৌধ,' ভাষাটা বাংলা, অর্থাৎ কথা বলছে আমান মোহাম্মদ। 'আর যেখানে যত ভাস্কর্য আর মূর্তি আছে, ইস্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়, সব গুঁড়িয়ে দেব। আমীর হবেন আব্বাজান, আমরা হব তালেবান, আমি...'

তারপর সুট পরা ব্রুট শুরু করল, 'ট্রিপলহেডার হাতে পেলে

রোহিঙ্গারা...'

'ট্রিপলহেডার' শব্দটা রানার মনের ভেতর যেন একটা সুইচ অন করল, সঙ্গে সঙ্গে বিসিআই হেডকোয়ার্টার ঢাকায় ফিরে গেল ও। মাত্র দু'হপ্তা আগের ঘটনা। দৃশ্যটা এখনও চোখের সামনে জ্বলজ্বল করছে। বস্ ওকে পরবর্তী অ্যাসাইনমেন্ট সম্পর্কে ব্রিফ করার জন্যে নিজের চেম্বারে ডেকেছেন। ভেতরে ঢুকে রানা দেখল চেম্বারে আগে থেকেই বসে আছে বিসিআই-এর অন্যতম দুর্ধর্ষ এজেন্ট সাযযাদ। সাযযাদকে দেখে প্রথমে ও ভাবল, এবারের অ্যাসাইমেন্টে সম্ভবত দু'জনকে একসঙ্গে পাঠানো হবে। কিন্তু বসের কথা শুনে ওর ভুল ভাঙল। বস্ বললেন, 'বসো, রানা। ওকে ওর কাজটা আরেকটু বুঝিয়ে দিই, তারপর তোমার সঙ্গে কথা বলব।'

'সঙ্গত কারণেই একটু অবাক হলো রানা, কারণ সাধারণত একজনের উপস্থিতিতে আরেকজনকে ব্রিফ করা হয় না। যাই হোক, একটা চেয়ার টেনে বসার পর সাযযাদকে বস্ কি বলছেন কান পেতে শুনল ও। খুব বেশি কিছু জানার সুযোগ হলো না, কারণ বস্ ব্রিফিঙের প্রায় শেষ পর্যায়ে ছিলেন। শুধু কয়েকটা শব্দ গেঁথে গেল রানার মনে—বাংলাদেশী বিজ্ঞানী সৈয়দ মনিরুল হক, গার্ডস করপরেশনের মালিক লুকাস ডেভেনপোর্ট, ট্রিপলহেডার, নাসা, লেটিস আইল্যান্ড ইত্যাদি। মূল বিষয়, অর্থাৎ সাযযাদের অ্যাসাইনমেন্টটা কি, তা কিন্তু অজানাই থেকে গেল। বসের কথা শেষ হতে বিদায় নিয়ে চলে গেল সাযযাদ। কোন প্রশ্ন করার সুযোগ না দিয়ে রানাকে ব্রিফ করতে শুরু করলেন বস্।

এই মুহূর্তে, পার্কিং লট থেকে বেরিয়ে এসে রাস্তা পেরুল রানা। উদ্বেগ আর উত্তেজনায় ঘেমে গেছে শরীর। সাযযাদকে যে বস্ এদিকেই পাঠিয়েছেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ওর সামনে তাকে ব্রিফ করাটাও এখন কেমন যেন তাৎপর্যময় বলে মনে হচ্ছে। যত

তাড়াতাড়ি সম্ভব ঢাকায় ফোন করে বসের সঙ্গে কথা বলা দরকার। একটা ট্যাক্সি আসতে দেখে হাত তুলল। ড্রাইভার থামতে নিজেই দরজা খুলে উঠে বসল ব্যাকসীটে, আপনমনে বিড়বিড় করছে, ‘ট্রিপলহেডার…ট্রিপলহেডার…কি হতে পারে জিনিসটা?’

‘আমাকে বলছেন?’ মিটার অন করে জিজ্ঞেস করল ড্রাইভার। ‘ট্রিপলহেডার স্রেফ একটা গডড্যাম মনস্টার, স্যার—অভিশপ্ত দানব। তবে আজকের টাইমস-এ দেখলাম গর্ভযন্ত্রণা আদৌ শুরু হবে কিনা তা নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। দেখবেন, স্যার, আমি বলছি…’

রানা বুঝতে পারল, কাকতালীয় কিছু একটা ঘটছে। ইঙ্গিতে পার্কিং লটটা ড্রাইভারকে দেখিয়ে বলল, ‘আমার বন্ধুরা রওনা হলে তুমি ওদের সঙ্গে সঙ্গে থাকবে।’

তিনজনের দলে আরও একজন লোক এসে জুটল। এই লোকটা শ্বেতাঙ্গ, স্মার্ট এক তরুণ, পরনে বাদামী সুট। সবার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করল সে, একটু পরই ট্যাক্সিতে চড়ল সবকয়জন। ওদের ট্যাক্সির পিছু নিল রানার ড্রাইভার। রানা ধারণা করল, নিজেদের হোটেলে ফিরছে ওরা। ওর ধারণা মিথ্যে প্রমাণিত করে ট্যাক্সি থামল এয়ারপোর্টের সামনে। ভাড়া মিটিয়ে টার্মিনাল ভবনে ঢুকল ও, দেখল একটা কাউন্টার থেকে কি যেন সংগ্রহ করল আমান মোহাম্মদ। কাউন্টারের মাথায় প্লাস্টিক হরফে লেখা রয়েছে—‘প্রাইভেট এয়ারলিফট’। আমানের পিছু নিয়ে ডিপারচার লাউঞ্জে ঢুকে পড়ল তার সঙ্গীরা।

ডিপারচার লাউঞ্জের উল্টোদিকে এক সারিতে কয়েকটা ফোন বুদ দেখা যাচ্ছে, একটার গায়ে লেখা—‘ডিরেক্ট ওভারসীজ’। সেটায় ঢুকে স্লট-এ কার্ডটা গুঁজে দিয়ে ঢাকার আনলিস্টেট একটা নাম্বারে ডায়াল করল ও। এটা রাহাত খানের প্রাইভেট নাম্বার,

চেষ্টা করলেও কেউ ট্রেস করতে পারবে না।

অপরপ্রান্তে সরাসরি রাহাত খান রিসিবার তুললেন। ‘হ্যালো।’

‘স্যার, আমি রানা, মায়ামি এয়ারপোর্ট থেকে বলছি...’

‘হ্যাঁ, বলো।’

‘স্যার, বিশেষ একটা কারণে আপনাকে ফোন করছি। এখানে শ্রীলঙ্কা আর বাংলাদেশের কয়েকজন সন্ত্রাসীকে একসঙ্গে ঘোরাফেরা করতে দেখছি, মনে হচ্ছে খারাপ কি যেন একটা মতলব আছে ওদের...’

‘যা বলার সংক্ষেপে বলো,’ মৃদু ধমক দিলেন রাহাত খান। ‘এই লাইনে বেশিক্ষণ কথা বলা নিরাপদ নয়।’

‘ট্রিপলহেডার জিনিসটা কি, স্যার?’ সরাসরি জানতে চাইল রানা।

‘কেন জানতে চাইছ?’ পাল্টা প্রশ্ন করলেন রাহাত খান।

‘ওদেরকে বলতে শুনলাম ট্রিপলহেডার হাতে পেলে আমাদের স্মৃতিসৌধ আর শহীদ মিনার উড়িয়ে দেবে। আমার মনে পড়ে গেল সাযযাদকে ব্রিফ করার সময় ট্রিপলহেডার সম্পর্কে কি যেন বলছিলেন আপনি। তাই জানতে চাইছি, সাযযাদ এখন কোথায়, স্যার?’

‘সে মারা গেছে,’ রাহাত খান বললেন, কণ্ঠস্বরে চাপা ক্রোধ। ‘লেটিস দ্বীপে খুন করা হয়েছে তাকে।’

প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেলো রানা। ‘স্যার! সাযযাদ...খুন হয়েছে?

‘সেটাই ধরে নিতে হচ্ছে আমাকে,’ বললেন রাহাত খান। ‘প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করার কথা ছিল তার। কিন্তু আজ সাতদিন হলো কোন সাড়া নেই।’

‘কি ঘটল জানার জন্যে বিসিআই আর কাউকে পাঠাচ্ছে না?’

জিজ্ঞেস করল রানা।

'এজেন্টরা হয় কোন না কোন অ্যাসাইনমেন্টে ব্যস্ত, নয়তো তোমার মত ছুটিতে আছে–কাজেই এখুনি কাউকে পাঠাতে পারছি না।'

'স্যার, আমি যাব?'

'যেতে চাও ভাল কথা,' রাহাত খান বললেন, 'কিন্তু বিসিআই বা রানা এজেন্সি তোমাকে কোন রকম সাহায্য করতে পারবে না। গোটা ব্যাপারটা নাসা অথবা পেন্টাগনের অভ্যন্তরীণ জটিলতা বা দ্বন্দ্ব বলে সন্দেহ করছি আমি, কাজেই এর সঙ্গে অফিশিয়ালি আমরা জড়াব না।'

'ঠিক আছে, বুঝতে পারছি,' বলল রানা। 'তবে কোন ক্লু বা আইডিয়া পেলে ভাল হয়।'

'সাযযাদ নিশ্চয়ই কোথাও কোন ভুল করেছে,' বললেন রাহাত খান। 'সেটা কি না জেনে তোমাকে ব্রিফ করা সম্ভব নয়, তাতে হিতে বিপরীত ঘটতে পারে। লেটিস আইল্যান্ডে কিছু একটা ঘটছে, এর সঙ্গে গর্ডেস করপরেশন জড়িত থাকতে পারে–ব্যস্, এইটুকুই জানি আমরা। কাজটা যদি নিতে চাও, সব নিজের চেষ্টায় জেনে নিতে হবে তোমাকে।'

একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল রানা। 'ঠিক আছে, স্যার।'

'গুড লাক, মাই বয়,' বলে যোগাযোগ কেটে দিলেন রাহাত খান, রানার কানে স্নেহ ও আন্তরিকতার সুরটা তারপরও অনেকক্ষণ লেগে থাকল।

টেলিফোন বুদ থেকে বেরিয়ে ডিপারচার লাউঞ্জের দিকে পা বাড়িয়েছে রানা, নারীকণ্ঠের হাসি শুনে ঘাড় ফেরাল।

'খেলোয়াড় নাকি, স্যার?' ক্ষুধার্ত ভাব নিয়ে কাউন্টারে বসা তরুণী প্রায় নির্লজ্জের মত হাসছে, প্রশংসার দৃষ্টি বুলাচ্ছে রানার

পা থেকে মাথা পর্যন্ত বারবার। 'বিনা টিকিটে ডিপারচার লাউঞ্জে ঢুকলে জরিমানা দিতে হবে যে!' রানা সামনে এসে দাঁড়াতে একটা হাত বাড়াল। 'আমি পলি, মি...?'

হাতটা দেখতে না পাবার ভান করে মানিব্যাগ থেকে বিশ ডলারের একটা নোট বের করল রানা। ওর কিছু তথ্য দরকার, শুনে দ্রুত মাথা ঝাঁকাল তরুণী। হ্যাঁ, এই কাউন্টার থেকে প্রাইভেট প্লেনে ওঠার বোর্ডিং পাস আর ডিপারচার লাউঞ্জে ঢোকার টিকিট দেয়া হয়। তবে ডিউটির মধ্যে পড়ে না, এমন দু'একটা কাজও এখান থেকে করা হয়। এই যেমন, কয়েকটা ট্র্যাভেল এজেন্সির হয়ে প্লেনের টিকিট বিক্রি। তাতে উপরি কিছু কমিশন পাওয়া যায়। না, এইমাত্র যে চারজন ভদ্রলোক ডিপারচার লাউঞ্জে ঢুকলেন তাঁরা এখান থেকে প্লেনের টিকিট কেনেননি, শুধু ডিপারচার লাউঞ্জে ঢোকার টিকিট কিনেছেন। লেটিস আইল্যান্ডে যাবেন তো, তাই ওদের মধ্যে তিনজনকে একটা করে ফর্মও পূরণ করতে হয়েছে। শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোক লুকাস এয়ারলাইন্সের একজন অফিসার। না, তাঁর সঙ্গী তিনজনকে সে চেনে না। তবে জানে যে ওরা চারজন লুকাস এয়ারলাইন্সের লীয়ার জেটে চড়ে বাহামার নিউ প্রভিডেন্স আইল্যান্ড হয়ে লেটিস আইল্যান্ডে যাচ্ছেন। লেটিস আইল্যান্ড? ওটার মালিক লুকাস ডেভেনপোর্ট। জ্বী? ইনি দুনিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধনী লুকাস ডেভেনপোর্ট কিনা? হ্যাঁ, ইনিই...গার্ডস করপরেশনের মালিক ছিলেন।

রানা জানতে চাইল, 'লেটিস আইল্যান্ডে কি আছে? ওখানে যাবার উপায় কি?'

ইঙ্গিতে রানার হাতের নোটটার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করল তরুণী। 'বিশ ডলার দেখিয়ে সব খবর জানতে চান?' হাসছে না। 'ওটা বদলান।' নোট বদল হতেই হাসিভরা মুখে খই ফুটতে শুরু

করল আবার। 'লেটিস আইল্যান্ড ব্যক্তিগত সম্পত্তি হলেও, লুকাস ডেভেনপোর্ট ওখানে তাঁর পর্যটন ব্যবসা জমিয়ে তুলেছেন। ট্যুরিস্টদের জন্যে দারুণ লোভনীয় একটা রিসর্ট। ওখানে শুধু ওদের প্লেনে চড়েই যাওয়া যায়। বাহামার নিউ প্রভিডেন্স থেকেও উঠতে পারেন আপনি। তবে লেটিস আইল্যান্ড যেতে হলে আগে থেকে লিখিত আবেদন জানাতে হয়। আমরাও আবেদন-পত্র জমা নিই, তারপর অনুমোদনের জন্যে পাঠিয়ে দিই রিসর্ট ম্যানেজার মি. সেল সি সা জুসাইও-র কাছে। দু'একটা বাদে সব আবেদনই মঞ্জুর করা হয়।' থেমে ভুরু ও চোখ নাচাল সে, তারপর আবার বলল, 'ওখানে সাধারণত খেলোয়াড়রাই যায়, এবং প্রায় কেউই একা যায় না, সঙ্গে সঙ্গিনী বা বান্ধবী থাকে—এক বা একাধিক। আপনি বললে আমি ব্যবস্থা করে দিতে...'

'খেলোয়াড় মানে?'

'প্লেবয় আর কি! রহস্য আর মজা হলো...,' রানাকে ভুরু কোঁচকাতে দেখে থেমে গেল তরুণী।

'রহস্য আর মজা বাদ দিন,' বলল রানা, 'কারণ আমি প্লেবয় নই। বরং বলুন ওখানে আমার যাবার ব্যবস্থা করে দেয়া যায় কিনা।' পঞ্চাশের সঙ্গে আরও বিশ ডলার যোগ হলো আঙুলের ভাঁজে।

একটা খাতা টেনে নিয়ে পাতা ওল্টাল তরুণী। 'হপ্তায় দুটো ফ্লাইট, শনি আর বুধবার। আজকের ফ্লাইটে কোন সীট খালি নেই, তাছাড়া আপনি তো আবেদনও করেননি।' খাতা থেকে মুখ তুলল। 'দুঃখিত, আগামী তিনটে ফ্লাইটের সব সীট বুকড্ হয়ে আছে। আপনাকে চোদ্দদিন পর যেতে হবে।' স্পষ্ট বুঝল রানা, মিথ্যে বলছে মেয়েটা, আরও টাকা চায়।

হাতের টাকা ঘন ঘন বদলাতে হয়েছে রানাকে। এবার মানিব্যাগ থেকে কড়কড়ে একশো ডলারের একটা নোট বেরিয়ে

এল। 'ওখানে আমি পরবর্তী ফ্লাইটে যেতে চাই, অর্থাৎ আগামী বুধবারে। সম্ভব কিনা বলুন, তা না হলে সরাসরি লুকাস ট্র্যাভেল এজেন্সিকে রিপোর্ট করব আমি...'

'রিপোর্ট করবেন? আমার বিরুদ্ধে?' মুখ শুকিয়ে গেল তরুণীর। চারদিকে তাকিয়ে দেখে নিল সহকর্মীরা কেউ ওদেরকে লক্ষ করছে কিনা। ডেস্কের এটা-সেটা নাড়াচাড়া শুরু করল, ভুলেও রানার দিকে তাকাচ্ছে না। অবশেষে একটা ফর্ম টেনে নিল। 'আমাকে বিপদে ফেলবেন না, প্লীজ! আপনার নাম বলুন।' এতক্ষণে মুখ তুলে তাকাল, ঠোঁটে কাঁপা-কাঁপা হাসি।

'লিখুন...লিখুন...,' সংকটে পড়ে ইতস্তত করছে রানা। লেটিস আইল্যান্ডে কি ঘটছে বা ঘটবে জানা নেই, কাজেই স্বনামে ওখানে যাওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। মালুই সুকায়া আর আমান মোহাম্মদ সন্ত্রাসী গোষ্ঠির প্রতিনিধি, অস্ত্র আর মাদকদ্রব্যের বেআইনী ব্যবসার সঙ্গে জড়িত, তাদের সঙ্গী সুট পরা ব্রুটও নিশ্চয়ই তাই। সিদ্ধান্ত নিল, ক্রিমিনাল হিসেবে পরিচয় দেয়ার পথ খোলা রাখা দরকার। 'লিখুন, নরেশ বড়ুয়া,' বলল ও। তামিল টাইগার সুকায়া আর জঙ্গি মৌলবাদী আমানের সঙ্গীটি যদি রোহিঙ্গা হয়, ওর তাহলে 'উলফা'-র প্রতিনিধি হতে বাধা নেই। হাতে সময় আছে, রানা এজেন্সির মায়ামি শাখার সাহায্য নিয়ে জাল পাসপোর্ট-ভিসা সংগ্রহ করা কঠিন হবে না।

'ন্যাশনালিটি?'

'ইন্ডিয়ান,' বলল রানা। 'প্রফেশন–জার্নালিস্ট, ই.এন.এ-র নিজস্ব সংবাদদাতা...'

'কি!' একটু চমকাল মেয়েটি।

'ইস্টার্ন নিউজ এজেন্সি, এনা...'

'জানি,' বলে নার্ভাস ভঙ্গিতে হাসল মেয়েটি। 'অবাক কাণ্ডই

বলতে হবে, কারণ খানিক আগে লুকাস ট্র্যাভেলের মি. মারটিন যে তিনজনকে নিয়ে গেলেন তারাও ইস্টার্ন নিউজ এজেন্সির সংবাদদাতা।' রানার দিকে কয়েক সেকেন্ড অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল সে, তারপর জানতে চাইল, 'লেটিস দ্বীপে ভ্রমণের উদ্দেশ্য?'

'কোন উদ্দেশ্য নেই, স্রেফ বেড়াতে চাই।' ফর্মটা নিয়ে সই করল রানা–নরেশ বড়ুয়া।

রানাকে রঙিন কয়েকটা পুস্তিকা দিল মেয়েটি, তাতে লেটিস আইল্যান্ডে রিসর্ট সুযোগ-সুবিধে কি কি পাওয়া যাবে তার ছবি সহ বিস্তারিত বিবরণ দেয়া আছে। আগামী বুধবার সকাল দশটায় ভিসা ও পাসপোর্ট নিয়ে আসতে হবে ওকে, প্লেনের টিকিট এই কাউন্টার থেকেই সংগ্রহ করতে পারবে ও। 'ভাল কথা,' বলল সে, 'লেটিস আইল্যান্ডে কোন রকম অস্ত্র বা বিস্ফোরক নিয়ে যাওয়া সম্পূর্ণ নিষেধ। প্লেনে ওঠার আগে আপনাকে সার্চ করা হবে। আরেকটা কথা, দ্বীপটা দু'ভাগে ভাগ করা–ব্ল্যাকহোল আর ভার্জিন, ভার্জিন থেকে ভুলেও আপনি ব্ল্যাকহোলে যাবেন না।'

'কেন, ব্ল্যাকহোলে কি আছে?'

'সে-কথায় পরে আসছি। আসল কথা, যাওয়া উচিত হবে না। দ্বীপের মাঝখানে একটা লেগুন আছে, লেগুনের ওপারটাকে ব্ল্যাকহোল বলা হয়। লেগুন ছাড়াও পাঁচিল একটা বাধা, তাছাড়া ওয়ার্নিং লেখা নোটিসবোর্ড তো আছেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও বোকার মত দু'একজন লোক ওদিকে যায়, এবং গেলে আর কোনদিন ফেরে না।'

'ফেরে না মানে?'

'আপনাকে আতঙ্কিত করা আমার উদ্দেশ্য নয়, মিস্টার বড়ুয়া, তবে কথাটা সত্যি।'

‘কিন্তু কেন?’ রানা অবাক। ‘ফেরে না কেন?’

‘ফেরে না শেয়ালে লাশ খেয়ে ফেলে, তাই।’

‘লাশ? লাশের কথা উঠছে কেন?’

‘বেশি কথা বলা আমার আসলে একটা রোগ,’ নিজেকে তিরস্কার করল তরুণী। ‘আপনি লেটিসের ভার্জিন অংশে থাকবেন, আপনাকে ব্ল্যাকহোলের কথা এভাবে বলা একদমই উচিত হলো না। তবে শুরু যখন করেছি...লাশের কথা উঠছে এই জন্যে যে ব্ল্যাকহোলে গেলে মানুষ সত্যি সত্যি লাশ হয়ে যায়।’

‘মরলে তো লাশ হবে, তারপর না শেয়াল খাবে! মরে কেন?’

‘মরে মাকড়সা আর সাপের কামড়ে,’ বলল তরুণী। হঠাৎ শিউরে ওঠার ভান করল সে। ‘ব্ল্যাকহোলে বিষাক্ত, লোমশ টার‍্যানটিউলা আর জাতসাপ গিজগিজ করছে। আশ্চর্য হবার কিছু নেই, পাহাড় আর জঙ্গলে ওই সবই তো থাকবে। ভাল কথা, সব ট্যুরিস্টই লুকাস ফাইভ স্টার-এ ওঠে, আপনিও তাই উঠবেন। লুকাস ইন শুধু মালিক, তাঁর ব্যক্তিগত মেহমান আর স্টাফের জন্যে সংরক্ষিত।’

রানা ভাবল, লেটিস দ্বীপে ওর সঙ্গিনী হতে না পেরে মেয়েটি ভয় দেখিয়ে বদলা নিচ্ছে না তো? তবে তথ্যগুলো মিথ্যে না-ও হতে পারে। হয়তো যা শুনেছে তাই বলছে। কথা আর না বাড়িয়ে হাতের নোট কাউন্টারে রেখে চলে এল ও।

দুই

টার্মিনাল ভবন ছেড়ে বেরুবার আগে বুকস্টল থেকে সেদিনের টাইমস কিনতে রানার ভুল হয়নি। টাইমস প্রথমে তার পাঠকদের মনে করিয়ে দেয়ার সুরে কয়েকটা তথ্য পরিবেশন করেছে।

বছর তিন-চার আগের ঘটনা। ইন্টারন্যাশনাল প্রেস ছোট্ট একটা খবর ছেপেছিল—নাসা গার্ডস করপরেশন অধিগ্রহণ করেছে।

গার্ডস করপরেশনের মালিক ছিলেন লুকাস ডেভেনপোর্ট। তাঁর এই কোম্পানি রকেট, অ্যান্টি-এয়ারক্রাফট গান, মিসাইল ইত্যাদি ভারী অস্ত্র নিয়ে গবেষণা করত। অধিগ্রহণ করার সময় নাসা প্রকাশ্যে কোন কারণ না দর্শালেও, স্বাভাবিক যুক্তিতেই বোঝা গিয়েছিল গার্ডস করপরেশনের বিজ্ঞানীরা নিশ্চয়ই বিশেষ কোন অস্ত্র বা অস্ত্রের ডিজাইন তৈরিতে ব্রেকথ্রু ঘটিয়েছেন, তা না হলে দুনিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ একজন ধনীর হাত থেকে তাঁর নিজের গড়া একটা প্রতিষ্ঠান সরকার এভাবে কেড়ে নিত না। এই ধারণার সত্যতা প্রমাণিত হয় পরবর্তী সময়ে লুকাস ডেভেনপোর্টের আচরণে। গার্ডস করপরেশন হাতছাড়া হয়ে যাবার পর বলা যায় এক রকম স্বেচ্ছানির্বাসনই বেছে নেন ভদ্রলোক। সব মিলিয়ে চল্লিশটার মত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিক, কিন্তু ওই ঘটনার পর থেকে কোন ব্যবসাই তিনি নিজে আর দেখাশোনা করেন না। সেই থেকে প্রকাশ্যে তাঁকে খুব একটা দেখাও যায় না।

টাইমসের খবরটা রানার মনে ভয় ঢুকিয়ে দিলেও, পাঠকদের

জন্যে অবশ্যই কৌতূহলোদ্দীপক। ওদের ওঅর করেসপন্ডেন্ট মূল খবরটার হেডিং দিয়েছে–'ট্রিপলহেডারঃ গর্ভযন্ত্রণা আদৌ শুরু হবে কিনা তা নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে।' সাব হেডিং-এ বলা হয়েছে–'গার্ডস করপরেশন তার আদি মালিককে ফিরিয়ে দেয়া হতে পারে।'

মূল খবরে ট্রিপলহেডার সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু বলা হয়নি, তবে বিশ্বস্তসূত্রের বরাত দিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে, ওটা একটা সফিসটিকেটেড মিসাইল গাইডেন্স সিস্টেম–বা সিস্টেমের ডিজাইন। সাড়ে তিন বছর আগে গার্ডস করপরেশন অধিগ্রহণ করার সময় নাসা ও পেন্টাগন থেকে হোয়াইট হাউসকে ধারণা দেয়া হয়েছিল, নাসা ওটা তৈরি করতে পারলে তিন মাথা বিশিষ্ট একটা হিংস্র ও হিসেবী দানব হাতে পেয়ে যাবে যুক্তরাষ্ট্র। কিন্তু গত সাড়ে তিন বছর চেষ্টা করার পর এখন নাসা বলছে, ডিজাইনে গুরুতর ত্রুটি থাকায় ট্রিপলহেডার তৈরির সময়সীমা আরও দু'বছর বাড়ানো হয়েছে। ডিজাইনে কেন ত্রুটি থাকল, এ প্রশ্নের জবাব দিতে নাসার মুখপাত্র অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। তবে অন্য এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানিয়েছেন, পেন্টাগন ও হোয়াইট হাউসের নির্দেশে লুকাস ডেভেনপোর্টের সঙ্গে মীটিঙে বসার চেষ্টা করছে নাসা–উদ্দেশ্য গার্ডস করপরেশন তাঁকে ফিরিয়ে দেয়ার ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা করা। কিন্তু এখানেও রহস্য আর ব্যর্থতার পরিমাণ কম নয়। জানা গেছে, নাসা নাকি অনেক চেষ্টা করেও লুকাস ডেভেনপোর্টকে কোথাও খুঁজে পাচ্ছে না।

হোমওঅর্ক ভালই করা আছে রানারও, হোটেলে ফিরে সেটা কাজে লাগাল। হিলটন ইন্টারন্যাশনালে উঠেছে, রানা এজেন্সির মায়ামি শাখা এখান থেকে বেশি দূরে নয়। ফোনে নির্দেশ দিতে শাখা অফিসার শর্মিলী দশ মিনিটের মধ্যে ল্যাপটপ দিয়ে গেল,

সঙ্গে ছোট্ট একটা প্রিন্টারও। একটা কাগজে নরেশ বড়ুয়ার নাম ও অন্যান্য তথ্য লিখে শর্মিলীর হাতে ধরিয়ে দিল ও, বলল, 'এই নামে পাসপোর্ট আর ভিসা দরকার, মঙ্গলবারের মধ্যে। সম্ভব?'

'কাল ছুটি, হাতে মাত্র দু'দিন সময়,' খানিক ইতস্তত করে মাথা ঝাঁকাল শর্মিলী, 'তবু সম্ভব, মাসুদ ভাই।'

তাকে বিদায় করে দিয়ে ল্যাপটপ নিয়ে বসল রানা। টাইমস-এর ওঅর করেসপন্ডেন্ট কয়েকজন, তার মধ্যে শুধু জন রবসনকে চেনে ও। ইন্টারনেটের মাধ্যমে অফিসেই পাওয়া গেল তাকে। রানা টাইপ করল: 'আমি জানি, ট্রিপলহেডার সম্পর্কে রিপোর্টটা তুমি করোনি।'

'ভেবেছ তুমি শালার ফাঁদে পা দেব আমি?' প্রশ্ন করল রবসন। 'বলব, তোমার ধারণা ভুল, রিপোর্টটা আমিই করেছি?'

'লা পাজায় সেভেন কোর্স ডিনারটা সম্ভবত মিসই করলে।' লা পাজা মায়ামির অভিজাত রেস্তোরাঁগুলোর একটা ।

'লা পাজায়? সেভেন কোর্স?' মনিটরে প্রশ্নবোধক চিহ্নগুলোকে অযথা দৈত্যাকৃতি করে তুলল রবসন। 'কিন্তু দোস্ত, ট্রিপলহেডার সম্পর্কে সমস্ত তথ্য টপ সিক্রেট...'

রানা টাইপ করল, 'টপ সিক্রেট কাদের জন্যে? তুমি যদি জেনে থাকো, আমার জানতে অসুবিধে কি? তোমার মত আমারও তো আছে হোয়াইট হাউস আর পেন্টাগন থেকে ইস্যু করা সিকিউরিটি ক্লিয়ার‍্যান্স–আমারটা এ-প্লাস।' আছে নয়, ছিল। বিশেষ একটা কাজে তিন মাসের জন্যে ইস্যু করা হলেও, মেয়াদ শেষ হবার পর নবায়নের জন্যে রানা আর আবেদন জানায়নি। তবে রবসনের তা না জানারই কথা।

'সেক্ষেত্রে তুমি পেন্টাগনের সঙ্গে যোগাযোগ করছ না কেন?' জানতে চাইল রবসন, তার প্রশ্নবোধক চিহ্ন এখনও দৈত্যাকৃতি।

'পেন্টাগন ভিজিট করার সিকিউরিটি ক্লিয়ার‍্যান্স আছে আমার,' বলল রানা। 'সশরীরে হাজির হয়ে আর্কাইভের পুরনো ফাইলেও চোখ বুলাতে পারব। কিন্তু পেন্টাগন বা হোয়াইট হাউসের কমপিউটরে ঢোকার পাসওয়ার্ড আমার জানা নেই। হাতে সময়ও নেই যে পেন্টাগন ভিজিট করব। কাজেই...'

'ট্রিপলহেডার সম্পর্কে কেন তুমি জানতে চাইছ?' রবসন তার দেশকে ভালবাসে, রানা বন্ধু হওয়া সত্ত্বেও গোপন তথ্য জানাবার আগে নিশ্চিত হতে চাইছে তার কোন ভুল হচ্ছে কিনা।

'আমার কমপিউটরের মেমোরিতে এ-ধরনের তথ্য জমা থাকে,' বলল রানা। 'টাইমসে যতটুকু বলা হয়েছে তা যথেষ্ট নয়, সেজন্যেই ডিটেইলস জানতে চাইছি।'

'অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই তো?'

'অন্য আর কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে?' পাল্টা প্রশ্ন করল রানা।

'ঠিক আছে, ট্রিপলহেডার সম্পর্কে পুরো ফাইলটাই আমি তোমার কমপিউটরে ট্র্যান্সফার করে দিচ্ছি।'

কাজ শেষে রানা টাইপ করল, 'সন্ধে ঠিক সাতটায় থেকো ওখানে।' তারপর মিনি প্রিন্টারটা অন করল।

প্রথম প্রিন্ট-আউট পড়তে গিয়ে হোঁচট খেলো রানা, কারণ কোঅর্ডিনেট, স্যাটেলাইট ম্যাপিং, কমপিউটর সিস্টেম, জাইরো, স্ট্যাবিলাইজার আর বুস্টার সম্পর্কে এমন সব টেকনিকাল ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দেয়া হয়েছে, বিশেষজ্ঞ ছাড়া আর কারও পক্ষে বুঝতে পারা সম্ভব নয়। দ্বিতীয় প্রিন্ট-আউটটা আরও দুর্বোধ্য লাগল, তাতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে রিট্র্যাক্টেবল গ্লাইড উইং, সেনসর আর অ্যান্টি-ইন্টারসেপটর সিস্টেম।

তৃতীয় প্রিন্ট-আউটে সহজ ভাষায় বলা হয়েছে, তিনটে

বৈশিষ্ট্য থাকায় ট্রিপলহেডারকে যুগান্তকারী বলা যায়। প্রথম বৈশিষ্ট্য হলো, ট্রিপলহেডার কোনও দেশকে সরাসরি টার্গেট করে নিক্ষেপ করা হবে না। আসলে, প্রথম অবস্থায় কোন মিসাইলই ছোঁড়া হবে না। প্লেন থেকে আকাশে ছেড়ে দেয়া হবে একটা সসার বা পিরিচ। গাইডেন্স সিস্টেমের প্রথম অংশটা থাকবে গ্রাউন্ড বা কন্ট্রোল-রূমে, দ্বিতীয় অংশটা সসারে, আর তৃতীয় অংশ সসার থেকে নিক্ষিপ্ত মিসাইলে। প্লেনে বহনযোগ্য এই সসার কমপিউটরচালিত, সেই কমপিউটরকে কন্ট্রোল-রূম থেকে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। সসারই মিসাইলের বাহন, প্লেন থেকে ছেড়ে দিলে মাটি থেকে এক লাখ ফুট ওপরে উঠে যাবে, তারপর সীমান্ত পেরিয়ে পৌঁছাবে শত্রুরাষ্ট্রের কোন শহরের ওপর। প্রতিটি সসারে দশটা করে মিসাইল থাকবে। প্রতিটি মিসাইলের গায়ে ছোট আকৃতির আরও চারটে করে ক্ষেপণাস্ত্র আছে, সেগুলো অ্যান্টি-মিসাইল হামলা সামাল দেবে। মূল মিসাইলকে সসার থেকে কমপিউটরের সাহায্যে নিয়ন্ত্রণ করা হবে। ওগুলোর বৈশিষ্ট্য হলো, প্রতিটি মিসাইলকে চার-পাঁচটি টার্গেট দেয়া হবে, প্রথম টার্গেটে অন্য কোন মিসাইল আগেই যদি আঘাত হেনে থাকে তাহলে সেটা দ্বিতীয় টার্গেটে আঘাত হানবে, কিংবা দিক বদলে যাবে তৃতীয় টার্গেটের দিকে—অর্থাৎ প্রতিটি নিক্ষেপ করা মিসাইল কাজে লাগবে, অপচয় হবে না।

রাশিয়া আমেরিকাকে, আমেরিকা রাশিয়াকে—অর্থাৎ ওরা একে অপরকে কে কতবার সম্পূর্ণ ধ্বংস করতে পারবে এই হিসাব মিলিয়ে ঠিক করা হয় কার সমরশক্তি কতখানি। সর্বাত্মক পারমাণবিক যুদ্ধ শুরু হলে প্রতিটি টার্গেটকে লক্ষ্য করে আট-দশটা করে মিসাইল ছোঁড়া হবে, কারণ প্রতিটি টার্গেট ধ্বংস হয়েছে এই নিশ্চয়তা পাওয়াটা তখন অত্যন্ত জরুরী হয়ে দাঁড়াবে।

কিন্তু ট্রিপলহেডার যার হাতে থাকবে, যে-কোন টার্গেটকে ধ্বংস করার জন্যে একটা মিসাইলই তার জন্যে যথেষ্ট।

ট্রিপলহেডারের ভয়ঙ্কর আরেকটা দিক হলো, এটা প্লেন থেকে নিজ দেশের আকাশে ছেড়ে দেয়া যাবে। মিসাইলবাহী সসার নিজেই শত্রুরাষ্ট্রের আকাশে চলে যেতে পারবে। এক লাখ ফুট ওপরে থাকায় তার নিরাপত্তা সহজে বিঘ্নিত হবে না, তাছাড়া সসারটি নিজেকে মিসাইল হামলা থেকে রক্ষা করতেও সক্ষম হবে।

মূল মিসাইল, ট্রিপলহেডার, আকারে বেশি বড় নয়। সসার ছাড়াও, রকেট লঞ্চার-এর সাহায্যেও ওটা নিক্ষেপ করা সম্ভব হবে। বলাই বাহুল্য, এই গোপন প্রযুক্তি চুরি করতে পারলে যে-কোন দেশ হাতে মারাত্মক একটা অস্ত্র পেয়ে যাবে। বিশেষ করে যে-সব দেশের কাছে পারমাণবিক বোমা আছে, তারা এই ট্রিপলহেডার পাওয়ার জন্যে একদম পাগল হয়ে উঠবে।

ফর্মুলা, প্রযুক্তি আর ডিজাইন গোপন রাখার স্বার্থেই নাসা গার্ডস করপরেশন অধিগ্রহণ করেছিল। করপরেশনের মালিক লুকাস ডেভেনপোর্ট ব্যাপারটাকে সহজভাবে নেননি। নিরেট কোন তথ্য নেই, তবে সংশ্লিষ্ট মহলে গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে নাসাকে তিনি দেখে নেবেন বলে হুমকি দিয়েছিলেন।

নাসা শুধু গার্ডস করপরেশন অধিগ্রহণ করেনি, ট্রিপলহেডার প্রকল্পের সঙ্গে জড়িত সব ক'জন বিজ্ঞানী, ডিজাইনার, টেকনিকাল হ্যান্ড ও সিকিউরিটি অফিসারকেও আত্মীকরণ করে। তবে দুই ব্যক্তিকে নাসা চেয়েও পায়নি। প্রথমজন গার্ডস করপরেশনের ম্যানেজার সেল সি সা জুসাইও। জুসাইও আমেরিকার নাগরিক, তবে তাঁর জন্ম কোরিয়ায়। নাসা তাঁকে বেতন-ভাতা দ্বিগুণ করে দেয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল, কিন্তু জুসাইও সবিনয়ে জানিয়ে দেন,

দীর্ঘকাল মালিকের নুন খেয়েছেন তিনি, কাজেই তাঁকে ছেড়ে কোথাও যাবেন না। জুসাইও না আসায় নাসার কর্মকর্তারা তেমন উদ্বিগ্ন হননি, কারণ ট্রিপলহেডার সম্পর্কে সব গোপন তথ্য তাঁর জানা ছিল না।

তাদের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়ান ট্রিপলহেডার-এর মূল ডিজাইনার ও বিজ্ঞানী সৈয়দ মনিরুল হক।

জন্ম বাংলাদেশে হলেও, মনিরুল হক যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছেন আজ থেকে তিরিশ বছর আগে। জর্জ ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটিতে লেখাপড়া করেছেন তিনি, লেখাপড়া শেষ করে লুকাস ডেভেনপোর্টের একটা কোম্পানিতে গবেষণার কাজে যোগ দেন। বছর পাঁচেক আগে লুকাস ডেভেনপোর্ট তাঁর পরামর্শেই গার্ডস করপরেশন প্রতিষ্ঠা করেন, সেই থেকে নাসা অধিগ্রহণ করার আগে পর্যন্ত ওই কোম্পানির প্রধান ডিজাইনার ও বিজ্ঞানী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন তিনি। কিন্তু আত্মীকরণের সময় দেখা গেল, মনিরুল হককে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

নাসা খবর নিয়ে জানতে পারল, ভদ্রলোক লরা নামে এক শ্বেতাঙ্গিনীকে ভালবেসে বিয়ে করেছিলেন, কিন্তু বছর দশেক আগে ভদ্রমহিলা মারা গেছেন। ওয়াশিংটনে তাঁর একটা বাড়ি আছে, কিন্তু সেখানে কেউ থাকে না, তালা দেয়া অবস্থায় পড়ে আছে। মনিরুল হকের সন্তান মাত্র একটি, সে-ও শান্তি নিকেতনে লেখাপড়া করে, নাম সৈয়দা শিরি হক। আমেরিকার কোথাও খোঁজ না পেয়ে নাসা শান্তি নিকেতনে লোক পাঠিয়ে শিরির সঙ্গে যোগাযোগ করে। কিন্তু মেয়েটিও তার বাবার কোন সন্ধান দিতে পারেনি।

বাবা নিখোঁজ শুনে ঘাবড়ে গেলেও, কাণ্ডজ্ঞান হারায়নি শিরি; ওয়াশিংটনে ফিরে এসে পুলিস স্টেশনে একটা কেস ফাইল করে

সে, নিখোঁজ বাবাকে খুঁজে দেয়ার জন্যে এফবিআই-কেও অনুরোধ জানায়। মাসখানেক ধরে নিজেও এখানে-সেখানে খোঁজাখুঁজি করে, তারপর পরীক্ষা ঘনিয়ে আসায় কোলকাতায় ফিরে যায়। গত সাড়ে তিন বছরে তিন-চারবার আমেরিকায় এসেছে সে, প্রতিবার পুলিস ও এফবিআই-এর সঙ্গে যোগাযোগ করেছে, নিজেও সম্ভাব্য সব জায়গায় খোঁজ নিয়েছে, কিন্তু মনিরুল হককে আজ পর্যন্ত কোথাও পাওয়া যায়নি।

এখন নাসা বলছে, ট্রিপলহেডার-এর ডিজাইনার মনিরুল হক যদি মারা গিয়ে থাকেন বা অন্য কোন রাষ্ট্র যদি তাঁকে বন্দী করে থাকে, তাহলে এই মিসাইল তৈরির সময়সীমা আরও দুই কি তিন বছর বাড়াতে হবে তাদের। কারণ, তাদের ধারণা, মনিরুল হক ট্রিপলহেডার-এর যে ডিজাইনটা তৈরি করেছিলেন, গার্ডস করপরেশন অধিগ্রহণ করার সময় নাসা সেটা পায়নি–পেয়েছে আসলটার মত দেখতে মূল ডিজাইনের একটা নকল, যেটা নানান ভুল-ত্রুটিতে ভরা। এই ভুল-ত্রুটি সংশোধন করার জন্যেই আরও সময় দরকার তাদের।

প্রিন্ট-আউটগুলো পড়ার পর রানার মাথায় কয়েকটা প্রশ্ন জাগল। গার্ডস করপরেশন হাতছাড়া হবার পরপরই লুকাস ডেভেনপোর্ট স্বেচ্ছানির্বাসনে চলে গেছেন, এই ব্যাপারটার বিশেষ কোন তাৎপর্য আছে কিনা। ওটা ছিল হেভি ও সফিসটিকেটেড মিসাইল তৈরির কারখানা, সেই কারখানার ম্যানেজার সিল সি সা জুসাইও এখন একটা রিসর্ট সেন্টারের ম্যানেজার, ব্যাপারটা বেমানান নয়? লেটিস আইল্যান্ডের দ্বিতীয় অংশে, ব্ল্যাকহোলে, আসলে কি ঘটছে? নিষেধ অমান্য করে ওখানে পা রাখলে মানুষ আর ফেরে না কেন? এমন কি হতে পারে যে, ব্ল্যাকহোলের মাটির তলায় অবকাঠামো গড়ে তুলেছেন লুকাস ডেভেনপোর্ট, তারপর

ডিজাইনার ও বিজ্ঞানী সৈয়দ মনিরুল হককে দায়িত্ব দিয়েছেন ট্রিপলহেডার তৈরি করার? নাসা ব্যর্থ হলেও, মনিরুল হক হয়তো সফল হয়েছেন। লুকাস ডেভেনপোর্ট ব্যবসায়ী মানুষ, তাঁর কাছে লাভটাই আসল কথা—মোটা টাকার বিনিময়ে গোপনে বিভিন্ন সন্ত্রাসী রাষ্ট্র ও গ্রুপের কাছে ট্রিপলহেডার বিক্রি শুরু করেছেন। তা না হলে তিন-তিনজন উপমহাদেশীয় সন্ত্রাসীর লেটিস আইল্যান্ডে যাবার পিছনে কি কারণ থাকতে পারে?

তবে এই ব্যাখ্যায় রানা নিজেই সন্তুষ্ট হতে পারল না। নাসা ও এফবিআই কি গোটা ব্যাপারটা তলিয়ে দেখেনি? লুকাস ডেভেনপোর্টের অদ্ভুত আচরণ, লেটিস দ্বীপ কিনে রিসর্ট তৈরি করা, সেখানে গার্ডস করপরেশনের ম্যানেজারকে দায়িত্ব দেয়া, বিজ্ঞানী মনিরুল হকের রহস্যময় নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া, লেটিস দ্বীপের ব্ল্যাকহোল অংশে লোকজনকে যেতে মানা করা, প্রতিটি বিষয়ই তো সন্দেহজনক। সন্দেহ দূর করার জন্যে কিছুই কি করা হয়নি?

'সম্ভাব্য সব কিছু করা হয়েছে,' সন্ধ্যায় ডিনার খেতে বসে রবসন জানাল রানাকে। 'লেটিস দ্বীপের দ্বিতীয় অংশে, ব্ল্যাকহোলে, কম করেও তিনবার হানা দিয়েছে এফবিআই। শেয়াল, সাপ আর বিষাক্ত মাকড়সা ছাড়া আর কিছু নেই ওখানে। দ্বিতীয়বার হানা দিয়ে এফবিআই অফিসাররা দেখতে পায় কয়েকটা বহুতল হোটেল বিল্ডিং আর গলফ কোর্স নির্মাণের কাজ চলছে পুরোদমে। শেষ খবর হলো, হোটেল তৈরির কাজ আপাতত বন্ধ রাখা হয়েছে। লুকাস ইনের ম্যানেজার এর জন্যে দায়ী করেছে পুঁজির অভাবকে।'

'আন্ডারগ্রাউন্ডে কোন অবকাঠামো তৈরি করা হয়েছে কিনা...'

'স্যাটেলাইট ফটোয় কিছুই ধরা পড়েনি,' বলল রবসন।

‘এফবিআই দশজনের একটা বিশেষজ্ঞ টীম পাঠিয়েছিল, তারা ঘুরে এসে রিপোর্ট করেছে, ব্ল্যাকহোলের মাটির তলায় নামার জন্যে একাধিক সিঁড়ি আছে, আন্ডারগ্রাউন্ড টানেলও আছে অনেকগুলো, কিন্তু কোন কারখানা নেই।’

‘বিজ্ঞানী মনিরুল হক আজও নিখোঁজ, এ-ব্যাপারে তোমার কি ধারণা?’

‘তিনি স্বেচ্ছায় নিখোঁজ, এ-কথা আমি বিশ্বাস করি না। আমার ধারণা তাঁকে কিডন্যাপ করা হয়েছে, কিডন্যাপ করে রাশিয়া কিংবা চীনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।’

‘তোমার এ বিশ্বাসের কারণ?’

‘মনিরুল হকই বলো, আর লুকাস ডেভেনপোর্টই বলো, নাসা এবং এফবিআই বিশ্বাস করতে রাজি নয় যে ওঁরা মার্কিন সরকারের সঙ্গে বেঈমানী করবেন। তাঁর এবং ডেভেনপোর্টের দেশপ্রেম পরীক্ষিত, রানা। যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষতি হতে পারে এমন কোন কাজ তাঁরা করবেন না।’

‘ইন্টারনেটে তুমি আমাকে জানিয়েছ, লুকাস ডেভেনপোর্ট হুমকি দিয়ে বলেছিলেন, নাসাকে তিনি দেখে নেবেন।’

‘ওটা ছিল তাঁর রাগের কথা,’ বলল রবসন। ‘যুগান্তকারী একটা ব্রেকথ্রু ঘটাবার পর কৃতিত্বটা যদি কেউ হাইজ্যাক করে, তোমার রাগ হবে না?’ হঠাৎ ভুরু কোঁচকাল সে। ‘কি ব্যাপার বলো তো? বিষয়টা নিয়ে তুমি যেন একটু বেশি মাথা ঘামাচ্ছ? তোমার এজেন্সি গোপন কোন খবর পেয়েছে নাকি?’

হেসে উঠে রানা মাথা নাড়ল। ‘দুঃখিত, তিন মাথা দৈত্য নিয়ে আর কোন কথা নয়।’ মনের প্রশ্ন মনেই থাকল—মনিরুল হক বা লুকাস ডেভেনপোর্ট বেঈমানী করবেন না, ভাল কথা; লেটিস আইল্যান্ডে এফবিআই সন্দেহজনক কিছু দেখতে পায়নি, তাও

বুঝলাম; কিন্তু তাহলে উপমহাদেশের সন্ত্রাসী গোষ্ঠির প্রতিনিধিরা ট্রিপলহেডার পাওয়ার কথা ভাবছে কেন? কেন খুন হলো সাযযাদ?

রানা জানে, এই প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে লেটিস আইল্যান্ড চষতে হবে ওকে।

তিন

নির্দিষ্ট দিনে মায়ামি এয়ারপোর্টে ডিপারচার লাউঞ্জ থেকে টারমাকে নেমে এসে হাঁটছে রানা, দূর থেকে দেখতে পেল কপালে 'প্রাইভেট এয়ার লিফট' লেখা একটা হ্যাঙ্গারের সামনে প্রকাণ্ড সাদা বকের মত অপেক্ষা করছে লুকাস এয়ারলাইন্সের লীয়ার জেট।

সঙ্গে অস্ত্র রাখতে বারণ করা হলেও, ওর আর কুখ্যাত তিন সন্ত্রাসীর গন্তব্য অভিন্ন হওয়ায় খালি হাতে যেতে রাজি নয় রানা। দুটো ব্যাগ ওর, আগেই পৌঁছে গেছে কাস্টমস শেডে, তার মধ্যে একটা একটু পুরনো; ওই পুরনোটার ফলস বটমে আছে ওর ওয়ালথার আর ছুরি, বিশেষ কেমিকেল দেয়া মোড়ক ব্যবহার করায় মেটাল ডিটেকটরেও ধরা পড়বে না। বয়োবৃদ্ধ এক নেপালী দম্পতিকে নিয়ে খুব ঝামেলায় পড়েছে কাস্টমস অফিসাররা। তাঁদের একটা সুটকেসের চাবি হারিয়ে গেছে, অথচ ভেতরে কি আছে দেখার জন্যে তালা ভাঙতে দিতেও রাজি নন তাঁরা। একজন কোরিয়ানকে দেখল রানা, নাকটা বোঁচা, মুখটা লালচে, হাবভাবে চরম অসন্তোষ, অফিসারদের পক্ষ নিয়ে নেপালী দম্পতির সঙ্গে তর্ক জুড়ে দিল সে। কোরিয়ান লোকটার লাগেজ চেক করা হলো না, রানাও ছাড়া পেল পাঁচ মিনিটের মধ্যেই।

শেড থেকে বেরিয়ে লীয়ার জেটের দিকে এগোল রানা, কোরিয়ান লোকটা পাশে থাকলেও কিসের আশায় যেন বারবার পিছন ফিরে তাকাচ্ছে। প্লেনে ওঠার সিঁড়ির পাশে এক নিগ্রো তরুণকে দেখা গেল, সুঠামদেহী ও সপ্রতিভ, যেন আরোহীদের অভ্যর্থনা জানাবার জন্যেই ওখানে দাঁড়িয়ে আছে। স্মিত হাসল সে, সম্মান দেখিয়ে মাথা নোয়াল। উত্তরে রানাও হাসতে যাবে, হঠাৎ উপলব্ধি করল তার হাসি ও মাথা নোয়ানো ওর উদ্দেশ্যে নয়, কোরিয়ান লোকটার উদ্দেশ্যে।

রানা ও নিগ্রো অভ্যর্থনাকারীকে পাশ কাটিয়ে সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে উঠে গেল কোরিয়ান। দরজা দিয়ে প্লেনের ভেতর ঢোকার আগে আরেকবার ঘাড় ফিরিয়ে কাস্টমস শেডের দিকে তাকাল সে।

এতক্ষণে রানার প্রতি মনোযোগী হলো সপ্রতিভ তরুণ। প্রথম দৃষ্টি বিনিময়ই অঘোষিত যুদ্ধের মত হয়ে দাঁড়াল–নিগ্রোর চোখে সন্দেহ আর চ্যালেঞ্জ, রানার চোখে ঠাণ্ডা নির্লিপ্ততা ও সূক্ষ্ম তাচ্ছিল্য। নিগ্রো হাত বাড়াতে যা দেরি, খপ করে ধরল রানা; তবে চাপ প্রয়োগ করল দু'জন একযোগে, এবং সমান মাত্রায়–দু'জনেই ব্যথা পেল, নীরবে হজম করার সময় উপলব্ধি করল, ওরা পরস্পরের সমীহ আদায় করে নিয়েছে।

'মি. নরেশ বড়ুয়া?' হাসল নিগ্রো তরুণ। 'আমি টিম সিজার–লুকাস এয়ারলাইন্সের লীয়ার জেটে আপনাকে স্বাগতম। প্লীজ!' ইঙ্গিতে সিঁড়িটা দেখিয়ে দিল।

প্লেনে উঠে রানা অবাক, কারণ আরোহী বলতে কোরিয়ান লোকটা ছাড়া আর কেউ নেই। তবে একটু পরই নেপালী দম্পতিকে দেখা গেল, তালা ভাঙা সুটকেস নিয়ে প্লেনে উঠে দরজার কাছাকাছি একজোড়া সীট দখল করলেন। বৃদ্ধা যথেষ্ট দীর্ঘ

নন, তবে প্রস্থে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি। হাতব্যাগ থেকে একমুঠো চকলেট বের করে টপাটপ মুখে পুরছেন। বৃদ্ধ ভদ্রলোককে গম্ভীর ও মেজাজি দেখাচ্ছে, সুট পরা সত্ত্বেও হাতে ভাঁজ করা একটা গরম শাল রেখেছেন। সেই শালের ভেতর থেকে বেরুল মাও সে তুঙের লাল একটা বই, কোন দিকে না তাকিয়ে ডুব দিলেন তাতে। প্রাসঙ্গিকভাবেই রানার মনে পড়ল, ইদানীং মাওবাদী কমিউনিস্টরা নেপালের রাজনৈতিক পরিবেশ বিস্ফোরণোন্মুখ আগ্নেয়গিরির মত বিপজ্জনক করে তুলেছে।

স্টুয়ার্ড কফি পরিবেশন করছে, এই সময় স্মার্ট এক শ্বেতাঙ্গ যুবককে নিয়ে প্লেনে উঠল সিজার। যুবকটিকে দেখেই চিনতে পারল রানা–এর নাম মারটিন, লুকাস এয়ারলাইন্সের একজন অফিসার–গত শনিবারে এই মারটিনই রাজাকারপুত্র আমান মোহাম্মদ আর তার দুই সন্ত্রাসী সঙ্গীকে সমুদ্র-সৈকত থেকে এয়ারপোর্টে নিয়ে এসেছিল।

রানার সঙ্গে চোখাচোখি হলো, ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকিয়ে সৌজন্য প্রকাশ করল মারটিন, তারপর ঝুঁকে কি যেন বলল নেপালী ভদ্রলোককে। কথা শেষ করে রানাকে পাশ কাটাল সে, বসল কোরিয়ান লোকটার পাশের সীটে। মাথার নড়াচড়া দেখে বোঝা গেল নিচু গলায় আলাপ করছে তারা।

সিজার যেন ইচ্ছে করেই রানার দিকে তাকাল না, ধীর পায়ে এগোল ককপিটের দিকে। দরজা খুলে যেতে ভেতরে কাউকে না দেখে আরেকবার বিস্মিত হলো রানা। সিজার শুধু অভ্যর্থনাকারী নয়, লুকাস এয়ারলাইন্সের পাইলটও বটে!

মায়ামি থেকে বাহামার নিউ প্রভিডেন্স আইল্যান্ড এত কাছে, মাত্র কয়েক মিনিট আকাশে থাকল প্লেন। কফির কাপ খালি হতে না হতে জানালার বাইরে আবার বাদামী সৈকত, কালচে গাছপালা

দেখতে পেল রানা। লীয়ার জেট এয়ারপোর্টকে ঘিরে চক্কর দেয়ার সময় শুরু হলো বৃষ্টি।

নিউ প্রভিডেন্স আইল্যান্ডে প্লেন স্থির হলো এয়ারপোর্টের শেষ প্রান্তে একটা শেডের নিচে, কাস্টমস শেডটা এখান থেকে বেশ অনেকটা দূরে। বৃষ্টির মধ্যে ঝাপসা লাগলেও, মেরুন রঙের ক্যাডিলাকটাকে শেডের মুখ থেকে প্লেনের দিকে ছুটে আসতে দেখল রানা। প্লেনের কাছাকাছি এসে থামল গাড়ি, ব্যাকসীট থেকে নামল বাদামী সুট পরা দুই তরুণ, সঙ্গে এক তরুণী। প্লেনের দরজা খুলে নেমে গেল মারটিন। টারম্যাকে দাঁড়িয়ে ক্যাডিলাক থেকে নামা আরোহীদের সঙ্গে কথা বলছে। হঠাৎই চোখে লাগল ব্যাপারটা—তরুণীর সঙ্গীরা মারটিনের মতই বাদামী সুট পরে আছে। মিল শুধু এই এক জায়গায় নয়—তিনজনই ওরা সমবয়েসী, পঁচিশ থেকে আটাশের মধ্যে; ব্যায়ামপুষ্ট শরীর, হাঁটাচলা দেখলে বোঝা যায় ক্ষিপ্রতার লাগাম টেনে রেখেছে; সুটের ভেতর শোল্ডার হোলস্টারের অস্তিত্ব স্পষ্ট। তবে রানার দৃষ্টি কেড়ে নিল মেয়েটি। পোশাকের রঙ ছাড়া ওদের সঙ্গে তারও সব কিছুই মেলে। প্রায় তরুণদের মতই লম্বা সে। পা থেকে গলা পর্যন্ত মোড়া ঢোলা একটা ড্রেস পরেছে, বৃষ্টির ছাঁট লেগে লেপ্টে আছে শরীরে, ফলে বিশেষ কিছু অঙ্গের গঠন সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যাচ্ছে। কোমর পর্যন্ত লম্বা কালো চুল ঢেউ তুলছে পিঠে। দুই স্তনের মাঝখানে দোল খাচ্ছে কয়েক প্রস্থ চেইন দিয়ে গড়া নেকলেস। বৃষ্টিস্নাত ম্লান দিন, তারপরও আভা ছড়াচ্ছে তার মুখ। জোয়ান অভ আর্ক-এর কথা মনে পড়ল রানার, মুখের অভিব্যক্তিতে এত বেশি আত্মবিশ্বাস। এর বয়েসও পঁচিশ-ছাব্বিশের বেশি হবে না। এ-ও প্রয়োজনে সাপের মত ক্ষিপ্র হতে জানে বলে সন্দেহ হলো।

এরইমধ্যে কোরিয়ান লোকটাও টারম্যাকে নেমে গেছে।

বাদামী সুট পরা তিন শ্বেতাঙ্গ যুবকের সঙ্গে কি নিয়ে যেন কথা বলছে সে। জটলা থেকে সামান্য একটু পিছিয়ে একা দাঁড়িয়ে রয়েছে মেয়েটি, তবে সবাই তার দিকে বারবার তাকাচ্ছে দেখে বোঝা যায় সে-ও আলোচনায় সামিল।

এক পর্যায়ে মুখ তুলে প্লেনের দিকে, তারপর সরাসরি রানার দিকে তাকাল মেয়েটি। চোখাচোখি হতে হাসল। শিরশির করে উঠল রানার গা। যেন আর কিছু লাগে না, শুধু দৃষ্টি দিয়েই যে-কোন পুরুষকে নিজের কাছে টেনে আনতে পারে মেয়েটি। নিজের এই ক্ষমতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতনও বটে, দ্বিতীয় হাসিটা যেন সে-কথাই বোঝাতে চাইল।

ক্যাডিলাক কাস্টমস শেডে ফিরে গিয়েছিল, আরও দু'জন আরোহী ও বেশ কিছু লাগেজ নিয়ে আবার এল সেটা। আরোহীরা সম্ভবত ল্যাটিন আমেরিকান, সংখ্যায় দু'জন, একজনের হাতে একটা গিটার। ক্যাডিলাকের ড্রাইভার প্লেনে লাগেজ তুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

ওই ড্রাইভার বাদে একে একে সবাই উঠল প্লেনে। স্টুয়ার্ড বিয়ার পরিবেশন করছে, এই সময় ফ্লাইট ডেক থেকে বেরিয়ে এসে খুক করে কাশল সিজার। 'আপনারা যারা ট্যুরিস্ট, লেটিস আইল্যান্ডে প্লেন ল্যান্ড করার পর লাগেজ না নিয়েই লুকাস ফাইভ স্টার-এ চলে যাবেন,' বলল সে। 'আপনাদের লাগেজ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যার যার রূমে পৌঁছে দেয়া হবে।' ফ্লাইট ডেকে ফিরে যাবার আগে সবাইকে সীট-বেল্ট বাঁধার পরামর্শ দিল সে।

সাবলীল ভঙ্গিতে আবার লীয়ার জেটকে আকাশে তুলল সিজার। প্লেনের চাকা রানওয়ে ত্যাগ করতেই মেঘের কোল থেকে বেরিয়ে এল সূর্য। হাতে বিয়ারের ক্যান, জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে রানা। এয়ারপোর্টকে বেড় দিয়ে রাখা কালচে-সবুজ

গাছপালার সারিকে পিছনে ফেলল ওরা, নিচে দেখা গেল নাসাউ শহরতলি। সাগরের তীরে সুদৃশ্য দালান-কোঠা রোদে ঝলমল করছে, প্রায় প্রতিটি ম্যানসনের সঙ্গে একটা করে সুইমিং পুল আর অসম্ভব সবুজ লন। শহরের মাঝখানে ডকসাইড মার্কেট, খুব নিচ দিয়ে সেটাকে পাশ কাটাল সিজার। ঝুড়ি ভর্তি ফল, থাক থাক করে সাজিয়ে রাখা বহুরঙা থান কাপড়, ফুটপাথে সাজানো তৈজস-পত্র, সবই দেখে চেনা যাচ্ছে। মাথায় বিশাল ব্যান্ড্যানা জড়ানো নিগ্রো এক মহিলা, পরনে তাঁবুর মত বিরাট ড্রেস, প্লেনের উদ্দেশে হাত নাড়ছে ঘন ঘন। জেটের ডানা কাত করে সাড়া দিল সিজার, তারপর উত্তর দিকে বাঁক নিতে শুরু করে আকাশের আরও ওপরে তুলে আনল প্লেনটাকে। কয়েক মিনিট পর ওদের নিচে আবার দেখা গেল সাগর।

একজোড়া সাদা ফেনার রেখা ফুটে আছে সাগরে। দ্রুতগতির একটা বোট ছুটছে প্লেনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। মাত্র কয়েক সেকেন্ড পরই পিছিয়ে পড়ল সেটা। গতিই বলে দিল, ওটা একটা হাইড্রোফয়েল। প্লেন ও বোট একই কোর্স ধরে যাচ্ছে। রানা আন্দাজ করল, বোটটাও সম্ভবত লুকাস ডেভেনপোর্টের। ওকে বলা হয়েছে, হাইড্রোফয়েলের একটা বহর আছে তাঁর, নাসাউ আর লেটিস আইল্যান্ডে আসা-যাওয়া করে। মায়ামি এয়ারপোর্টের মহিলা করণিক পলি বকশিশ আর কমিশনের লোভে অন্তত একটা তথ্য রানার কাছে চেপে গেছে। বেশিরভাগ ট্যুরিস্ট আসলে বোটে চড়েই লেটিস আইল্যান্ডে আসা-যাওয়া করে। লুকাস ডেভেনপোর্টের বিশেষ কিছু মেহমান আছে, লীয়ার জেটটা তাদের জন্যে খালি রাখার চেষ্টা করা হয়।

একটু পরই লেটিস আইল্যান্ড দেখতে পেল রানা। পুস্তিকায় ছাপা ছবি দেখেছে রানা, চিনতে কোন অসুবিধে হলো না। একটাই

দ্বীপ, কিন্তু মাঝখানে চওড়া লেগুন বিভক্ত করায় দুটো বলে মনে হয়। প্রখর রোদে দ্বীপের ভার্জিন অংশটা ঝলমল করছে–সুইমিং পুলটা বিশাল, পাঁচিল ঘেরা লেগুনটা প্রকাণ্ড, লুকাস ফাইভ স্টার-এর সারি সারি সাদা টাওয়ার থেকে প্রতিফলিত রোদ চোখ ধাঁধিয়ে দিল।

দ্বীপের ব্ল্যাকহোল অংশে গভীর খাদ, মাটির স্তূপ, নির্মাণাধীন হোটেলের কংক্রিট পিলার, পাহাড়ের মত উঁচু হয়ে থাকা নির্মাণ সামগ্রী, ট্র্যাক্টর, মিকসার মেশিন, আকাশ ছোঁয়া ক্রেন, পাথুরে চূড়া, গভীর বনভূমি, অসমাপ্ত গলফ কোর্স আর পরিত্যক্ত তাঁবু ছাড়া কিছু দেখার নেই। কয়েকটা বুলডোজারকে ঘিরে পিঁপড়ে আকৃতির কিছু লোককে ব্যস্ত দেখা গেল, কিন্তু তারা কিছু তৈরি করছে নাকি ধ্বংস করছে বলা কঠিন। একটা বিল্ডিঙের ইস্পাতের কাঠামো আকাশ ছুঁতে চাইছে, মাটিতে সেটার জটিল ছায়া পড়েছে। লুকাস ইনও দেখতে পেল রানা, ছাদে কালো ফড়িঙের মত বসে আছে পেটমোটা একটা হেলিকপ্টার।

ল্যান্ড করার জন্যে এয়ারস্ট্রিপের দিকে প্লেন তাক করছে সিজার, দ্বীপের দুই অংশকে এক করার জন্যে লেগুনের ওপর নির্মাণাধীন ব্রিজটাকে দেখতে পেল রানা। ব্ল্যাকহোলের তীরে পাশাপাশি কয়েকটা বিরাট আকারের কংক্রিটের জেটি নির্মাণ করা হয়েছে, একটা থেকে মাথাচাড়া দিয়েছে সুপারস্ট্রাকচার।

লুকাস ফাইভ স্টার-এর ছ'তলায় রানার স্যুইটটা এক কথায় চমৎকার। সামনের দিকে একটা ঝুল-বারান্দা আছে, আকারে সেটা এত বড় যে নাচের আসর বসানো যাবে, আর লেগুনটা দেখা না গেলেও দিগন্তে বিলীন সাগর তার সমস্ত ভাব-গাম্ভীর্য নিয়ে চোখের সামনে উপস্থিত।

হাতে পলির দেয়া একটা পুস্তিকা, ঝুল-বারান্দায় দাঁড়িয়ে লেটিস দ্বীপের কোথায় কি আছে আন্দাজ পাবার চেষ্টা করছে রানা। দ্বীপ একটা হলেও, লেগুনটা দ্বীপকে সমান দু'ভাগ করে রেখেছে। লেটিস মোটাসোটা কিডনি আকৃতির হওয়ায় দেখে মনে হয় দুটো আলাদা বে জুটেছে দ্বীপটার কপালে। দ্বীপের ভার্জিন অংশে বিশাল হোটেল কমপ্লেক্স, সুইমিং পুল, টেনিস কোর্ট, গলফ কোর্স ইত্যাদি আছে। সুইমিং পুলের কাছাকাছি, চৌকো লেগুনের শেষ প্রান্তে, পামবীথি ও অন্যান্য গাছপালার ফাঁক দিয়ে কোন রকমে দেখা যায় আরেকটা বিল্ডিঙের কিনারা। ওই বিল্ডিঙের বয়স একশো বছরের কম নয়। আগে ওটার নাম ছিল লেটিস ইন, দ্বীপটার মালিকানা বদলের পর নতুন নাম দেয়া হয়েছে লুকাস ইন। লুকাস ইনকে ভার্জিনের বাকি অংশ থেকে আলাদা করে রেখেছে একটা পাঁচিল। এই পাঁচিলেরই বর্ধিত অংশ ব্ল্যাকহোলে যাবার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এক অর্থে লুকাস ইন ব্ল্যাকহোলেই পড়েছে, তবে লেগুনের এপারে হওয়ায় ভার্জিনেরই অংশ বলে গণ্য করা হয় ওটাকে। দ্বীপে পা দেয়ার আগেই খবর নিয়ে রানা জানতে পেরেছে, পাঁচিলটার মাথায় ইলেকট্রিফায়েড কাঁটাতারের বেড়া আছে, আরও আছে পাঁচিল ঘেঁষে টহল দিয়ে বেড়ানো সশস্ত্র গার্ড। দ্বীপের মালিক লুকাস ডেভেনপোর্ট লেটিসে খুব কমই আসেন, এলে ওই লুকাস ইনেই ওঠেন তিনি। তারমানে এই নয় যে লুকাস ইন শুধু তাঁর জন্যে রিজার্ভ রাখা হয়েছে। দ্বীপের পরিচালক ও সমস্ত রিসর্ট ফ্যাসিলিটির ম্যানেজার মি. জুসাইও আর তাঁর স্টাফ ওখানে থাকেন। আর থাকে লুকাস ডেভেনপোর্টের বিশেষ মেহমানরা। মেজবান হিসেবে লুকাস ডেভেনপোর্টকে সচরাচর পাওয়া না গেলেও তথাকথিত এই মেহমানরা দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় প্রতিদিনই দু'পাঁচজন

করে আসে। এরা সবাই যে লুকাস ডেভেনপোর্টের মেহমান বা তাঁর আমন্ত্রিত অতিথি, এমন না-ও হতে পারে। রানার এরকম সন্দেহ হবার কারণ, ফাইভ স্টারের খাতায় নাম রেজিস্ট্রি করার সময় কৌশলে জেনে নিয়েছে মালুই সুকায়া, আমান মোহাম্মদ আর ওদের সঙ্গীটি এই হোটেলে নাম লেখায়নি। এর মানে হলো, ওরা লুকাস ইনে উঠেছে। সন্ত্রাসীদের কুখ্যাত তিনজন লীডার লুকাস ডেভেনপোর্টের মত বিলিওনেয়ারের বিশেষ মেহমান হয় কি করে? শুধু এই তিনজনই নয়, রানার সঙ্গে লীয়ার জেটে যে নেপালী দম্পতি আর কোরিয়ান লোকটা ছিল, তারাও কেউ ফাইভ স্টার-এ ওঠেনি।

রানার ঝুল-বারান্দা থেকে নিচে বাগান ও সুইমিং পুলের অংশবিশেষ দেখা যাচ্ছে। সাততলা হোটেলের ছয়তলায় রয়েছে ও। দুপুরে খাওয়াদাওয়া সেরে ছোট্ট একটা ঘুম দিয়ে নিয়েছে, সময়টা এখন উত্তপ্ত বিকেল। পুলের ধারে সুইমিং ট্রাঙ্কস ও বিকিনি পরা নারী-পুরুষের ভিড় জমে উঠেছে। হোটেল বিল্ডিঙের কোণ দৃষ্টি পথে বাধা হয়ে থাকায় বাদকদের দেখতে পাচ্ছে না রানা, তবে যন্ত্রসঙ্গীতের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে। বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে সুর মিলিয়ে কে যেন রবীন্দ্রসঙ্গীতের একটা-দুটো লাইন গাইল। অবাস্তব কল্পনা ভেবে কান খাড়া করল রানা, কিন্তু তারপর আর শুনতে পেল না। এই গানটি অনেকেই গেয়েছে, তবে শুধু সুচিত্রা মিত্রের গলাতেই শুনতে পছন্দ করে রানা। গানটা স্মরণ করল ও–

খাঁচার পাখি ছিল সোনার খাঁচাটিতে,
বনের পাখি ছিল বনে।
একদা কী করিয়া মিলন হলো দোঁহে,
কী ছিল বিধাতার মনে।

তবে ব্যাপারটা ঠিক বোধগম্য হলো না–যন্ত্রসঙ্গীতের আওয়াজ

ভেসে আসছে সুইমিং পুল থেকে, অথচ কে যেন গুন গুন করল ওর ঠিক নিচের ঝুল-বারান্দায়। নাকি আন্দাজ করতে ভুল হচ্ছে ওর? ঝুঁকে নিচের দিকে তাকাল রানা, কিন্তু নিচের ঝুল-বারান্দা অল্প যে-টুকু দেখা গেল সেখানে কেউ নেই।

আগেই কাপড় পাল্টেছে রানা, নিচে নামার জন্যে শার্টের ওপর শুধু ডেনিম জ্যাকেটটা পরল। জুতো পরবে না, ব্যাগ থেকে তাই টেনিস শূ বের করতে হলো। ব্যাগের ফলস কম্পার্টমেন্ট আগেই চেক করে দেখেছে, ওর পিস্তল বা ছুরি খুঁজে পায়নি ওরা। পিস্তলটা গোপন কমপার্টমেন্টেই থাকল, সঙ্গে নিল শুধু ছুরিটা। নিচে নামার আগে রূম সার্ভিসকে অর্ডার দিয়ে কফি আনিয়ে খেলো রানা।

গ্রাউন্ড ফ্লোরে নামার জন্যে দুই প্রস্থ এলিভেটর আর সিঁড়ি আছে। করিডরের বাঁকে একজোড়া এলিভেটর, আরেক জোড়া ছ'তলার লাউঞ্জে। লাউঞ্জ হয়েই এলিভেটরে চড়ল রানা। বিকিনি পরা চারটে মেয়েও ওর সঙ্গে নামছে। নিচে নেমেও বিকিনির ছড়াছড়ি দেখতে পেল ও। লুকাস ফাইভ স্টার-এ শুধু যেন তরুণী মেয়েরাই দলে দলে ভিড় জমিয়েছে। শুধু ভিড় জমায়নি, যেন প্রতিযোগিতা শুরু করেছে কে কার চেয়ে স্বল্পবসনা হতে পারে। শুধু বিকিনি নয়, হটপ্যান্ট আর মিনিস্কার্টেরও ছড়াছড়ি। প্রিন্টেড জিনস পরা কয়েকটা মেয়েকে নিচের লাউঞ্জে ঘোরাফেরা করতে দেখল রানা। দ্রুত চোখ বোলাতেই উপলব্ধি করল, লেটিস দ্বীপে শ্বেত ভালুকের মতই ব্রার খুব অভাব। নেপালী বুড়ো-বুড়ির কথা মনে পড়তে হাসি পেল ওর—এরকম একটা জায়গায় কি করতে এসেছেন ওঁরা?

চওড়া করিডর ধরে সুইমিং পুলের দিকে হাঁটছে রানা। দু'পাশে ছোট ছোট দোকান। কাপড়চোপড়, স্যুভেনির, শ্যাম্পেন,

বই, টোবাকো থেকে শুরু করে হাতে তৈরি লেদার গুডস পর্যন্ত সবই বিক্রি হচ্ছে। পুরুষদের মত লম্বা সেই মেয়েটিকে আবার দেখল ও।

করিডর থেকে বেরিয়ে যাবার দরজায় দাঁড়িয়ে রয়েছে মেয়েটি, ডুবন্ত সূর্যের গায়ে আঁকা কাঠামোটা শুধু দেখল, মুখ নয়, তা সত্ত্বেও চিনতে পারল সঙ্গে সঙ্গে। প্লেনে থাকতে স্টুয়ার্ডের সঙ্গে কথা হয়েছে রানার, সেই সূত্রে মেয়েটির পরিচয় জানে। রিসর্ট ফ্যাসিলিটির ম্যানেজার জুসাইওর প্রাইভেট সেক্রেটারিদের একজন সে, নাম জেনিফার ক্যারলিন। জুসাইওর প্রাইভেট সেক্রেটারি সব মিলিয়ে সাতজন, তাদের মধ্যে ক্যারলিনই একমাত্র মেয়ে। বাকি ছ'জনকে চেনার উপায় হলো তারা সবাই বাদামী সুট পরে।

ক্যারলিন অন্য একটা মেয়ের সঙ্গে কথা বলছে। এই মেয়েটি ক্যারলিনের মত অস্বাভাবিক লম্বা নয়, তারপরও পাঁচ ফুট ছয় ইঞ্চি তো হবেই। সামনের দিক খোলা একটা রোব পরে আছে মেয়েটি, ভেতরে ভেজা বিকিনি। মেয়েটির মুখ দেখার সুযোগ হলো না, তবে ওকে উৎসুক করে তুলল তার গায়ের রঙ। ঠিক এরকম সোনালি বরনের মেয়ে আগে কখনও দেখেছে কিনা মনে করতে পারল না। কৌতূহলের মাত্রা বেড়ে গেল তার চুল দেখে। পিঠ ঢেকে কোমর ছুঁয়েছে রেশমের মত রাশি রাশি কালো কেশ। হয়তো প্রাসঙ্গিক নয়, তবু রানার মনে হলো, মেয়েটি বিরল এক সম্পদের অধিকারিণী–সে তার চুল দিয়ে মনের মানুষটিকে পুরোপুরি ঢেকে দিতে পারবে। আজ কি হয়েছে কে জানে, অবাস্ত ব কল্পনা একটু বেশি প্রশ্রয় পেয়ে যাচ্ছে। কালো কুন্তলের বিপুল সম্ভার দেখে স্মৃতি থেকে নাকে ঢুকল গন্ধরাজ তেলের মিষ্টি ঝাঁঝ। নিজের সঙ্গে একরকম বাজি ধরে বসল রানা, মেয়েটি নিশ্চয়ই খুব সুন্দরী হবে। তা যদি না হয়? খেলাচ্ছলে সাদামাঠা একটা মুখ

বসাল রানা মেয়েটির ঘাড়ের ওপর। যেন বুঝতে চায় নিজের কি প্রতিক্রিয়া হবে। বাজিতে হেরে গিয়ে রাগ বা দুঃখ হলো না, হলো অভিমান। কেউ যেন মেয়েটির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে–এত সুন্দর যার রঙ, এমন বিস্ময়কর যার দেহসৌষ্ঠব, কেশরাশি যার কালো বিদ্যুতের মত চঞ্চল, সাধারণ মুখ তার জন্যে স্রেফ একটা অভিশাপ, আর রানার জন্যে যেন ব্যক্তিগত পরাজয়।

আসলে মেয়েটি দেখতে কেমন নিশ্চিত হওয়া গেল না। ইচ্ছা করে কিনা বলা কঠিন, ক্যারলিন তাকে আড়াল করে রেখেছে। ওদেরকে পাশ কাটাবার সময় ক্যারলিনের সঙ্গে চোখাচোখি হতে ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল রানা। উত্তরে ক্যারলিনও তাই করল। ব্যস, এইটুকুই যথেষ্ট। কেউ যদি ইন্টারনেটে খোঁজ-খবর করে, সে জানতে পারবে নরেশ বড়ুয়া 'উলফা'-র একজন গ্রুপ লীডার, জার্নালিস্টের পরিচয়টা তার কাভার মাত্র। অর্থাৎ, সুন্দরী মেয়ে দেখলেই গায়ে পড়া ভাব দেখানো একজন গেরিলা যোদ্ধার জন্যে মানানসই হবে না। সুন্দরী নারী সহজেই তার মনোযোগ কাড়তে পারবে না, কারণ আরও অনেক গুরুত্বপূণ উদ্দেশ্য নিয়ে লেটিস আইল্যান্ডে এসেছে সে।

ভদ্রোচিত দূরত্বে সরে এসে থামল রানা, সুইমিং পুল আর চারপাশে জড়ো হওয়া লোকজনের ওপর চোখ বোলাল, তারপর আবার তাকাল সোনালি মেয়েটিকে সামনাসামানি দেখতে পাবার লোভে। ধক্ করে উঠল বুকের ভিতরটা।

এ যেন দক্ষ কোন ভাস্করের হাতে তৈরি প্রতিমা, মনের সমস্ত মাধুরী মিশিয়ে সুন্দরী শ্রেষ্ঠা দেবীর যাবতীয় রূপ আর সুষমা প্রতিমার মুখশ্রীতে ঢেলে দেয়া হয়েছে। দীর্ঘ ও আয়ত নয়নে লাজনম্র দৃষ্টি, যৌবন ভারাক্রান্ত দেহে আড়ষ্ট ভঙ্গি। বিদায়ী সূর্যের রশ্মি তরল সোনার মত লেপ্টে আছে হলুদবরণ ত্বকে। গুরুনিতম্বে

ঢেউ তুলে কয়েক পা হাঁটল সে, বাদামী সুট পরা দু'জন যুবক বিনয়ে বিগলিত হয়ে কি যেন বোঝাবার চেষ্টা করছে তাকে। রোবটা বাতাসের সঙ্গে খেলছে, ফলে উন্নত স্তন দেখা গেল, ব্রার কাপ থেকে উপচে পড়ছে। পা দুটো লম্বা, পেশীবহুল, এতটাই নিখুঁত যে ভাস্কর সত্যি যেন পাথর কেটে তৈরি করেছে। রানার মনে হলো, এই মুহূর্তে ক্লিওপেট্রা যদি ফিরে এসে ওকে নীলনদে প্রমোদ ভ্রমণের আমন্ত্রণ জানায়, ও প্রত্যাখ্যান করবে বিনা দ্বিধায়।

মেয়েটি ওর দিকেই তাকিয়ে আছে, তাকিয়ে আছে ক্যারলিনও। যুবকদের কথার জবাব দিচ্ছে মেয়েটি, তাকে ফেলে রানার দিকে এগিয়ে এল ক্যারলিন। 'হাই,' বলল সে। তার কণ্ঠস্বর যেন কুয়াশাভেজা রোববার সকালে দূর থেকে ভেসে আসা চার্চের ঘণ্টাধ্বনি।

'হ্যালো!' মৃদু হেসে চোখ থেকে সানগ্লাস নামাল রানা।

সিঁদুরে মেঘ আকাশের গায়ে যেন থোকা থোকা রক্তজবা ফুটিয়ে রেখেছে, তাতে হেলান দেয়ার ভঙ্গিতে দাঁড়াল ক্যারলিন। 'আজ সকালে না আপনাকে দেখলাম?'

'হ্যাঁ, লীয়ার জেটে ছিলাম আমি।'

'লেটিস দ্বীপে বেশ ক'দিন থাকার ইচ্ছে বুঝি?'

'লেটিস কি অফার করে তার ওপর নির্ভর করবে।'

ক্ষীণ হলেও দুষ্ট হাসি ফুটল ক্যারলিনের ঠোঁটে, শব্দচয়নে সতর্ক। 'ইয়ে, মানে, হঠাৎ করে যেন চলে যাবেন না। একটু ধৈর্য ধরে দেখতে বলি, কেউ হয়তো ভাল কিছুই অফার করবে।'

ট্রিপলহেডার? মনে মনে প্রশ্ন করল রানা। মুখে বলল, 'কতটুকু কি আশা করা উচিত ঠিক বুঝতে পারছি না।' ক্যারলিন যদি কোন সংকেত দিয়ে থাকে, ওরও তাহলে ইঙ্গিত দেয়া দরকার। 'আসলে আমার কোন রেফারেন্স নেই।'

'তারমানে কি এখানে আসার ব্যাপারে কেউ সুপারিশ করেনি?' উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে ঘুরল সে, নিতম্বে উথালপাথাল তরঙ্গ তুলে ফিরে যাচ্ছে। তার সঙ্গে দুই তরুণ আর সোনালি প্রতিমাও রওনা হলো। হোটেলের দিকে যাচ্ছে ওরা।

সুইমিং পুলের কিনারা ধরে হাঁটছে রানা, লেগুন ঘিরে থাকা উঁচু পাথুরে পাঁচিলটা পরীক্ষা করাই উদ্দেশ্য। গাছপালা আর ঝোপের আড়ালে ওটা, তবে অস্পষ্ট হলেও ইলেকট্রিফায়েড কাঁটাতারের বেড়াটাও দেখা গেল। দেখা গেল লুকাস ইন-এর অংশবিশেষও। পাঁচতলা প্রাচীন ভবন, পাথর আর ইঁট দিয়ে তৈরি। ছাদে বসে থাকা কালো যান্ত্রিক ফড়িংটার খানিকটা লেজও দেখা গেল। যে-ক'টা জানালা চোখে পড়ল, সবগুলোর শাটার বন্ধ। পাঁচিলের গায়ে একটাই প্রবেশপথ, লুকাস ইনে ঢুকতে হলে ওই পথ দিয়ে যেতে হবে। লুকাস ফাইভ স্টার-এর গেট থেকে বেশি দূরে নয় সেটা। প্রবেশপথ মানে নিরেট ইস্পাতের একটা গেট। সন্ধ্যা লেগে আসছে, এই সময় ওটার কাছাকাছি ঘুর ঘুর করা ঠিক হবে না, রানা সিদ্ধান্ত নিল কাল দিনের বেলা ভাল করে দেখবে।

সূর্য ডোবার পর ঝপ্ করে চারদিক অন্ধকার হয়ে গেল। তবে পুলের চারধারে ফ্লাডলাইটের ব্যবস্থা থাকায় সাঁতারুদের ভিড় কমল না। শামিয়ানা টাঙিয়ে বার তৈরি করা হয়েছে, পাশেই ব্যান্ড পার্টি। ওখানে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল রানা, পিছন থেকে ভেসে আসছে সমুদ্রের গর্জন। বার-এ যারা বসে আছে সবাই তারা বয়সে তরুণ, সাদা কালো সব রঙেরই আছে। বিশেষভাবে কেউ ওকে লক্ষ করছে না। এখানে বাদামী সুট পরা কেউ নেইও।

হোটেলে ফিরে এসে ক্যাসিনোটা খুঁজে নিল রানা। ঢোকার মুখে একটা সাইনবোর্ড দেখল, তাতে ক্যাসিনো সংলগ্ন ক্যাবারেইতে আজকের সান্ধ্য সূচি ঘোষণা করা হয়েছে। বোর্ডের

একটা ছবি দেখে রানার হার্টবিট বেড়ে গেল।

সোনালি প্রতিমাকে চিনতে না পারার কোন কারণ নেই। তবে ছবিতে যে ভঙ্গিটা ফুটে রয়েছে সেটা দেখবে বলে রানা আশা করেনি। কেউ আশা করে না নাচতে নেমে কোন মেয়ে ঘোমটা দেবে, কিন্তু এই মেয়ে দশজনের মনোরঞ্জনের জন্যে নাচে, এটা মেনে নিতে কষ্টই হলো ওর। ছবিটা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল রানা, যেন প্রমাণ খুঁজছে মেয়েটি অনিচ্ছাসত্ত্বেও নাচে। কিন্তু স্বল্পবসনা প্রতিমার দেহভঙ্গিতে, নিজেকে উন্মোচিত করার ব্যাকুলতায়, উজ্জ্বল হাসিতে উদ্ভাসিত মুখের অভিব্যক্তিতে কোনরকম আড়ষ্টতা দেখল না। বরং মনে হলো, মনের আনন্দে নিজেকে উজাড় করে দিয়ে নাচছে সে। ছবির নিচে প্রতিমার পরিচয় দিয়ে লেখা হয়েছে–'মিশরীয় ক্যাবারেই ও বেলী ড্যান্সার মিস ফারাহ আজও বিস্ফোরণ ঘটাবেন।' এর নিচে অনুরোধের ভঙ্গিতে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে–'দয়া করে কেউ স্টেজে উঠবেন না বা ভদ্রতার সীমা লঙ্ঘন করবেন না।'

বিশাল এক হলরূমে ক্যাসিনোটা। সিলিং অনেক ওপরে, মেঝেতে পুরু কার্পেট, গোপন উৎস থেকে টেবিলে আলো ফেলার ব্যবস্থা। একজোড়া রুলেৎ হুইল, তিনটে ক্র্যাপস টেবিল, ছয় কি সাতটা ব্ল্যাকজ্যাক সেটআপ। হলরূমের শেষ প্রান্তে উঁচু একটা বেদি ব্যাকারা খেলার জন্যে আলাদা রাখা হয়েছে, ওখানে শুধু বড় দানে তাস খেলা হয়।

অনেকেই জুয়া খেলছে, তাদের মধ্যে নেপালী দম্পতিকে দেখে একটু অবাকই হলো রানা। বৃদ্ধা একটা ক্র্যাপস টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে অনবরত ডাইস ছুঁড়ছেন আর লাফাচ্ছেন। আর তার সঙ্গী ভদ্রলোক এক টেবিল থেকে আরেক টেবিলে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, চোখে চঞ্চল ও অনুসন্ধানী দৃষ্টি। সন্দেহ নেই, কাউকে খুঁজছেন

তিনি।

রানাকে দেখে হাসলেন ভদ্রলোক। উত্তরে রানাও হাসল। তবে কেউ কারও দিকে এগোল না। একটু পর প্লেনে দেখা কোরিয়ান লোকটা ঢুকল ক্যাসিনোয়। নেপালী ভদ্রলোক তার দিকে এগোতে যাবে, হাত-ইশারায় নিষেধ করল সে।

নিউ প্রভিডেন্স আইল্যান্ড থেকে লীয়ার জেটে উঠেছিল দু'জন ল্যাটিন আমেরিকান, ইতিমধ্যে রানা জেনেছে তারাও ফাইভ স্টার-এ ওঠেনি। ক্যাসিনোয় ঘুর-ঘুর করছে যেন দুই মানিকজোড়, একজনের হাতে স্প্যানিশ গিটার, আরেকজনের হাতে ক্যামেরা। গিটার নীরব থাকলেও ক্যামেরার ফ্ল্যাশ ঘন ঘন ঝলসাচ্ছে। ইচ্ছা করেই ক্যামেরার দিকে পিছন ফিরে থাকল রানা—ওর ছবি তুলে মন্দ লোকের হাতে তুলে দেবে এই ভয়ে নয়, অবাঞ্ছিত আলোর ঝিলিক থেকে চোখ দুটোকে বাঁচানোর জন্যে। কারও যদি ওর ছবি দরকার হয়, তার নাগালের মধ্যে ফেলে রেখেছে রানা, ইচ্ছে করলেই সংগ্রহ করতে পারবে। নরেশ বড়ুয়ার মুখে ফ্রেঞ্চ কাট দাড়ি, বিড়ালচোখো, জুলফির দৈর্ঘ্য দু'ইঞ্চি, সিঁথি কাটে ডানদিকে। এই চেহারা নিয়ে পলির কাছে ফেরা উচিত হোত না, রানা ফেরেওনি। লেটিসে বেড়ানোর অনুমতি-পত্র ও লুকাস এয়ারলাইন্সের টিকিট শর্মিলীকে পাঠিয়ে সংগ্রহ করেছে। দ্বীপে নেমে, স্টার-এ নাম লেখানোর সময়, নরেশ বড়ুয়া তার পাসপোর্ট ও ভিসা রিসেপশনে জমা রেখেছে। পাসপোর্টের ওই ছবি সংগ্রহ করে কেউ যদি ইন্টারনেটে খোঁজ-খবর নেয়, এমনকি ইন্টারপোলকেও যদি জিজ্ঞেস করে, জানা যাবে নরেশ বড়ুয়া জার্নালিস্ট নয়, 'উলফা'র একজন দুর্ধর্ষ গেরিলা লীডার।

টোপ ফেলার পর এখন রানার অপেক্ষার পালা।

ক্যাসিনোয় ঢুকে কুখ্যাত বদমাশ নরেশ বড়ুয়া জুয়া খেলবে

না, তা তো হয় না। রুলেত হুইলের সামনে বেশ ভিড়, ঠেলেঠুলে জায়গা করে নিল রানা। মানিব্যাগ থেকে একটা একশো ডলারের নোট টেনে নিলেই হত, কিন্তু তা না করে একগাদা নোট হাতে নিল, তার মধ্যে পাঁচশো ও হাজার ডলারের একাধিক নোটও আছে। পাশে দাঁড়ানো গম্ভীরদর্শন সেই কোরিয়ান লোকটা বেশ মনোযোগ দিয়েই টাকাগুলো লক্ষ করল।

খেলা শুরু হবার পর দেখা গেল হাজার ডলার হেরেও নরেশ বড়ুয়া হাসছে। টাকা ফেরত পাবার জন্যে আর খেলতেও রাজি হলো না, বলল, 'মিস ফারাহ্-র নাচটা মিস করতে চাই না।'

'আমিও না,' নাকি সুরে, ভাঙা-ভাঙা ইংরেজিতে বলল কোরিয়ান লোকটা, রানার পিছু নিয়ে ক্যাসিনো থেকে বেরিয়ে এল।

ক্যাবারেইতে ঢোকার মুখে কাউন্টার থেকে পঞ্চাশ ডলার দিয়ে টিকিট কাটতে হলো, সঙ্গে ফাও পাওয়া গেল একটা মুখোশ। বেছে নেয়ার সুযোগ থাকায় বাঘই পছন্দ করল রানা, নাই বা হলো সেটা রয়েল বেঙ্গল টাইগার। কোরিয়ান লোকটা পছন্দ করল বুলডগ। অপ্রাসঙ্গিক হলেও রানার মনে পড়ে গেল, কুকুরে ওদের অরুচি নেই।

হলঘরের কাস্তে আকৃতির বার ও টেবিলগুলোয় ধীরে ধীরে ভিড় জমে উঠল। রানা আর ওর নীরব সঙ্গী স্টেজের কাছাকাছি একটা টেবিলে বসেছে, বাকি দুটো চেয়ার দখল করল নেপালী বৃদ্ধ আর ল্যাটিন ক্যামেরাম্যান। এরাও মুখোশ পরে আছে, তবে পোশাক দেখে চিনতে অসুবিধে হলো না। নেপালী ভদ্রলোক সিংহ আর ক্যামেরাম্যান নিয়েছে ড্রাকুলার মুখ। ঘড়ির কাঁটা ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে ভিড় বাড়ছে। আর সব টেবিলের মত ওদের টেবিলেও অতিরিক্ত দুটো করে চেয়ার দেয়া হলো, তাতে আসীন হলো

একটা প্রকাণ্ড ঘুঘু আর একটা গরিলা। না, এদেরকে রানা চিনতে পারল না।

স্টেজে প্রথমে এল একজন জাগলার, তারপর একজন কমেডিয়ান। তারা বিদায় নিতে এক টাম্বলার মেয়ে বেশ কিছুক্ষণ অ্যাক্রোব্যাটিক নৈপুণ্য দেখিয়ে মুগ্ধ করল সবাইকে।

ইতিমধ্যে অপেক্ষায় থেকে থেকে অধৈর্য হয়ে উঠেছে দর্শকরা। প্রথমে গুঞ্জন শোনা গেল, তারপর সম্মিলিত কণ্ঠে কোরাস শুরু হলো–'মিস ফারাহ! মিস ফারাহ! মিস...'

স্টেজ এই মুহূর্তে খালি, তবে পর্দা পড়েনি। সবার মত রানাও একটা প্রত্যাশা নিয়ে অপেক্ষা করছে, চোখ দুটো বার বার ফিরে যাচ্ছে স্টেজের দিকে, তারপরও ছোট্ট ঘটনাটা দেখতে পেল ও। ওদের পাশের টেবিলে সাতজন মুখোশধারী বসেছিল, শেষ লোকটা হিটলার। তার চেয়ার হঠাৎ খালি দেখে একটু অবাক হলো রানা।

অকস্মাৎ পুরোপুরি অন্ধকার হয়ে গেল স্টেজ। সেই সঙ্গে থেমে গেল কোরাস। পিন-পতন নিরবতা নেমে আসতে অলস ও গুরুগম্ভীর ডুম-ডুম শব্দে ড্রাম বাজতে শুরু করল। শব্দটার লয় দ্রুত বাড়ছে, এক সময় হার্টবিটের সঙ্গে একই ছন্দে বেজে চলল। অন্ধকার স্টেজে কখন পর্দা নেমে এসেছে কেউ টের পায়নি, ব্যাপারটা জানা গেল পর্দার গায়ে নিঃসঙ্গ একটা স্পটলাইট আছড়ে পড়তে। আচমকা দু'ফাঁক হলো পর্দা, ভাঁজগুলো জ্যান্ত প্রাণীর মত লাফাতে লাফাতে হারিয়ে গেল ওপরে গাঢ় ছায়ার ভেতর। আর ঠিক সেই সময় স্তব্ধ হয়ে গেল ড্রাম। স্টেজ খালি, হলঘরের নিস্তব্ধতা শ্বাসরুদ্ধকর। তারপর ঝনঝন শব্দে একসঙ্গে বেজে উঠল অনেকগুলো মন্দিরা, তারই সঙ্গে চঞ্চলা হরিণীর মত ছুটে এসে স্পটলাইটে দাঁড়াল মিস ফারাহ।

দীর্ঘ কয়েক মুহূর্ত একচুল নড়ল না, এক পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ঠিক যেন একটা ব্রোঞ্জ মূর্তি। তারপর আবার ড্রিম-দ্রাম আওয়াজ তুলে বেজে উঠল ড্রাম, সেই সঙ্গে ধীর গতিতে স্থির অঙ্গবিন্যাস ভেঙে পড়ল, ক্রমশ অস্থির ও ক্ষিপ্র হয়ে উঠল সোনালি অঙ্গনা। এই নাচ আগে কখনও দেখেনি রানা, তারপরও অচেনা নয়; আসলে তিন ধরনের নর্তকীর ভূমিকায় একাই অবতীর্ণ হয়েছে মেয়েটি–বেলী ডান্সার, গো-গো গার্ল ও স্ট্রিপার।

মুগ্ধ বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে পড়ল দর্শকরা। তার পাঁচমিশালি নাচে মিশরীয় সংস্কৃতির ছোঁয়া কতটুকু বলা কঠিন, তবে রানার সন্দেহ হলো এই মেয়ে ভারতীয় নৃত্যশিল্পে ভালই তালিম নিয়েছে। পরনে যতটুকু না কাপড় তারচেয়ে বেশি পাখির পালক, বাহারি রঙের চুমকি বসানো থাকায় কাপড়ে যেন লাল-নীল-সবুজ-গোলাপী আর সাদা আগুন লেগে আছে, আলো প্রতিফলিত হওয়ায় ধাঁধিয়ে যাচ্ছে চোখ। পা খালি, বাদ্যের সঙ্গে ছন্দ বজায় রেখে মাঝেমধ্যে গোড়ালি ঠুকছে স্টেজের মেঝেতে। কব্জি আর গোড়ালিতে জ্যান্ত হয়ে উঠল কেয়ূর, বাজুবন্ধ, মল ও ঘুঙুর। একটি মাত্র চোখ ধাঁধানো আলো নাছোড়-প্রেমিকের মত অনুসরণ করছে তাকে। গম্বুজ আকৃতির জোড়া স্তনের থরথর কম্পন আর উথলে ওঠার ভাব দেখে মনে হলো ওগুলোর যেন আলাদা একটা করে মোটর আছে। স্পটলাইটের আলোয় হলুদবরণ আরও উজ্জ্বল লাগছে, যেন তরল সোনায় গোসল করিয়ে দিয়েছে কেউ।

মন্দিরা আর ড্রামের শব্দ দ্রুত থেকে দ্রুততর হচ্ছে, সেই সঙ্গে মধ্যরাতের মত নিকষ কালো কেশরাশি নিয়ন্ত্রণহীন দিগ্বিদিক উড়ছে, মাঝেমধ্যে ঢেকে দিচ্ছে তার পুরোটা ঊর্ধ্বাঙ্গ।

রানার মনে ছিল। ছিল বলেই ঘাড় ফিরিয়ে পাশের টেবিলে তাকাল। চেয়ার ছেড়ে চলে গিয়েছিল হিটলার। নীলচে বিজনেস

সুটে কোন পরিবর্তন নেই, শুধু বদল হয়েছে মুখোশটা—হিটলার এখন বাঘ। স্বভাবতই খুঁতখুঁতে একটা ভাব জাগল রানার মনে। লোকটা কি বাঘ সেজেছে ওর দেখাদেখি? সেক্ষেত্রে নিশ্চয়ই তার কোন উদ্দেশ্য আছে। সেটা কি, বুঝতে হলে প্রথমে জানতে হবে মুখোশের আড়ালে কে সে।

রানার ঘাড় ফেরানো টের পেয়েছে বাঘ। ধীর, সবিনয় ভঙ্গিতে মাথাটা একবার ঝাঁকাল সে—যেন এক বাঘ আরেক বাঘকে সম্মান জানাচ্ছে।

'আপনার মত আমরাও এনা-র বিশেষ সংবাদদাতা,' রানার ডান পাশ থেকে বলল প্রকাণ্ড ঘুঘু।

আমরা বলতে ঘুঘু ক'জনকে বোঝাচ্ছে? নিজের বাম পাশে তাকিয়ে গরিলাকে দেখল রানা, তাকাতেই মাথা ঝাঁকাল গরিলা। এতক্ষণে পরিষ্কার হয়ে গেল ওদের পরিচয়। গরিলার কাঠামোই বলে দিচ্ছে সে আমান মোহাম্মদ। আরও বড় প্রমাণ তার এক হাতে তসবি, অপর হাতে মোবাইল ফোন। ঘুঘুটা নিশ্চয়ই মালুই সুকায়া। তারমানে পাশের টেবিলে ওদেরই সঙ্গী—রোহিঙ্গা সন্ত্রাসী গোষ্ঠির লীডার। ওরাও যে ই.এন.এ-র নিজস্ব সংবাদদাতার ভুয়া পরিচয়ে লেটিস দ্বীপে এসেছে, এ-খবর পলির কাছ থেকে আগেই জেনেছে রানা।

এভাবে ওকে ঘিরে বসার মানেটা কি? সন্দেহজনক চরিত্র আরও বেশ কয়েকজন রয়েছে আশপাশে। কোরিয়ান লোকটার সঙ্গে লুকাস এয়ারলাইন্স অফিসারদের বেশ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক লক্ষ করেছে রানা। লক্ষ করেছে বুলডগের সঙ্গে সিংহের, অর্থাৎ কোরিয়ান লোকটার সঙ্গে নেপালী বৃদ্ধের অন্তরঙ্গতা। রানার দৃঢ় বিশ্বাস, এরা কেউ স্রেফ বেড়ানোর জন্যে লেটিসে আসেনি, এসেছে গোপন কোন কাজে। এমনকি ল্যাটিন গিটারিস্ট আর

ক্যামেরম্যানকেও রানা সন্দেহের চোখে দেখছে—যদিও এই মুহূর্তে ক্যামেরম্যানের সঙ্গে তার বন্ধুটি ক্যাবারেইতে নেই।

'নরেশ বাবু, আদাব,' গরিলা, অর্থাৎ আমান মোহাম্মদ অস্ফুটে বলল।

স্টেজের দিকে চোখ, দৃষ্টি না ফিরিয়েই বিড়বিড় করল রানা, 'নমস্কার।'

'শুনলাম আপনার সমস্যা নাকি রেফারেন্স নিয়ে,' এবার বাংলায় বলল আমান। 'আমরাও তো উপমহাদেশের প্রতিনিধিত্ব করছি, কাজেই আমাদের সহযোগিতা আপনার উপকারে আসতে পারে।'

সন্দেহ নেই, ক্যারলিনের সঙ্গে এদের কথা হয়েছে। কি কথা হয়েছে সেটা অবশ্য বলা মুশকিল। ক্যারলিন হয়তো লুকাস ডেভেনপোর্টের তরফ থেকে জানতে চেয়েছে, নরেশ বড়ুয়াকে ওরা চেনে কিনা, বা আলাপ করে বের করা সম্ভব কিনা লেটিস দ্বীপে কি উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছে ও। ওর ব্যাপারে লুকাস ডেভেনপোর্টের লোকজন হঠাৎ খোঁজ খবর নিচ্ছে, এমন মনে করার কারণ নেই। রানা গত শনিবার সকালে লেটিসে আসার অনুমতি চেয়ে ফর্ম পূরণ করেছে, জানা কথা গত চার দিন ধরে ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে ভারতের উত্তর-পুব রাজ্য মেঘালয়, আসাম, ত্রিপুরা ও মিজোরামের জঙ্গি গোষ্ঠি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেছে ডেভেনপোর্ট ইন্টেলিজেন্স। নরেশ বড়ুয়া সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য পেয়েছে তারা, আবার অনেক জরুরী তথ্য পায়ওনি। সেজন্যেই হয়তো পরিচিত এবং ওই একই এলাকার অধিবাসী আমান গংকে ধরেছে, যদি কোন সাহায্য পাওয়া যায় ভেবে। আর আমান সম্ভবত সেই সুযোগে রেফারেন্স সাপ্লাই দেয়ার নাম করে জানতে চেষ্টা করছে তার, তাদের বা লুকাস ডেভেনপোর্টের বিরুদ্ধে নরেশ বড়ুয়া কোন

হুমকি কিনা। ‘ধন্যবাদ,’ আমানকে বলল রানা। ‘কিন্তু আগে তো আমাকে জানতে হবে কার সঙ্গে কি নিয়ে আলাপ করব, তা না হলে রেফারেন্স আমার কি কাজে লাগবে?’

‘ইম লী সু আপনার ছায়া হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, লক্ষ করেননি?’ মুখোশের ভেতর হাসির শব্দ হলো। ‘উনিই তো আলাপ করার প্রথম মাধ্যম। দ্বিতীয় মাধ্যম কিম উন। তবে আমার পরামর্শ হলো, রেফারেন্স ছাড়া কথা বলতে যাওয়াটা নেহাত বোকামি হবে।’

‘আমি কোন মাধ্যম চাই না,’ বলল রানা। ‘কথা যদি বলি তো সরাসরি কর্তার সঙ্গেই বলব।’

মাথা নাড়ল গরিলা। ‘সেল সি সা জুসাইও প্রথম পর্যায়ে কারও সঙ্গেই সরাসরি আলাপ করেন না।’

‘রিসর্ট ফ্যাসিলিটির ম্যানেজার? উঁহুঁ, তার সঙ্গে আমার কোন আলাপ নেই। আমি সরাসরি লুকাস ডেভেনপোর্টের সঙ্গে কথা বলতে চাই।’

‘এ-ধরনের ব্যবসা করার কথা খোদ মালিক কি কখনও স্বীকার করেন, না আলাপ করার ঝুঁকি নেন? তাছাড়া, তাঁকে আপনি পাচ্ছেন কোথায় যে আলাপ করবেন?’

‘সেক্ষেত্রে এবার শুধু বেড়িয়েই ফিরে যাব,’ বলল রানা। ‘পরে যদি আসি, লুকাস ডেভেনপোর্টকে পাব জেনেই আসব।’

‘প্রতিটি খেলার নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম থাকে,’ বলল আমান। ‘আপনি দেখা যাচ্ছে নিয়ম মেনে খেলতে রাজি নন।’

‘ঠিক ধরেছেন–আমি আসলে নিজের নিয়মে খেলি।’

‘কিন্তু আপনি এখন লেটিসে রয়েছেন, ওদের হাতের মুঠোয়, এই বাস্তবতা ভুলে গেলে চলবে কেন!’

‘বাস্তবতার আরও একটা পিঠ আছে,’ বলল রানা, মুখোশের

ভেতর সশব্দে হাসল। 'ওরা আমার সম্পর্কে নিশ্চয়ই খোঁজ নিয়েছে—জানে আমি কে, জানে নিজেকে আমি রক্ষা করতে জানি।' কথাটা মিথ্যে নয়। নরেশ বড়ুয়া 'উলফা'-র দুর্ধর্ষ একজন যোদ্ধা, বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে তৎপর বিশাল এক গেরিলা বাহিনীর নেতৃত্ব দেয়, সেনা-ছাউনিতে অতর্কিতে হামলা চালিয়ে বন্দী গেরিলা মুক্ত করে আনে। আপাতদৃষ্টিতে দেখা না গেলেও, বিদেশে কখনও গেলে অত্যন্ত দক্ষ ও আত্মঘাতী একদল দেহরক্ষী তার অবস্থান মনিটর করে, প্রয়োজনে তারা প্রাণ দিয়ে হলেও নরেশ বড়ুয়াকে রক্ষা করবে। একরকম আরও কিছু তথ্য ইন্টারনেটে ছেড়ে দেয়া আছে, ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই তা সংগ্রহ করেছে লুকাস ইন্টেলিজেন্স।

'আপনি আমাকে সম্ভবত ভুল বুঝছেন,' বলল আমান মোহাম্মদ। 'আমি কিন্তু ওদের পক্ষে ওকালতি করছি না। আপনি যদি সত্যি নরেশ বড়ুয়া হন, আপনাকে সাহায্য করাই আমাদের উদ্দেশ্য।'

'সন্দেহ আছে নাকি?'

'ওদের হয়তো নেই,' বলল আমান। 'তবে আমাদের একজনের আছে।' ইঙ্গিতে পাশের টেবিলের বাঘটাকে দেখাল। 'ওর নাম সাইদ আরাকানী। ও রোহিঙ্গা, মুসলমান।'

ইতিমধ্যে মিস ফারাহ-র উদ্দাম নাচ দর্শকদের উন্মাদ করে তুলেছে। হলঘরে প্রচণ্ড কোলাহল; চিৎকার-চেঁচামেচি আর শিসের আওয়াজে কান পাতা দায়।

'উলফার কয়েকজন লীডারকে চেনে সাইদ,' আবার বলল আমান। 'আপনিও যদি তাদেরকে চেনেন, ওর মনে আর কোন সন্দেহ থাকবে না।'

মনে মনে প্রমাদ গুণল রানা। রোহিঙ্গা সন্ত্রাসী সুট পরা ব্রুট

সাইদ আরাকানী দেখা যাচ্ছে ওর নিরাপত্তার জন্যে বিরাট হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর একমাত্র সমাধান লোকটাকে খুন করা। কিন্তু ঠাণ্ডা মাথায়, শুধু নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবার ভয়ে কাউকে খুন করা ওর পক্ষে সম্ভব নয়। তাছাড়া, চাইলেও সবার চোখ ফাঁকি দিয়ে কাজটা করা যাবে না। 'যদি প্রমাণ হয় আমি উলফার কেউ নই, তাহলে কি হবে?'

'সিদ্ধান্ত নেবে জুসাইও। আমাদের কাজ হবে তাঁকে রিপোর্ট করা—সু আর উন-এর মাধ্যমে।'

'আর পরীক্ষায় যদি পাস করি?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'তোমরা সুপারিশ করবে, আমি যাতে ট্রিপলহেডার পাই?'

'ট্রিপলহেডার? মানে?' আকাশ থেকে পড়ার ভান করল আমান। 'সেটা আবার কি?'

ধৈর্য না হারিয়ে রানা বলল, 'তাহলে তুমিই বলো, লেটিসে কেন আমি এসেছি? জুসাইওর সঙ্গে আলাপ করার জন্যে রেফারেন্স দরকার বলছ—কি নিয়ে আলাপ করার জন্যে? তোমরাই বা কি উদ্দেশ্য নিয়ে লেটিসে এসেছ?'

বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে আমান জবাব দিল, 'আমরা এসেছি হেরোইনের সাপ্লাই নিয়ে। সুং-এর ধারণা, তুমিও হেরোইন বিক্রি করতে চাও।'

'লুকাস ডেভেনপোর্ট শুধু বিলিওনেয়ার ব্যবসায়ী নন, সবাই জানে সততা ও ন্যায়নীতির সঙ্গে তিনি কখনও আপস করেন না। তিনি হেরোইনের ব্যবসা করেন, এ আমি বিশ্বাস করি না।'

আমান হাসল। 'কে বলল মি. ডেভেনপোর্ট হেরোইনের ব্যবসা করেন? আমাদের ক্রেতা তিনি নন—ক্রেতা মি. জুসাইও।' একটু থেমে সকৌতুকে জানতে চাইল, 'ট্রিপলহেডার জিনিসটা কি? ওটা দিয়ে কি হয়?'

এবার রানা হাসল। 'ট্রিপলহেডার একটা ঢিল। যে ঢিল দিয়ে তুমি সাভারের স্মৃতিসৌধ, শহীদ মিনার আর বাংলাদেশে যেখানে যত মূর্তি আছে সব ভেঙে ফেলতে চাও। নীতিগতভাবে আমিও শান্তি ও স্থিতিশীলতার বিরোধী, আমান মোহাম্মদ। কাজেই তোমার এই কাজে আমার নৈতিক সমর্থন আছে।'

জবাব দিতে একটু দেরি করল আমান। 'তুমি বিপজ্জনক একটা এলিমেন্ট, নরেশ বড়ুয়া। মনে হচ্ছে জাদু-টাদু জানো, তা না হলে আমার মনের কথা…হায় আল্লাহ, তুমি তো দেখছি আমার নামও জানো!'

'এখন নিশ্চয় বুঝতে পারছ, হেরোইনের গল্প শুনিয়ে আমাকে বোকা বানানো যাবে না? আমার সঙ্গে হাত মেলাও, আমান। আখেরে তাতে তোমাদেরই মঙ্গল। তুমি ট্রিপলহেডার পেলে তোমার আব্বাজান মৌলবাদী রাজনৈতিক দলটির আমীর হয়ে বাংলাদেশকে তালেবানদের দুর্গম ঘাঁটি বানাতে পারবেন, আর ওই মিসাইল আমি পেলে উলফা বাংলাদেশের পাশে স্বাধীন একটা রাষ্ট্র গঠন করতে পারবে। এখন যদি তুমি আমাকে সাহায্য করো, ভবিষ্যতে আমরা তার প্রতিদান দেব—তালেবানদের সঙ্গে উলফার হবে গলায় গলায় ভাব…'

'বলো কিভাবে আমি তোমার সাহায্যে আসতে পারি।'

'লেটিস ত্যাগ করার আগে অন্তত এক ডজন ট্রিপলহেডার সঙ্গে করে নিয়ে যেতে চাই আমি। কি রকম দাম পড়বে, কিভাবে পেমেন্ট করতে হবে…'

'একেকটার দাম ধরা হয়েছে পাঁচ মিলিয়ন মার্কিন ডলার,' বলল আমান। 'পুরো প্যাকেজের দাম পড়বে একশো পঁচিশ কোটি ভারতীয় রূপী। পুরো প্যাকেজ মানে পঁচিশটা মিসাইল সহ একটা সসার। পুরো টাকা জুসাইওর সুইস ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা

করতে হবে প্রথমে। টাকা জমা হয়েছে, এ-খবর পাবার পর মাঝ সমুদ্রে তোমাকে একটা জাহাজ নিয়ে অপেক্ষা করতে বলা হবে। তিন দিনের মধ্যে ওখানে ডেলিভারি দেয়া হবে কার্গো।'

'আমি তাহলে ট্রিপলহেডার সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারব না?'

'লেটিস থেকে? নাহ্! ট্রিপলহেডার তৈরি করা হচ্ছে এখান থেকে বহু দূরে, অন্তত একশো মাইল দূরে কোনও নির্জন দ্বীপে। স্বভাবতই সেই দ্বীপের হদিশ ওরা কাউকে বলতে রাজি নয়।'

'লুকাস ডেভেনপোর্ট কি সত্যি এই ব্যবসার সঙ্গে জড়িত নন?'

'অবশ্যই জড়িত। তিনি পুঁজি না ঢাললে কি এত বড় একটা প্রকল্প নিয়ে এগোতে পারতেন জুসাইও?'

'পুঁজি ঢাললেন ডেভেনপোর্ট, অথচ ট্রিপলহেডার বিক্রির টাকা জমা হবে জুসাইওর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে, ব্যাপারটা কি?'

'এত সব ব্যাপারে মাথা ঘামিয়ে আমাদের কাজ কি!' বলল আমান। 'আমাদের যা দরকার তা পেলেই তো হলো, না কি?'

'তা ঠিক।'

'আমরা তাহলে আজ থেকে বন্ধু হলাম,' হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল আমান। 'তবে ইম লী সু আর কিম উন যেহেতু আমাদেরকে একটা দায়িত্ব দিয়েছেন, সাইদ আরাকানীর সঙ্গে অবশ্যই একবার আলাপ করতে হবে তোমাকে। সেটা আজ হলেই ভাল হয়।'

'আজই কেন?'

'কারণ মি. জুসাইও বলে দিয়েছেন, মি. ডেভেনপোর্ট লেটিস ভিজিট করার সময় ক্রেতা বা সম্ভাব্য ক্রেতা কারুরই এখানে থাকা চলবে না।'

'কবে আসছেন তিনি?'

'শনিবারে আসবেন বলে শুনতে পাচ্ছি। কাজ সেরে শুক্রবারেই ফিরে যেতে হবে আমাদেরকে। তার মানে, তোমার

পরিচয় সম্পর্কে মি. জুসাইওকে সাইদ যদি আজ নিশ্চিত করতে পারে, ট্রিপলহেডার দরদাম করা আর ব্যাংকে টাকা জমা করার জন্যে হাতে মাত্র ছত্রিশ ঘণ্টা সময় পাচ্ছ তুমি। কিনতেই যখন এসেছ, নিশ্চয়ই টাকার ব্যবস্থা করা আছে তোমার?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'আমার কাছে মাস্টার কার্ড আছে।'

'তবু ছত্রিশ ঘণ্টা খুব বেশি সময় নয়। তোমার মাস্টার কার্ড ভ্যালিড কিনা খোঁজ নিতেও তো সময় লাগবে ওদের। তাই বলছি, আমি চাই এই নাচ শেষ হলেই সাইদের সঙ্গে কথা বলো তুমি। সাইদ ও. কে. করলে লী সু তোমার সঙ্গে আলাপ করবে।'

জেদ ধরে কোন লাভ নেই, এড়ানো সম্ভব নয়, অগত্যা রাজি হয়ে গেল রানা। 'ঠিক আছে। আরেকটা কথা, আমান। আমাদের চারজনের কার্গো একই জাহাজে ডেলিভারি নিতে পারলে সব দিক থেকে সুবিধে হয়। মালুই সুকায়া তার ট্রিপলহেডার নিয়ে শ্রীলঙ্কায় নেমে গেল। বাকি তিনজনের কার্গো বঙ্গোপসাগর হয়ে কক্সবাজারে নিয়ে গিয়ে খালাস করলেই চলবে।'

আমান হাসল। 'তোমার দেখছি চমকের কোন অভাব নেই, বন্ধু। কৌশলে জানিয়ে দিলে মালুই সুকায়াকেও তুমি চেনো।'

রানা চুপ করে থাকল। সাইদ-সমস্যার সমাধান খুঁজছে ও।

আমান আবার বলল, 'তুমি আসলে নিজের কার্গো আসামে নিয়ে যাবার জন্যে বাংলাদেশের ভেতর নিরাপদ প্যাসেজ চাইছ, তাই না?'

হাসল রানা। 'বন্ধু হয়ে বন্ধুর এই সামান্য উপকারটা তুমি করবে না?'

'অবশ্যই করব, তবে এই উপকারের বিনিময়ে আমারও কিন্তু একটা উপকার পাওনা হবে।'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।'

আবার ওরা মন দিল নাচে। দর্শকরা হঠাৎ সবাই একদম শান্ত হয়ে গেছে। কারণ, মিস ফারাহ্ তার নাচের শেষ পর্বে পৌঁছাতে যাচ্ছে। এই শেষ দৃশ্যটা দেখার জন্যেই সবাই এখানে এতক্ষণ ধৈর্য ধরে বসে আছে।

ড্রাম ও মন্দিরার উদ্দাম বাজনার সঙ্গে তাল ও ছন্দ বজায় রেখে অকস্মাৎ মেয়েটি তার কস্টিউম-এর টপ খসে পড়তে দিল স্টেজের মেঝেতে। কৃষ্ণকালো বিপুল কেশরাশি নিশ্ছিদ্র পর্দার মত উড়ে এসে ঢেকে দিল পেট আর বুক, এক পলকের জন্যে ফাঁক হতে শুরু করেই আবার বন্ধ হয়ে গেল।

সোনালি মেয়ের নাভীর ওপর কোন বস্ত্র নেই, অথচ দর্শকরা কিছুই দেখতে পাচ্ছে না, হৈ-হট্টগোল শুনে বোঝা গেল সেটাই তাদের অসন্তুষ্টির মূল কারণ। নিষেধের কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে অনেকেই চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে, চিৎকার করে মিস ফারাহকে সম্পূর্ণ বিবস্ত্র হতে বলছে। এমনকি দু'একজনকে স্টেজের দিকে ছুটে যেতেও দেখা গেল। রানা লক্ষ করল, তাদের মধ্যে একটা বাঘও আছে। পাশের টেবিলে তাকিয়ে দেখে চেয়ারে সাইদ আরাকানী নেই।

শুধু নামেই নয়, লুকাস ফাইভ স্টার আসলেও আন্তর্জাতিক মানের হোটেল, স্বভাবতই এরকম অভদ্রতা এখানে আশা করা যায় না। কিন্তু যা আশা করা যায় না তাই ঘটছে এখন। হোটেলের দশ-বারোজন সিকিউরিটি অফিসার আগে থেকেই তৈরি ছিল, এ থেকে বোঝা যায় প্রায়ই এখানে এ-ধরনের ঘটনা ঘটে।

রানা দেখল, সুট পরা ব্রুট সাইদ আরাকানীর দেখাদেখি দশ-বারোজন লোক স্টেজে উঠতে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে হল ভর্তি সব মানুষ। সিকিউরিটি অফিসাররা হুইসেল বাজিয়ে ছুটোছুটি করছে, চিৎকার করে সংযম অনুশীলনের

অনুরোধ করছে, স্টেজের সামনে থেকে হাত ধরে টেনে আনছে সম্মানিত বোর্ডারদের।

সবার চোখ ফাঁকি দিয়ে সাইদ আরাকানী স্টেজে তো উঠেছেই, চরম দুঃসাহসের পরিচয় দিয়ে মিস ফারাহর গায়ে হাত দিয়ে বসেছে সে। মেয়েটি আতঙ্কে নীল হয়ে গেছে, ঠক ঠক করে কাঁপছে ভয়ে, তারপর অকস্মাৎ রোহিঙ্গা সন্ত্রাসীর বুকে ধাক্কা দিয়ে ছুটল সে। সে-ও ছুটল, সাইদও তাকে ধাওয়া করল, শুরু হলো স্টেজ জুড়ে ছুটোছুটি।

ভুল বোঝাবুঝি এড়াবার জন্যে মুখোশটা খুলে ফেলে দিল রানা, তারপর তিন লাফে স্টেজের সামনে এসে আরেক লাফে উঠে পড়ল ওপরে। তেমন কিছু করার প্রয়োজন হলো না, সাইদকে পাশ কাটাতে দেখে শুধু একটা পা বাড়িয়ে দিল ও। ল্যাং খেয়ে স্টেজের ওপর দড়াম করে আছাড় খেলো সে। পরমুহূর্তে পিছন থেকে ওকে আঁকড়ে ধরে অদম্য কান্নায় ভেঙে পড়ল মেয়েটি।

স্টেজে আরও কয়েকজন উন্মাদ উঠে পড়েছে, তাদের দিকে ঘোরার আগে ধরাশায়ী সাইদকে প্রচণ্ড একটা লাথি মারল রানা। রোহিঙ্গা সন্ত্রাসী ছিটকে পড়ে গেল স্টেজের নিচে। ছুটে এসে তার সেবা-শুশ্রূষার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠল আমান মোহাম্মদ আর মালুই সুকায়া। সেদিক থেকে চোখ সরিয়ে স্টেজে উঠে আসা লোকগুলোর দিকে তাকাল রানা। 'এই মুহূর্তে মধ্যে নেমে যাও, তা না হলে সোজা হাসপাতালে পাঠিয়ে দেব।'

পাঁচ সেকেন্ডেই খালি হয়ে গেল স্টেজ। জ্যাকেটটা খুলে মেয়েটির গা ঢাকল রানা, নরম সুরে বলল, 'আর কোন ভয় নেই। তবে এখন আর স্টেজে থাকা ঠিক হবে না, তুমি ড্রেসিংরুমে চলে যাও।'

মেয়েটিও ইংরেজিতে জবাব দিল, 'কিন্তু কর্তৃপক্ষের নির্দেশ আছে, যত কিছুই ঘটুক, শো শেষ করতে হবে।'

'হবে না,' বলল রানা। 'কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আমি বুঝব, তুমি যাও।'

গোটা হলরুম এখনও অন্ধকার, স্টেজে রানা ও মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে স্পটলাইটের মাঝখানে। মেয়েটির সন্ত্রস্ত ও ইতস্তত ভাব লক্ষ করে অবাক হলো ও। এই সময় আবার বেজে উঠল ড্রাম ও মন্দিরা।

'আপনি নেমে যান,' মিনতির সুরে বলল মেয়েটি। 'নাচটা আমাকে শেষ করতে দিন, প্লীজ।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে স্টেজ থেকে নেমে এল রানা। নেমেই দেখল ওর টেবিল ফাঁকা হয়ে গেছে—গরিলা, ঘুঘু, বাঘ, বুলডগ, ড্রাকুলা ও সিংহ টেবিল ছেড়ে চলে গেছে। একাই বসল রানা। ফেলে যাওয়া মুখোশটার খোঁজে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে ও, এই সময় হঠাৎ নারীকণ্ঠের আর্তনাদ ঢুকল কানে।

ঝট করে মুখ তুলতেই রানা দেখল, হাতে একটা ছুরি নিয়ে আবার স্টেজে উঠে পড়েছে সাইদ আরাকানী। তার পিছু নিয়ে আমান ও মালুই সুকায়াও উঠতে যাচ্ছে স্টেজে।

আবার দর্শকরা চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। সিকিউরিটি অফিসাররা হাতে হাত ধরে কর্ডন করে রাখল সবাইকে, স্টেজের দিকে কাউকে এগোতে দেবে না। তিন-চারজন অফিসার স্টেজে উঠে পড়ল, মালুই সুকায়া আর আমান মোহাম্মদের সাহায্যে নিরস্ত্র করার চেষ্টা করছে সাইদ আরাকানীকে।

চার-পাঁচজন মিলেও সাইদকে ধরে রাখা যাচ্ছে না। ধস্তাধস্তি করতে করতে মেয়েটির দিকে এগোবার চেষ্টা করছে সে। মেয়েটি, ফারাহ, ভীত সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে পিছু হটছে।

এই সময় চিৎকার শুরু করল সাইদ। রানাকে হতভম্ব করে দিয়ে বাংলায় অশ্রাব্য গালিগালাজ শুরু করল সে। একা রানাকে নয়, মেয়েটিকেও।

‘ওই বেশ্যা মাগী! তোর নাগর আমাকে লাথি মারল ক্যান? ডাক শালাকে, স্টেজে উঠে আসতে বল, মালাউনের বাচ্চার আমি মুসলমানী করব...’

রানার চারপাশে লোকজন ছুটোছুটি শুরু করল। সবাই বুঝতে পারছে ব্যাপারটা সিরিয়াস হয়ে উঠেছে, যে-কোন মুহূর্তে একটা মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে যেতে পারে। সেই ভয়েই হলরূম থেকে একযোগে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করছে সবাই। অন্ধকারে এই সুযোগটাই নিল রানা। সাইদ ওকে শুধু অপমান করছে না, সে এতটাই মরিয়া হয়ে উঠেছে যে মেয়েটিকে খুন করে বসলেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

ছুরিটা আগেই বেরিয়ে এসেছে হাতে, কব্জির ক্ষিপ্র ঝাঁকি খেয়ে ছুটল সেটা। এরচেয়ে আদর্শ সময় আর হয় না। দু’জন সঙ্গী আর সিকিউরিটি অফিসারদের হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ফারাহর দিকে ছুটছে সাইদ, ঠিক এই সময় গলায় হাত তুলল সে। পরমুহূর্তে আঙুলের ফাঁক গলে ঝরঝর করে রক্ত ঝরতে দেখা গেল।

ছুরির ফলা কোথায় ঢুকেছে দেখার জন্যে অপেক্ষা করেনি রানা, ভিড়ের সঙ্গে মিশে দরজার দিকে এগোতে শুরু করেছে।

দরজার কাছে পৌঁছবার আগেই হলরূমের আলো জ্বলে উঠল। তারপরই আমান মোহাম্মদের তীক্ষ্ণ আর্তনাদ শুনতে পেল রানা।

‘অ্যামবুলেন্স! প্লীজ! অ্যামবুলেন্স!’

ক্যাবারেই থেকে বেরুবার আগে ঘাড় ফিরিয়ে একবার স্টেজের দিকে তাকাল রানা। কয়েকজন সিকিউরিটি অফিসারের

সাহায্যে আমান ও সুকায়া তাদের সঙ্গী সাইদ আরাকানীকে ধরাধরি করে স্টেজ থেকে নামাতে ব্যস্ত। স্পটলাইট এখনও স্থির, তার মাঝখানে কাত হয়ে পড়ে রয়েছে মেয়েটি। তারপর উঠে দাঁড়াল সে। তার সামনে মুখোশ ছাড়াই গম্ভীরদর্শন কোরিয়ানকে দেখা যাচ্ছে। ভঙ্গিটা নরম, ফারাহকে কি যেন বলছে। তারপর লোকটা হাত রাখল তার কাঁধে। কোরিয়ানের কব্জি সরিয়ে দিল ফারাহ, পিছু হটল এক পা। লোকটা আবার এগোল, তার কানে ফিসফিস করল জরুরী তাগাদার ভঙ্গিতে। পাথরের মূর্তি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল মেয়েটি। তারপর যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও মাথা ঝাঁকাল সে। লোকটা স্টেজ থেকে নেমে এল।

এরপর মুখ তুলে কাকে যেন খুঁজতে শুরু করল ফারাহ। এক সময় চোখাচোখি হলো রানার সঙ্গে। দ্রুত চোখ সরিয়ে নিয়ে উইং দিয়ে স্টেজ থেকে বেরিয়ে গেল সে।

চার

ক্যাসিনোয় ফিরে এসে বার-এ বসল রানা। জানালার ধারে বসেছে, এখান থেকে সুইমিং পুল আর লুকাস ইন-এর পাঁচিল ও গেটটা পরিষ্কার দেখা যায়।

একে তো স্টেজে শুধু স্পটলাইট ছাড়া হলরূমের কোথাও কোন আলো ছিল না, তার ওপর ভীত-সন্ত্রস্ত দর্শকরা ছুটোছুটি করছিল, কাজেই রানা নিশ্চিত ছুরিটা থ্রো করতে কেউ ওকে দেখেনি। তবু উত্তেজিত হয়ে আছে ও, খানিকটা উদ্বিগ্নও–সাইদ মারা গেলে দুইয়ে দুইয়ে চার মিলিয়ে আমান আর সুকায়া খুনী হিসেবে ওকেই সন্দেহ করবে। জুসাইও, কিংবা হয়তো তার প্রতিনিধি হিসেবে ইম লী সুং সাইদকেই দায়িত্ব দিয়েছিল নরেশ বড়ুয়া সত্যি উলফার গেরিলা লীডার কিনা যাচাই করে দেখার। সাইদ মারা গেলে ব্যাপারটা সহজে যাচাই করার আর কোন উপায় থাকে না। এক্ষেত্রে নরেশ বড়ুয়াই লাভবান হবে। সুতরাং তারাও ওকে খুনী বলে সন্দেহ করবে।

উভয়সংকটে পড়ে যাচ্ছে রানা। ছুরির আঘাতে সাইদের যদি মৃত্যু না হয়, একটু সুস্থ বোধ করলেই তার সামনে হাজির করা হবে ওকে। বেশিক্ষণ আলাপ করতে হবে না, সাইদ বুঝতে পারবে নরেশ বড়ুয়ার মিথ্যে পরিচয়ে লেটিসে এসেছে ও। তারপর শুরু হবে টরচার। লেটিস ব্যক্তিমালিকানাধীন দ্বীপ, এখানে না আছে পুলিস, না আছে বাহামা সরকারের কোন রকম নিয়ন্ত্রণ, মাথা কুটে

মরলেও কেউ সাহায্য করতে আসবে না।

রিসর্ট ফ্যাসিলিটির ম্যানেজার জুসাইওর বাদামী সুট পরা প্রাইভেট সেক্রেটারিরা খুব ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছে। ওদের মধ্যে শুধু মারটিনের নাম জানে রানা, আর চেনে ক্যারলিনকে। ওদের দু'জনকে লুকাস ইনে একবার করে ঢুকতে ও বেরুতে দেখল রানা। একটা অ্যামবুলেন্সও দেখল, সম্ভবত হাসপাতাল থেকে এল। লুকাস ইনের গেটের সামনে থামল গাড়িটা, তবে কোন স্ট্রেচার বা পেশেন্ট দেখা গেল না। অ্যামবুলেন্স থেকে নামল আমান আর সুকায়া। তাদের সঙ্গে অবশ্য বাদামী সুট পরা দু'জন স্মার্ট শ্বেতাঙ্গ তরুণও রয়েছে। কোন দিকে না তাকিয়ে গেট খুলে ভেতরে ঢুকল চারজন। অ্যামবুলেন্স আবার ফিরে গেল।

দশ মিনিট পর জানালার বাইরে ফারাহকে দেখতে পেল রানা। সুইমিং পুলের দিক থেকে আসছে সে, যাচ্ছে লুকাস ইনের দিকে। ফ্লাডলাইটের আলোয় সাদা ও ঢোলা ড্রেস জ্বলজ্বল করছে। তার দু'পাশে বাদামী সুট পরা একজন করে শ্বেতাঙ্গ তরুণ। হনহন করে হাঁটছে তারা, ফলে বাধ্য হয়ে মেয়েটিকেও ইচ্ছার বিরুদ্ধে দ্রুত পা চালাতে হচ্ছে। মেয়েটির চেহারাই বলে দিল, লুকাস ইনে ঢোকার কোন উৎসাহ নেই তার। তবে সে যে খুব বিপদে আছে, রানার তা মনে হলো না। লুকাস ইনের গেট ভেতর থেকে খুলে গেল। ভেতরের অন্ধকার গ্রাস করল তিন জনকে।

দ্বীপের হাসপাতালটা কোনদিকে জানা নেই রানার। জেনে নিতে কতক্ষণ, কিন্তু সেখানে এখন ওর যাওয়া উচিত হবে কিনা বুঝতে পারছে না। তবে এখানে, এই জানালার ধারে একটানা বসে থাকাটাও দৃষ্টিকটু। জুয়ার টেবিলে এসে খেলায় মন দিল।

দশ মিনিটও পার হয়নি, গম্ভীরদর্শন কোরিয়ানকে এগিয়ে

আসতে দেখল রানা। সে একা নয়, তার সঙ্গে হোটেলের দু'জন সিকিউরিটি অফিসার সহ আরও চার-পাঁচজন রয়েছে। সঙ্কট আঁচ করতে পেরে রানার হাতের তালু ঘেমে উঠল। এখন আর নিজেকে তিরস্কার করেই বা কি লাভ! তবে সময় ও যথেষ্টই পেয়েছে, ইচ্ছে করলে নিজের স্যুইট থেকে পিস্তলটা নিয়ে আসতে পারত। খেলা ছেড়ে রুলেত টেবিলের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াল রানা, নিজেকে যুক্তি দিল–ক্যাসিনো ভর্তি লোকজনের সামনে নিশ্চয়ই ওকে খুন করা হবে না।

রহস্য শুরু হলো কোরিয়ান লী সুর নেতৃত্বে দলটা দিক বদল করার পর। বার কাউন্টারের কাছাকাছি একটা টেবিল দখল করল ওরা, ভুলেও কেউ রানার দিকে তাকাচ্ছে না। ওর মুখোমুখি বসেছে ক্যারলিন, ক্যারলিনের পাশে মারটিন। বাকি দুটো চেয়ারে বসেছে আমান ও সুকায়া। সিকিউরিটি অফিসাররা দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। ওয়েটার ওদের টেবিলে শ্যাম্পেন পরিবেশন করল। কি নিয়ে বলা মুশকিল, নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছে ওরা।

আবার খেলায় ফিরল রানা, তবে রুলেত টেবিলের উল্টোদিকে দাঁড়িয়েছে এবার, অন্যসব খেলোয়াড়দের মাথার ওপর দিয়ে তাকালে ওদের টেবিলটা দেখতে পাচ্ছে।

রানা লক্ষ করল, দলটা যে টেবিলে বসেছে তার আশপাশের বেশ কয়েকটা টেবিল গুটিয়ে ফেলল ওয়েটাররা। উদ্দেশ্যটা পরিষ্কার, কেউ যাতে ওদের কথাবার্তা শুনতে না পায়। টেবিল ত্যাগ করতে হওয়ায় অনেকেই অপমান বোধ করল, বেরিয়ে গেল ক্যাসিনো ছেড়ে।

প্রায় দশ মিনিট পর আরেকজন কোরিয়ান ঢুকল ক্যাসিনোয়। এ লোকটা সুর মত খাটো নয়, যথেষ্ট লম্বা। তার মুখভাব ও

হাঁটাচলায় গম্ভীর কিছু না থাকলেও, আভিজাত্য আছে। তাকে দেখামাত্র চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সু, ক্যারলিন ও মারটিন। দুটো চেয়ার খালি রাখা হয়েছে, আগন্তুক তার একটায় বসল। রানা লক্ষ করল, তাকে দেখে বারম্যান-ওয়েটাররা ব্যস্ত ও সতর্ক হয়ে উঠেছে।

আরও প্রায় তিন মিনিট পর আবার চেয়ার ছাড়ল ক্যারলিন। তাকে হাসতে দেখে একটু অবাকই হলো রানা। সরাসরি এগিয়ে এসে মসৃণ, ফর্সা ও পেলব ডান বাহু লম্বা করল সে, মার্জিত সুরে বলল, 'আমাদের আলাপ হয়েছে, কিন্তু পরিচয় হয়নি। আমি জেনিফার ক্যারলিন, স্যার, মি. নরেশ বড়ুয়া–মি. সেল সি সা জুসাইওর প্রাইভেট সেক্রেটারি। স্যার, লুকাস রিসর্ট ফ্যাসিলিটির অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার মি. কিম উন আপনার সঙ্গে দু'একটা কথা বলতে চান। তিনি আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন। দয়া করে আপনি যদি আমার সঙ্গে একটু আসেন, প্লীজ!'

ক্যারলিনের সঙ্গে রানাকে আসতে দেখে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার কিম উন, মারটিন ও লী সু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। রানার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করল কিম উন। 'গ্ল্যাড টু মিট ইউ, স্যার, মি. বড়ুয়া। হ্যাভ আ সিট, প্লীজ।' রানা বসার পর বসল সে, জানতে চাইল, 'শ্যাম্পেন চলবে তো, স্যার?' মুখে কিছু না বলে মাথা ঝাঁকাল রানা। 'দেখুন দেখি কি বিচ্ছিরি একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল। রিসর্ট ম্যানেজমেন্টের তরফ থেকে সেজন্যে আমি দুঃখ প্রকাশ করছি, মি. বড়ুয়া, এবং আপনাকে বিব্রত হতে হওয়ায় করজোড়ে ক্ষমাপ্রার্থনা করছি।' শুধু মুখে নয়, দু'হাত এক করে বুকের সামনে তুলল সে।

'ইউ আর সো কাইন্ড, থ্যাঙ্ক ইউ,' সাবধানে বলল রানা।

'মি. সাইদ আরাকানী আমাদের, মানে, মালিক মি. লুকাস

ডেভেনপোর্টের সম্মানিত মেহমান ছিলেন, মাতাল অবস্থায় তিনি কি করেছেন না করেছেন, আসুন সে-সব ভুলে যাই আমরা, এবং ভুলে গিয়ে তার অশান্ত আত্মার জন্যে শান্তি কামনা করি।'

'উনি কি মারা গেছেন?' আঘাত পাবার ভান করতে হলো রানাকে।

'কেউ যদি এভাবে নিজের গলায় ছুরি ঢোকায়, বুঝতে হবে অনুতাপে দগ্ধ হয়ে আত্মহত্যার পথই বেছে নিয়েছে সে। হ্যাঁ, মি. বড়ুয়া, মি. সাইদ মারা গেছেন। কোন সন্দেহ নেই আত্মহত্যাই করেছেন তিনি।'

'এতটা নিশ্চিত হচ্ছেন কিভাবে?' প্রশ্নটা না করে পারল না রানা। দুটো ছুরি পাওয়ার পরও কেন ভাবছে ওরা আত্মহত্যা?

'স্টেজে যারা তাঁকে শান্ত করতে ওঠে তারা সবাই বলছে, তাঁর হাতেই শুধু ছুরি ছিল। তাঁকে অন্য কেউ ছুরি মেরেছে, এমনটি কেউ দেখেনি, অন্য কোন ছুরিও স্টেজে বা স্টেজের আশপাশে পাওয়া যায়নি। কাজেই ধরে নিতে হয় তিনি নিজেই নিজের গলায় ছুরি ঢুকিয়েছেন। সে যাই হোক, আসল কথা হলো, মি. বড়ুয়া, এই আত্মহত্যার খবর আমাদের রিসর্ট ব্যবসার স্বার্থে চেপে যেতে চাই আমরা। লাশ যথাযোগ্য মর্যাদায় তাঁর দেশে পাঠিয়ে দেয়া হবে, এ-ব্যাপারে সম্ভাব্য সবরকম সাহায্য করতে রাজি হয়েছেন আমাদের আরও দুই মেহমান মি. আমান ও মি. সুকায়া। এ-ব্যাপারে আপনার কোন পরামর্শ থাকলে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হবে।'

রানা বুঝতে পারল, ওর মুখ থেকে বিশেষ একটা বক্তব্য শোনার আশায় এত কথার অবতারণা করা হয়েছে। কিম উন থামতেই আমানের দিকে তাকিয়ে ও বলল, 'একই জাহাজে আমাদের সবার কার্গো তোলার ব্যাপারে আমরা তো আগেই

একমত হয়েছি, তাই না? সাইদের কার্গো যাচ্ছে না, বদলে আমরা তার লাশটা জাহাজে তুলে নিতে পারি, কি বলেন?'

আমান এবং সুকায়া একযোগে মাথা ঝাঁকাল।

'ভেরি গুড।' কিম উন স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে হাসল। 'এবার অন্যান্য আরও দু'একটা বিষয়। প্রথম কথা, মি. বড়ুয়া, রেফারেন্স বা পরিচয় নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি ঝামেলার মধ্যে আমরা নাহয় নাই গেলাম। আনুষ্ঠানিক আলোচনার সময় আপনি যদি ব্যাখ্যা করতে পারেন আলোচ্য কার্গোর খবর কোত্থেকে কিভাবে পেলেন, আর আপনার মাস্টার কার্ডের কোডটা জানান, তাহলেই আমরা আপনার সঙ্গে ব্যবসা করতে পারি।'

রানার মুখে গম্ভীর হাসি ফুটল। 'ব্যাখ্যা করা আমার জন্যে কোন সমস্যা নয়, তবে সে ব্যাখ্যা গ্রহণ করা না করা আপনাদের ব্যাপার। সত্যি কথা বলতে কি, গত শনিবারের টাইমস পড়ে আমার যেন দিব্যদৃষ্টি খুলে গিয়েছিল। দুইয়ে দুইয়ে চার মেলে কিনা দেখার জন্যে আন্দাজে ঢিল ছোঁড়ার সিদ্ধান্ত নিই, কারণ আপনাদের গুডস সত্যি আমার ভীষণ দরকার। ঢিল ছুঁড়লাম, আর সেটা লেগেও গেল—এর মধ্যে আর অন্য কিছু নেই। আর মাস্টার কার্ডের কোড? সেটা আমার হোটেল স্যুইটে আছে।'

'ঢিল ছোঁড়া বলতে আপনি ঠিক কি বোঝাতে চাইছেন, মি. বড়ু য়া?' নরম গলা উনের, কিন্তু সন্দেহে ঠাসা জেরার সুর। 'সিদ্ধান্ত নিলেন লেটিসে এসে দেখবেন এখানে আমরা তিন মাথাঅলা দানব তৈরি করছি কিনা?'

'এখন আমি জানি একশো মাইলের মধ্যে ওই দানব তৈরি হচ্ছে না,' আশ্বস্ত করল রানা। 'হ্যাঁ, ঢিল ছোঁড়া বলতে বোঝাতে চেয়েছি, লেটিসে এসে দেখার ইচ্ছা ছিল আমি অনুসন্ধান চালালে কেউ আমাকে কিছু অফার করে কিনা।'

'কিন্তু টাইমসই যদি তোমার তথ্য পাবার সূত্র হয়,' মাঝখান থেকে প্রশ্ন করল আমান, 'আমাদের সম্পর্কে তুমি জানলে কিভাবে? টাইমস কি সম্ভাব্য ক্রেতা হিসেবে আমাদের নামও ছেপেছে?'

সবাইকে অবাক করে দিয়ে হেসে উঠল রানা, বলল, 'সম্ভবত বিদেশে এসেছ বলেই তুমি বা সুকায়া যথেষ্ট সাবধান নও। তোমাদের রোহিঙ্গা বন্ধু সম্পর্কেও কথাটা সত্যি। মায়ামির কার পার্কে দাঁড়িয়ে তোমরা তিনজন আলাপ করছিলে, খেয়ালই করোনি কেউ তোমাদের কথা শুনছে কিনা।'

কথাগুলো রানা ইংরেজিতে বলল, সবার যাতে বুঝতে সুবিধে হয়। ছানাবড়া হয়ে গেল দুজনের চোখ, দেখে যা বোঝার বুঝে নিল কোরিয়ান। রানা থামতেই চাপা গলায় বলল, 'আমি শঙ্কিত বোধ করছি, মি. আমান। এরকম দায়িত্বজ্ঞানহীনতা আমি আপনাদের কাছে আশা করিনি। যাই হোক, যা হবার হয়ে গেছে। আশা করি ভবিষ্যতে সবাই আরও সাবধান হবেন।' চেয়ার ছাড়ল সে। 'মি. বড়ুয়ার ব্যাখ্যায় আমি পুরোপুরি সন্তুষ্ট। মি. জুসাইওকে রিপোর্ট করব আজ রাতেই। মাস্টার কার্ডের কোডটা এক সময় ক্যারলিন জেনে নেবে, ঠিক আছে? ধন্যবাদ,' বলে আবার একবার রানার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করে বিদায় নিল সে। যাবার আগে নিশ্চয়ই কোন ইশারা করে থাকবে, তা না হলে প্রায় যন্ত্রচালিতের মত সবাই তাকে অনুসরণ করত না। সবাই মানে, ক্যারলিন ছাড়া আর সবাই।

'নাইন-টু-ফাইভ-নাইন-ফোর-থ্রী-ওয়ান,' বলল ক্যারলিন, একটা কাগজে লিখেও দিল নম্বরটা, 'রাত-দিন যখন খুশি এই নম্বরে টেলিফোন করলেই আমাকে পাবেন। যদি প্রয়োজন মনে করেন ডাকবেন, দশ মিনিটের মধ্যে পৌঁছে যাব আমি।'

মুখে কিছু না বলে ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল রানা।

উঠে এসে রানার পাশের চেয়ারে বসল ক্যারলিন। 'যে-জন্যে আমি রয়ে গেছি। শুনুন, ওই ঘটনার পর ফারাহ্ খুব আপসেট হয়ে পড়েছে তো, তাই সে আপনাকে ধন্যবাদ দিতে আসতে পারেনি। আমাকে বলল, সে যে কৃতজ্ঞ বোধ করছে, এটা আমি যেন আপনাকে জানিয়ে দিই। শুনলাম, আপনি নাকি তার সম্ভ্রম রক্ষার জন্যে স্টেজে উঠে পড়েছিলেন?'

'ও কিছু না,' বলল রানা। 'তার জায়গায় আপনি বা অন্য কোন মেয়ে হলেও ওই একই কাজ করতাম আমি।'

'আপনার জ্যাকেটটা আমি নিয়ে আসতে চেয়েছিলাম, কিন্তু ফারাহ্ দিল না,' হেসে উঠে বলল ক্যারলিন। 'বলল, যার জ্যাকেট তাকেই দেব। আপনি কি জানেন, ফারাহ্ আপনার ঠিক নিচের ফ্লোরেই থাকে? আপনার স্যুইটের নিচের স্যুইটটাই ওর।'

কথা না বলে বড় করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা।

'কি হলো?' ক্যারলিন বিস্মিত, কৌতূহলীও বটে।

'না, দুঃখ হচ্ছে,' বলল রানা। 'আপনার ও ফারাহ্র মত বিশ্বসুন্দরীদের দেখা পেয়েও কোন লাভ হলো না, তাই।'

'লাভ হলো না মানে? আমার ফোন নম্বর তো দিলাম, বললাম ডাকলেই ছুটে আসব; ফারাহ্ কোথায় থাকে, সে আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ, এ-সবও জানালাম, তবু বলবেন লাভ হলো না?'

আবার একটা কৃত্রিম দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে রানা বলল, 'কেন, আপনি জানেন না, ক্রেতা বা সম্ভাব্য ক্রেতাকে লেটিস ছেড়ে চলে যেতে হবে শুক্রবারের মধ্যে, মি. ডেভেনপোর্ট আসার আগেই?'

'সিদ্ধান্ত বদলানো হয়েছে, মি. বড়ুয়া। আমাদের বসের বস্, মি. ডেভেনপোর্ট, শনিবারে এসে পরদিনই ফিরে যাবেন, তাই মি. জুসাইও সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাড়াহুড়ো করে কাউকে বিদায় করার দরকার নেই।'

খটকা লাগল রানার। লুকাস ডেভেনপোর্ট শনিবারে এসে পরদিনই ফিরে যাবেন? মুখে হাসি টেনে মনের ভাব গোপন করল ও। ‘তাহলে তো আপনাদের সান্নিধ্যে ভালই কাটবে আমার।’

‘ইউ আর ওয়েলকাম, মি. বড়ুয়া।’

‘এবার তাহলে উঠতে হয়,’ বলল রানা, হাতঘড়ির ওপর চোখ। ‘আমি আপনাকে আধঘণ্টার মধ্যে ফোন করব।’

‘ঠিক আছে,’ রানার সঙ্গেই চেয়ার ছাড়ল ক্যারলিন। ‘তবে ফারাহর কথাও ভুলবেন না।’ মুচকি হেসে চোখ টিপল। ‘আপনি জ্যাকেটটা ফেরত নিতে যাবেন, এই আশায় হয়তো অপেক্ষা করছে ও।’

হাসল রানা। কিন্তু ভাবছে, আরাকানীর ছুরিটা গেল কোথায়?

এলিভেটরে চড়ে পাঁচতলায় ওঠার সময় রানা ভাবছে, ওরা কি তার জন্যে ফারাহর স্যুইটে ফাঁদ পেতেছে?

পাঁচতলায় পৌঁছাল, ফারাহ কোন স্যুইটে থাকে সেটাও দেখে আন্দাজ করতে পারল, কিন্তু নক করল না। ফাঁদ কিনা জানতে হলে ফারাহর স্যুইটে ঢুকতে হবে ওকে, তবে খালি পকেটে নয়।

সিঁড়ি বেয়ে ছ’তলায় উঠল রানা। স্যুইটের দরজা খুলে আলো জ্বালতেই বুঝতে পারল, ভেতরে কেউ ঢুকেছিল। শুধু ঢোকেনি, দক্ষ হাতে প্রতিটি কামরা সার্চও করেছে। দরজার ফাটলে রেখে যাওয়া কাগজের টুকরোটা পড়ে আছে কার্পেটের ওপর। ড্রেসিং টেবিলের দেরাজ খোলা হয়েছে, ফলে হাতলে রাখা চুলটা খুঁজে পাওয়া গেল না।

ব্যাগ চেক করে নিশ্চিত হলো রানা, গোপন কমপার্টমেন্টের হদিশ পায়নি ওরা, পিস্তলটা যথাস্থানেই আছে। মেকানিজম চেক করে লোড করল ওটা, তারপর শিরদাঁড়ার কাছে বেল্টে গুঁজে

রাখল।

কঠিন, ঠাণ্ডা লোকগুলো; লিভিংরূমের মাঝখানে রানা অটলমূর্তি, চিন্তা করছে। কিম উন যখন বলছিল, ওর ব্যাখ্যায় পুরোপুরি সন্তুষ্ট সে, ঠিক তখনই তার লোকজন ওর স্যুইট সার্চ করছিল। ট্রিপলহেডার সম্পর্কে টাইমস একটা খবর ছেপেছে, আর সেটা পড়ে রানা ধরে নিল লুকাস ডেভেনপোর্ট ওই মিসাইল তৈরি করে গোপনে যার তার কাছে বিক্রি করছে–কিম উন পাগল হলেও এটা বিশ্বাস করত না। শুধু ওকে নয়, আমান ও সুকায়াকেও এখন আর বিশ্বাস করার কথা নয় তাদের।

অবৈধ ব্যবসা চালাতে হলে সিকিউরিটি ও ইন্টেলিজেন্স হওয়া চাই নিশ্ছিদ্র ও নিপুণ। লুকাস ডেভেনপোর্ট যাদেরকে দিয়ে কাজ করাচ্ছেন তাদের ইন্টেলিজেন্স নেটওঅর্ক যথেষ্ট দক্ষ নয়, এটা পরিষ্কার। দক্ষ নয় বলেই সম্ভাব্য ক্রেতা আমান গংকে সব তথ্য জানিয়ে দিয়েছে তারা–মিসাইলের নাম ও বৈশিষ্ট্য, বিক্রেতার পরিচয় ও ঠিকানা, দাম, ডেলিভারি পদ্ধতি ইত্যাদি। হঠাৎ একটা খটকা লাগল রানার। সত্যি কি সব তথ্য জানিয়ে দিয়েছে? প্রকাশ করা সব তথ্যই কি সঠিক? আমানকে বলা হয়েছে, লেটিস থেকে অন্তত একশো মাইল দূরে কোথাও তৈরি হচ্ছে ট্রিপলহেডার। সত্যিই কি তাই?

চিন্তায় বাধা পড়ল, নক হলো দরজায়।

'ইয়েস?' দরজা না খুলে প্রশ্ন করল রানা।

'রূম সার্ভিস, স্যার–আপনার জ্যাকেটটা নিয়ে এসেছি।'

দরজা খুলে রূম সার্ভিসের কাছ থেকে কাগজের তৈরি একটা ব্যাগ নিল রানা। ওর প্রশ্নের উত্তরে লোকটা শুধু বলতে পারল, 'মিস ফারাহ এটা দশ মিনিট আগে রিসেপশনে পাঠান–আপনাকে পৌঁছে দেয়ার জন্যে।'

দরজা বন্ধ করে ব্যাগটা পরীক্ষা করল রানা। ব্যাগের মুখ স্টেইপল করা দেখে একটু অবাক হলো। মুখ খুলে জ্যাকেট বের করল, পকেটগুলোয় হাত ভরে দেখছে।

একটুকরো কাগজ পেল রানা। ভাঁজ খুলতে দেখল গোটা গোটা অক্ষরে ইংরেজিতে লেখা–'আপানি কে বা কেমন, তাতে আমার কিছু আসে যায় না। বিপদের সময় সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিলেন, সেজন্যে আপনার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। আর কিছু নয়, সেই কৃতজ্ঞতার কারণেই সাবধান করে দিচ্ছি–যদি সম্ভব হয় পালিয়ে যান। ওরা আপনাকে খুন করবে।'

কাগজটা ছিঁড়ে টুকরো করল রানা, কমোডে ফেলে ফ্লাশ করল। দু'মিনিট পায়চারি করল লিভিংরূমে, তারপর স্যুইট থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে পাঁচতলায় নামল। করিডরে কেউ নেই। মেয়েটির দরজায় নক করল ও।

'কে?'

'ফারাহ্, আমি বড়ুয়া।'

ঝট করে খুলে গেল দরজা। সামনে রোদনসিক্ত মুখ, হতচকিত করে তুলল রানাকে। ফারাহ ঘাগরা ধরনের বহুরঙা একটা কাপড় পরেছে, টপটা টকটকে লাল। 'আপনার জ্যাকেট তো পাঠিয়ে দিয়েছি, পাননি?' দরজায় এমনভাবে দাঁড়িয়েছে, রানা যাতে ভেতরে ঢুকতে না পারে।

'পেয়েছি,' বলল রানা। 'তবে...'

'প্লীজ, আমার বিপদ বাড়াবেন না!' প্রায় ধরা গলায় বলল ফারাহ। 'আপনি যান!'

রানা বাধা দেয়ার সময় পেল না, ওর মুখের সামনে দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল দরজাটা । ওর আর জিজ্ঞেস করা হলো না নিহত রোহিঙ্গা সন্ত্রাসীর ছুরিটা স্টেজ থেকে কে সরিয়েছে।

পাঁচ

রক্তমাখা ছুরির স্বপ্ন দেখে পরদিন খুব ভোরে ঘুম ভাঙল রানার। নিচে নেমে জিমনেইযিয়ামে ঢুকল, ঝাড়া একঘণ্টা বিরতিহীন ব্যায়াম সেরে চলল সুইমিং পুলের দিকে। ইতিমধ্যে সূর্য অনেকটা ওপরে উঠে এসেছে। কব্জি থেকে খোলার সময় হাতঘড়িতে চোখ বুলিয়ে দেখল সকাল সাতটা।

আশপাশে লোকজন খুব কম। পুলের পুরোটা দৈর্ঘ্য বারকয়েক সাঁতরাল রানা–খালি গা, শুধু শর্টস পরে আছে। এক সময় পুলের মাঝখানে চিৎ হয়ে ভেসে থাকল, মেঘমুক্ত নীল আকাশ দেখছে। চোখের কোণে ধরা পড়ল উঁচু পাথুরে পাঁচিল, তার পিছনে পাঁচতলা লুকাস ইন। এই সময় হঠাৎ একটা জানালার শাটার খুলে গেল, এবং সেই সঙ্গে জানালার ভেতর কিছু একটায় প্রতিফলিত হওয়ায় ঝিক্ করে উঠল আলো।

টর্চ নয়, সম্ভবত বিনকিউলার বা টেলিস্কোপ। জানালাটার দিকে সরাসরি তাকাবার ঝোঁক প্রবল হয়ে উঠলেও নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখল রানা। কেউ যদি গোপনে ওর ওপর নজর রাখতে চায়, তাকে বুঝতে দেয়া বোকামি যে ও সেটা ধরে ফেলেছে। শরীর শিথিল করে দিয়ে ভেসে আছে, টের পায়নি নিজের অজান্তে কখন ডাইভিং-বোর্ডের কাছাকাছি চলে এসেছে। হঠাৎ কানে ঢুকল

শব্দটা, 'ওয়াচ আউট!' ঝট করে মুখ তুলতেই দেখতে পেল সরাসরি সূর্য থেকে নেমে আসছে টকটকে লাল কি একটা। রানার শরীরে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল, হাতদুটো পানির গভীরে ডুবিয়ে সর্বশক্তি দিয়ে পা ছুঁড়ল পিছন দিকে। ভাগ্যই বলতে হবে যে ওর ঘাড়ে পড়েনি ডাইভার। কাঁধে ওজনদার, কিন্তু নরম একটা ঘষা লাগার অনুভূতি হলো, দেখল ওকে ছাড়িয়ে সুইমিংপুলের তলায় নেমে যাচ্ছে সে। ওজনদার অথচ নরম লাগার কারণ আর কিছু নয়, ওটা ছিল কারও গুরুনিতম্বের কুশনকোমল ঘষা।

কামানের গোলার মতই পড়েছে ডাইভার। রানাকে সঙ্গে নিয়ে পানির একটা টাওয়ার মাথাচাড়া দিল। তবে এক মুহূর্ত পরই পানির নিচে মাথা ডোবাল ও, ডাইভার উঠে আসছে কিনা নিশ্চিত হতে চায়।

শরীরটা পুলের তলায়, পা দুটো ভাঁজ করা, পানিতে সূর্যরশ্মির পতন বিঘ্নিত হওয়ায় কাঠামোটা ক্ষণে ক্ষণে আকৃতি বদলাচ্ছে। দীর্ঘ কয়েক মুহূর্ত নড়ল না ডাইভার। রানা নিচে নামতে যাবে, এই সময় হঠাৎ সিধে হলো পা দুটো, ডাইভার সরাসরি উঠে এল ওর দিকে। মাথার পিছনে মনে হলো যেন হাওয়ায় উড়ছে রাশি রাশি কালো, দীর্ঘ এলোচুল। পানি থেকে মাথা তুলে হাসল ফারাহ, তার নধর রাঙা ঠোঁট এত কাছে যে চুমো না খাওয়াটা প্রায় অপমান করার সামিল।

'ইস, ছি!' দম নেয়ার ফাঁকে বলল ফারাহ। 'দেখুন দেখি কি বিচ্ছিরি একটা ঘটনা ঘটতে যাচ্ছিল! আপনি যে বোর্ডের নিচে আছেন, সত্যি বলছি আমি দেখতেই পাইনি।' হাত দিয়ে রানার গা ছুঁলো, সেই হাত ঠোঁটের কাছে তুলে চুমো খেলো। 'মাফ করবেন, আপনার গায়ে পা...'

'পা লাগলে হাড়গোড় ভেঙে যেত,' বলে হেসে উঠল রানা।

‘আমার ধারণা নরম কিছু লেগেছে। তুমি? ব্যথা পাওনি তো?’ রানা প্রায় নিশ্চিত, ফারাহ সত্যি কথা বলছে না–দেখেশুনে, ইচ্ছে করেই ওর ওপর ঝাঁপ দিয়েছে সে।

সাঁতরে দূরে সরে যাচ্ছে ফারাহ, হেসে উঠে মাথা নাড়ল। বুকে ও নাভির নিচে লাল বিকিনি মাংস কামড়ে আছে, প্রায় কিছুই ঢাকতে পারেনি। পাশাপাশি সাঁতরাবার সময় বারকয়েক ছোঁয়াছুঁয়ি হলো–কেউ কিছু মনে করল না। পুলের ডান প্রান্তে পৌঁছে কিনারায় উঠে বসল রানা–ফারাহ উঠল হাড়বিহীন সীল মাছের মত পিচ্ছিল ও সাবলীল ভঙ্গিতে। পেলব বাহু লম্বা করে একটা লাউঞ্জ চেয়ার থেকে তোয়ালে নিল সে, সেটা কাঁধে ফেলে রানার দিকে তাকাল। ‘ভারতীয়, তাই না? লেটিসে বেড়াতে এসেছেন?’

টিপ্পনী কেটে রানার বলতে ইচ্ছে করল–সাত কাণ্ড রামায়ণ পড়ে সীতা কার বাপ? ‘হুঁ,’ ছোট্ট করে জবাব দিল ও। কাল রাতের আর এখনকার আচরণে কোনই মিল নেই ফারাহর। মেয়েটি কি রিসর্ট কর্তৃপক্ষের হাতের পুতুল? ভয় দেখিয়ে ওর পিছনে লাগানো হয়েছে? ‘আর তুমি, ফারাহ? তুমি এখানে কি করছ? বাড়িয়ে বলছি না, তোমার মত সুন্দরী মেয়ে সহজে চোখে পড়ে না। আর নাচটা তো পাগল করা। ফ্লোরিডার যে-কোন অভিজাত নাইটক্লাব তোমাকে লুফে নেবে। অথচ এরকম একটা অদ্ভুত জায়গায় পড়ে আছ। যদি বলি...’

‘থাক, অনুমান করতে হবে না,’ বাধা দিয়ে বলল ফারাহ। ‘আমিই ব্যাখ্যা করছি। বলতে পারেন আমার একটা বাতিক আছে। মানে, কাছাকাছি কোন পুরুষমানুষ এলে আমার অ্যালার্জি হয়। আমার জন্যে লেটিস আদর্শ জায়গা, কারণ রিসর্ট কর্তৃপক্ষ একশো ভাগ নিশ্চয়তা দিয়ে বলেছে এখানে আমাকে কোন পুরুষ বিরক্ত করবে না। কাল রাতের ঘটনাটা ব্যতিক্রম, এর আগে

এরকম কখনও ঘটেনি।'

মনে মনে প্রশংসা করল রানা, ব্যাখ্যাটা ভালই তৈরি করেছে। 'কি কারণে পুরুষদের ওপর এত রাগ তোমার?'

আঙুল মটকাল ফারাহ, পা দোলাল, তারপর জবাব দিল, 'কারণটা ব্যক্তিগত, বাধ্য না হলে কাউকে বলতে চাই না। ধরে নিন ঘর পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পায়।' শব্দ করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'আমার কথা থাক। আপনার কথা বলুন। আমার মেসেজ পাবার পর কি ঠিক করলেন?'

'সে প্রসঙ্গে পরে আসছি। তার আগে বলো, আমি কি তোমার দৃষ্টিতে পুরুষমানুষ নই?'

হেসে ফেলল ফারাহ। 'জানতাম এই প্রশ্নটাই করবেন। সত্যি কথা বলতে কি, আর সব পুরুষকে যতটা অপছন্দ করি, আপনাকে অপছন্দ করি তারচেয়ে কয়েকগুণ বেশি–এতটাই, যে মিথ্যে ভয় পর্যন্ত দেখিয়েছি, আপনি যাতে আমার দু'চোখের সামনে থেকে বিদায় হন।'

'আমার ধারণা, ওই মেসেজের বক্তব্য তোমার নয়, চিরকুটটা তোমাকে দিয়ে কেউ লিখিয়েছে। তুমি একদল লোকের হাতের পুতুল।'

শুধু বিমূঢ় নয়, খানিকটা অসহায়ও দেখাচ্ছে ফারাহকে। 'আপনার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না।'

'পালাতে বলে তারা আসলে আমাকে পরীক্ষা করতে চায়। আমি যদি পালাতে চেষ্টা করি, তারা নিশ্চিত হয়ে যাবে–মিথ্যে পরিচয় দিয়ে লেটিসে আমি ওদের ক্ষতি করতে এসেছিলাম।' একটু থেমে রানা আবার বলল, 'আর, এ-ও জানা কথা যে পালানোর সব রাস্তা বন্ধ করেই ওরা আমাকে প্ররোচিত করছে।'

'আপনি হয় গাঁজা খান, নয়তো গল্প লেখেন। বিশ্বাস করুন,

আপনার সম্পর্কে আর কিছু আমি ভাবতে পারছি না।' ঝট করে উঠে পড়ল সে। 'আসুন হাঁটা যাক, লেটিসের কোথায় কি আছে দেখাই আপনাকে।' গায়ে হালকাভাবে একবার বুলিয়ে তোয়ালেটা চেয়ারে ছুঁড়ে দিল।

এ মেয়ের দিকে একবার তাকালে কার সাধ্য চোখ ফেরায়। তবে নিজেকে রানা মনে করিয়ে দিল, অপরাধ জগতের সুন্দরী মেয়েরা গোক্ষুরের চেয়েও বিপজ্জনক, কখন ছোবল মারবে কেউ বলতে পারে না। 'তোমার ইংরেজি শুনে মনে হচ্ছে মাতৃভাষা–কোত্থেকে শিখলে?' জিজ্ঞেস করল ও।

'ইংরেজি আমার মাতৃভাষাই,' বলল ফারাহ। 'আমার মা আমেরিকান ছিলেন।'

'গায়ের রঙটিও বোধহয় মায়ের কাছ থেকেই পাওয়া,' বলল রানা। 'আর বাবা?'

এক সেকেন্ড দেরি করে জবাব দিল ফারাহ। 'বাবা মিশরীয়। মা-বাবা দু'জনেই মারা গেছেন।'

সুইমিং পুল পিছনে ফেলে লেগুনের পাশ ঘেঁষে হাঁটছে ওরা। সামনেই উঁচু পাঁচিল, পাঁচিলের ভেতর গাছপালার মাঝখানে লুকাস ইন। 'দুঃখিত,' বলল রানা। 'আচ্ছা, পাঁচিলের ভেতর কি আছে জানো?'

'বিল্ডিংটা লুকাস ইন, রিসর্ট ফ্যাসিলিটির স্টাফকোয়ার্টার...'

'না, মানে, ওটা ছাড়া আর কি আছে?' ফারাহকে থামিয়ে দিয়ে জানতে চাইল রানা। 'শুনেছি পাঁচিলটার ওদিকটাকে নাকি ব্ল্যাকহোল বলা হয়–একবার কেউ গেলে সে নাকি আর ফিরে আসে না। এনি কমেন্ট?'

'মন্তব্য নয়, সৎ পরামর্শ দিতে পারি,' সিরিয়াস দেখাল ফারাহকে। 'ওই জায়গার নাম কখনও মুখেও আনবেন না।' রানার

একটা হাত চেপে ধরল। ‘এমনকি, ওদিকে তাকাবেন না পর্যন্ত।’

‘কেন, কি আছে ওখানে?’

‘জায়গাটা অভিশপ্ত, এর বেশি কিছু আমাকে জিজ্ঞেস করবেন না, প্লীজ। ভাল কথা, যতই ভুল বুঝুন, আমি কিন্তু এখনও চাই আপনি লেটিস থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পালিয়ে যান।’

লেগুনটাকে এক পাশে রেখে এক প্রস্থ সিঁড়ির সামনে পৌঁছাল ওরা। ধাপগুলো সৈকতে নেমে গেছে। দু'জন একসঙ্গে তরতর করে সিঁড়ি ভাঙছে, ফারাহর ভারী নিতম্ব রানার উরুতে ঘষা খেলো দু'একবার। ব্যাপারটা টের পাওয়ায় আরক্ত হয়ে উঠল মুখ, গতি বাড়িয়ে রানাকে পিছনে ফেলল ফারাহ।

সৈকতে নেমে এসে রৌদ্রস্নানরত লোকজনকে পাশ কাটিয়ে হাঁটছে ওরা। নেপালী দম্পতিকে দেখতে পেল রানা, বালিতে তোয়ালে বিছিয়ে শুয়ে আছেন। ফারাহকে দেখে তাঁরা অদ্ভুত আচরণ শুরু করলেন। বৃদ্ধ দাঁতহীন মাড়ি বের করে হাসতে হাসতে উঠে বসলেন, অমনি তাঁর সামনে পাঁচিল তুলে সিধে হলেন বৃদ্ধা। তারপরও উঁকি-ঝুঁকি মেরে ফারাহকে দেখার চেষ্টা করলেন ভদ্রলোক, চোখাচোখি হতে নেপালী ভাষায় ফারাহর কুশল জানতে চাইলেন। ফারাহ নেপালী ভাষাতেই জবাব দিল, ‘হ্যাঁ, ভাল আছি। আপনারা ভাল তো?’

এই সময় বৃদ্ধা তার স্বামীর চোখে এক মুঠো বালি ছুঁড়ে মারলেন।

হাসতে হাসতে রানার গায়ে গড়িয়ে পড়ল ফারাহ। সে একটু স্থির হতে রানা জিজ্ঞেস করল, ‘তুমি নেপালী ভাষা শিখলে কোত্থেকে?’

‘আপনি এত প্রশ্ন করেন কেন?’ ম্লান গলায় বলল ফারাহ। ‘প্রশ্ন যা করার আমি করব, আপনি শুধু উত্তর দেবেন।’

‘বুঝতে পারছি, তোমাকে সেই দায়িত্বই দেয়া হয়েছে।’

‘একটা প্রশ্ন অনেকক্ষণ হলো বিরক্ত করছে আমাকে। বলি?’

‘সাইদ আরাকানীর ছুরি, তাই না?’ রানা লক্ষ করল, সৈকতে উপস্থিত প্রায় সবাই অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে। কারও কারও দৃষ্টিতে নগ্ন ঈর্ষা। ব্যাপারটা দুর্বোধ্য নয়। লুকাস রিসর্টের মক্কেলরা এই বোধহয় প্রথম কোন পুরুষমানুষের সঙ্গে দেখছে ফারাহকে।

‘কার জানি না, তবে একজনের খুব বড় একটা উপকার করেছি আমি,’ বলল ফারাহ।

‘কি উপকার করেছ?’

‘সাইদ আরাকানীর হাতে একটা ছুরি ছিল,’ বলল ফারাহ। ‘বলা হচ্ছে বটে যে সেই ছুরিটাই তার গলায় গাঁথা অবস্থায় পাওয়া গেছে, কিন্তু কথাটা সত্যি নয়।’

‘বলো কি!’

‘তার গলায় অন্য একটা ছুরি ঢোকে–দূর থেকে কেউ থ্রো করেছিল। গলায় যখন ওটা বিঁধল, নিজের ছুরি তার হাতেই ছিল। গলার ছুরিটা ধরার জন্যে মুঠো আলগা করে সে, তখন হাত থেকে তার ছুরিটা পড়ে যায় স্টেজে। কেন জানি না, ওটা লুকিয়ে ফেলার তাগিদ অনুভব করি আমি। ওটার ওপর ইচ্ছা করেই পড়ে যাই, তারপর যখন সিধে হই, তখন ওটা আপনার জ্যাকেটের পকেটে।’

‘কেন? কাজটা কেন করলে তুমি?’

‘একটা ব্যাখ্যা এই হতে পারে যে সাইদের খুনী কে আমি তা আন্দাজ করতে পারি, এবং তার প্রতি কিছুটা কৃতজ্ঞতা বোধ করায় ছুরিটা লুকিয়ে ফেলার তাগিদ অনুভব করি।’

‘কাকে তুমি খুনী বলে সন্দেহ করছ তা নিশ্চয়ই আমাকে তুমি বলবে না?’

‘আপনি বোধহয় জেনেও না জানার ভান করতে পছন্দ করেন।’ রানার হাত ধরল ফারাহ। ‘চলুন, লেগুনের ওদিকটায় যাই আরেকবার, আপনাকে একটা জিনিস দেখাব।’

আবার সেই পাথুরে পাঁচিলের পাশে চলে এল ওরা। পরীক্ষা করে রানা বুঝল, হুক লাগানো রশির সাহায্য নিয়েও এই পাঁচিল টপকানো সম্ভব নয়। পাঁচিলের মাথায় কাঁটাতারের বেড়া ফুলের কেশরের মত ছড়িয়ে আছে দুপাশে। কিছুদূর যাবার পর পাঁচিলের গায়ে একটা টানেলের মুখ দেখা গেল, তবে গ্রিল দিয়ে বন্ধ করা।

ব্রিজে উঠে রানা জিজ্ঞেস করল, ‘টানেলের ভেতর গ্রিল কেন?’

‘টানেলের আরেক মাথায় একটা ছোট পুল আছে। রিসর্ট ফ্যাসিলিটির কর্তা ওখানে তাঁর বোট রাখেন।’

‘ও।’

ব্রিজের মাঝখানে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল ফারাহ। ‘চলুন, হোটেলে ফিরি। খিদেতে জান বেরিয়ে যাচ্ছে আমার।’

‘খিদে আমারও পেয়েছে, কিন্তু এই না তুমি বললে কি যেন দেখাবে আমাকে।’

‘বলেছিলাম নাকি? বলে থাকলে দেখিয়েছি।’ রানাকে ধরে জোর করে ঘোরাল সে। অগত্যা বাধ্য হয়ে ফিরতি পথ ধরতে হলো রানাকে। ‘আপনি বোট পছন্দ করেন, বড়ুয়া? আমার একটা বোট আছে। আছে মানে রিসর্ট কর্তৃপক্ষ ব্যবহার করতে দিয়েছে।’

রানা অন্যমনস্ক। টানেলটা কেন ওকে দেখাল ফারাহ? ‘কি ধরনের বোট?’

‘কি ধরনের বোট...তা তো জানি না। রেসবোট? ছোট, কিন্তু স্পীড খুব বেশি...’

‘রানঅ্যাবাউট। চড়ার সুযোগ পেলে খুশি হই–এদিক ওদিক ঘুরে দেখতাম।’

‘তবে আমার বোট নিয়ে পালাবার কথা ভেবে থাকলে ভুলে যান,’ বলল ফারাহ। ‘শুধু আমার বোট কেন, লেটিস থেকে কোন বোটই পালাতে পারবে না। ভাল কথা, আপনি বোট চালাতে জানেন?’

‘জানি। কেন, বোট নিয়ে পালানো যাবে না কেন?’

‘এদিকের পানিতে পাহারা থাকে–কড়া পাহারা। না, আর কোন প্রশ্ন করবেন না। প্লীজ।’

‘কিন্তু একটা প্রশ্ন না করে পারছি না,’ বলল রানা। ‘তুমি কি ওদের হাতে বন্দী? নাকি তুমি ওদেরই একজন?’

‘এইমাত্র কালা হয়ে গেলাম, আপনার কথা শুনতে পাচ্ছি না–মাফ করবেন।’

‘বুঝলাম জবাব দিতে অসুবিধা আছে। এটাও অবশ্য একধরনের জবাব। আচ্ছা, তুমি এখানে কতদিন হলো আছ?’

‘এই তো, ছ’মাস চলছে।’ হঠাৎ উজ্জ্বল হলো ফারাহর মুখ। ‘এই, শুনুন! কাল রাতে আমার অফ ডে!’ পাঁচিলের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে পড়ল সে, রানার আরও একটু কাছে সরে এল।

‘অফ ডে-তে সাধারণত কি করো তুমি?’ মৃদুস্বরে জানতে চাইল রানা, একটা হাত ধরল–এই প্রথম।

‘বই পড়ি, গান শুনি। এই, আপনি যখন আমাকে সুন্দরী বললেন, আমি কিছু মনে করিনি। এখন যদি আমি কিছু বলি, আপনি মাইন্ড করবেন না তো?’

‘প্রশংসা শুনতে কার না ভাল লাগে। কিন্তু শত্রু প্রশংসা করলে ভয় পাই।’

‘বেশ, পান ভয়,’ রানার আরও কাছে সরে এসে ফিসফিস করল ফারাহ। ‘তোমার মধ্যে কি যেন একটা জাদু আছে।’

ফারাহর কোমরে হাত রেখে কাছে টানল রানা, নধর রাঙা

ঠোঁটে একটা চুমো খেলো।

ফারাহ সঙ্গে সঙ্গে বাধা দেয়নি, একটু সময় দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল। 'এই তোমার ভয় পাওয়ার নমুনা?'

জবাবে রানা বলল, 'কাল রাতে তুমি আমার সঙ্গে বেরুবে? তোমার র‍্যানঅ্যাবাউট নিয়ে বেড়াব আমরা?'

এক সেকেন্ড ইতস্তত করে মাথা ঝাঁকাল ফারাহ। 'ঠিক আছে।'

'তোমার সঙ্গে আমার ক্যাবারেইতে দেখা হবে। বারে। প্রথমে ডিনার, তারপর, কেমন?'

'ক্যাবেরেইতে' তীক্ষ্ণ গলায় বলল ফারাহ। 'না, ওখানে নয়। আমি চাই না কেউ আমাদেরকে দেখুক। আমিই তোমার স্যুইটে আসব।'

'বেশ। অপেক্ষা করব। ও, হ্যাঁ, আমার আরেকটা আবদার রাখতে হবে তোমাকে। কাল রাতে যে গানটা গাইছিলে ওটা আরেকবার শূনতে চাই আমি। ভাষাটা অবশ্য ঠিক বুঝতে পারিনি, তবে সুরটা বড় মন উদাস করা, আর তোমার গলাটাও খুব ভাল।'

'গান...ঠিক আছে, শুনবে। আসলে উপমহাদেশের অনেক ভাষাই জানি আমি–ওটা একটা বাংলা গান–টেগোরের। তবে গলা আমার মোটেও ভাল নয়, তুমি বাড়িয়ে বলছ।'

ছয়

পরদিন সকালে ব্রেকফাস্ট দিয়ে গেল রূম সার্ভিস।

নাস্তা সেরে ব্যাগ হাতড়ে পুরনো একটা নেভিগেশন্যাল চার্ট বের করল রানা। লেটিস ও আশপাশের এলাকার চার্ট, অনেক কষ্টে যোগাড় করা হয়েছে। তবে পরীক্ষা করে খুব একটা উৎফুল্ল হওয়া গেল না। চার্টে জলমগ্ন কয়েকটা বাধা-বিঘ্ন, প্রাচীন আমলের একজোড়া জাহাজডুবির স্পট, একটা কোরাল হেড আর কিছু কিছু অগভীর অংশ চিহ্নিত করা হয়েছে শুধু। লেটিসের ভেতরের লেগুনটাকে দেখানো হয়েছে, কিন্তু সাগরের কোথায় গিয়ে সেটা মিশেছে তা দেখানো হয়নি।

লেটিসের ব্ল্যাকহোল দিকটায় সাগরে একজোড়া রীফ আছে—কখনও স্পষ্ট, কখনও অস্পষ্ট। ওগুলো ঠিক কোথায়, মনে গেঁথে রাখার চেষ্টা করল রানা।

দশটার সময় ফোন করল ক্যারলিন। কলটা আশা করছিল রানা, তবে এত তাড়াতাড়ি নয়।

'মি. বড়ুয়া, আপনি তো গোটা রিসর্টে হৈ-চৈ ফেলে দিয়েছেন!' হাসছে ক্যারলিন।

'কি রকম?'

'ফারাহর ধনুর্ভঙ্গ পণ, সে কোন পুরুষের সঙ্গে মেলামেশা করবে না। জাদু জানেন নাকি, সেটা আপনি ভাঙলেন কিভাবে?'

‘ও, এই কথা!’ রানাও জোর করে একটু হাসল।

‘আজ রাতে তো ওর ছুটি,’ বলল ক্যারলিন। ‘ওকে নিয়ে নিশ্চয়ই কোন প্রোগ্রাম আছে আপনার?’

দ্বিধায় পড়ে গেল রানা। তারপর ভাবল, ফারাহ ওকে নিয়ে বোটে চড়তে চেয়েছে কাউকে না জানিয়ে, কাজেই ব্যাপারটা গোপন রাখাই উচিত। বলল, ‘এখনও কিছু ফাইনাল হয়নি।’

‘খুব ব্যস্ত, তাই না?’ এখনও হাসছে ক্যারলিন। ‘আমাদের বোধহয় কোন আশাই নেই, কি বলেন?’

‘কে বলল আশা নেই। আমি তো আর পালিয়ে যাচ্ছি না।’

‘শুনে আশ্বস্ত হলাম। মি. বড়ুয়া, যেজন্যে ফোন করেছি। আপনার মাস্টার কার্ড জেনুইন, সেজন্যে ধন্যবাদ। তবে অন্য কিছু আমরা আশাও করিনি। কিন্তু সমস্যা দেখা দিয়েছে অন্যখানে।’

‘কি রকম?’

‘আপনার মাস্টার কার্ডের একটা সিলিং আছে,’ বলল ক্যারলিন। ‘সেটা এক লাখ ডলার। আপনি এরচেয়ে বেশি পেমেন্ট করতে বা ক্যাশ করতে পারবেন কিনা জানতে হলে কোম্পানিকে একটা কোড জানাতে হবে। সেই কোড তো কাল রাতে আপনি আমাকে দেননি।’

‘দিইনি? ওহ্-হো, তাহলে তো বিচ্ছিরি একটা ভুল হয়ে গেছে।’

‘সমস্যা সেখানেও নয়, মি. বড়ুয়া,’ বলল ক্যারলিন। ‘সমস্যা হলো, আপনার ওই কোডের একটা সেফটি পিরিয়ড আছে। ওই কোড ব্যবহার করে কেউ যদি সিলিং টপকে খোঁজ-খবর নিতে যায়, তাকে কমপক্ষে দশদিন অপেক্ষা করতে হবে। আপনি যে গুডস কিনতে চান তার দাম পড়বে কমবেশি একশো পঁচিশ কোটি ভারতীয় রূপী। অত টাকা আপনার মাস্টার কার্ড প্রোভাইড

করতে পারবে কিনা জানতে হলে ওই দশদিন অপেক্ষা করতে হবে...'

'সত্যি আমি দুঃখিত,' বলল রানা। 'তবে এ-ও ঠিক যে আর কোন উপায় নেই।'

'সেক্ষেত্রে সবার কার্গো একই জাহাজে তোলা সম্ভব হবে না। মি. আমান ও মি. সুকায়া শনিবার দুপুরে লেটিস ত্যাগ করছেন, ওঁরা কার্গো ডেলিভারি নেবেন মঙ্গলবার রাতে। তারমানে আপনি একা হয়ে যাচ্ছেন। ধরুন, দশদিন পর যদি পজিটিভ রিপোর্ট পাই, আপনি কার্গো ডেলিভারি পাবেন আজ থেকে পনেরো দিন পর।'

'কি আর করা!' হতাশ সুরে বলল রানা।

'মি. কিম উনকে তাহলে জানিয়ে দিই আপনি অপেক্ষা করতে রাজি আছেন?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই।'

'তবে মি. উন বলছিলেন যে অপেক্ষা না করে আপনার কোন উপায় নেই, এ আপনিও বোঝেন।'

'মানে?'

'না, মানে, এটা তো সাধারণ একটা কমনসেন্স। আপনি আমাদের সম্পর্কে অনেক গোপন তথ্য জেনে ফেলেছেন, তা সে যেভাবেই জেনে থাকুন। এখন যদি আপনার মাস্টার কার্ড ভ্যালিড প্রমাণিত না হয়, লেটিসে বসেই আপনাকে নগদ টাকার ব্যবস্থা করতে হবে, তাই না? এতসব তথ্য জানার পর আপনি যদি আমাদের জিনিস না কিনেই চলে যেতে চান, আমাদেরকে বিব্রত করা হবে না?'

'ও, আচ্ছা, এই কথা।'

'মি. উন বলছিলেন, আমাদের সিকিউরিটি সিস্টেম সম্পর্কে আপনার পরিষ্কার ধারণা থাকা উচিত। তা না হলে যে-কোন

মুহূর্তে মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে।'

'আমি চাই না কোনও দুর্ঘটনা ঘটুক,' বলল রানা। 'কাজেই আপনাদের সিকিউরিটি সম্পর্কে কি জানার আছে বলে ফেলুন।'

'প্রথমেই ধরুন এয়ারস্ট্রিপের কথা। নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন যে গোটা এলাকাটা কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা? রাতে তো বটেই, দিনের বেলাও সশস্ত্র গার্ডরা ওই বেড়া বরাবর টহল দিচ্ছে। একটাই গেট, সেখানেও একদল গার্ড সারাক্ষণ ডিউটি দেয়। বিনা অনুমতিতে কাউকেই ওরা এয়ারস্ট্রিপে ঢুকতে দেবে না। বোকামি বা ভুল করে কেউ যদি ঢোকার চেষ্টা করে, গার্ডদের ওপর নির্দেশ আছে গুলি করার।'

'তাহলে তো ওদিকে আমার ভুলেও যাওয়া চলে না।'

'না। তারপর ধরুন আজ সন্ধ্যার দিকে আপনি একটা বোট নিয়ে বেড়াতে বেরুলেন–কিন্তু যেদিকেই যান, বেশি দূর যাওয়া উচিত হবে না। কারণ, অন্ধকারে আপনি দেখতে না পেলেও, আমাদের সিকিউরিটি গার্ডরা হাইড্রোফয়েলের একটা বহর নিয়ে খোলা সাগরে টহল দিচ্ছে। ওদের কাজই বিনা অনুমতিতে কেউ পালাতে চেষ্টা করলে তাকে বাধা দেয়া। তাছাড়া, হেলিকপ্টার তো আছেই।'

'বুঝেছি। আর কিছু?' রানা গম্ভীর। ফারাহ তাহলে ওদের প্রোগ্রামের কথাটা বলেই দিয়েছে!

'এত কথা বলার একটাই কারণ, মি. বড়ুয়া–আপনি যাতে মর্মান্তিক কোন দুর্ঘটনার শিকার না হন,' বলে হেসে উঠল ক্যারলিন। সেই হাসি হঠাৎ থামিয়ে আবার বলল, 'আরেকটা কথা, স্যার। আপনার কি শিকার করার শখ আছে?'

'শিকার?'

'হ্যাঁ, শেয়াল দেখলে মারতে ইচ্ছে করে?'

‘আমি ছুঁচো মেরে হাত নোংরা করি না,’ বলল রানা। ‘মারলে বাঘ বা সিংহই মারব।’

‘তাহলে আপনাকে সাবধান করার কোন প্রয়োজন দেখছি না। তবে আপনি যদি বলতেন যে শেয়াল শিকার করার শখ আছে, তাহলে অবশ্যই আপনাকে আমি লেটিসের দ্বিতীয় অংশে যেতে নিষেধ করতাম। ওদিকটাকে ব্ল্যাকহোল বলা হয়। ব্ল্যাকহোলে প্রচুর শেয়াল আছে। মানা করা সত্ত্বেও মাঝেমধ্যেই দু’একজন শিকারী ওদিকে যায়, এবং ভুলের মাসুল হিসেবে বেঘোরে প্রাণ হারায়।’

‘শুনেছি, ওদিকে প্রচুর টার‍্যানটিউলা আর বিষাক্ত সাপও আছে?’

‘আপনি যেহেতু ব্ল্যাকহোলে যাবেন না, কাজেই ওগুলোর কামড় খাওয়ার ভয়ও আপনার নেই। অর্থাৎ আপনার লাশ শেয়ালে খাচ্ছে না। তবে, মি. বড়ুয়া, আমাদের সিকিউরিটি কতটা কড়া তার একটা উদাহরণ দিই। মাকড়সা আর বিষাক্ত সাপ আছে, এই তথ্য যে সূত্র থেকে আপনি পেয়েছেন তার এখন আর কোন অস্তি ত্বই নেই। কি বলছি বুঝতে পারছেন তো, স্যার? বেশি কথা বলার অপরাধে তাকে আমরা ধরে এনে জ্যান্ত কবর দিয়েছি—ওই ব্ল্যাকহোলেই। ওই একই কবরে আরও একজনকে শোয়ানো হয়েছে—লোকটা অতিরিক্ত কৌতূহলী হয়ে উঠেছিল কিনা, তাই। রাখি, কেমন?’

রানার হার্টবিট বেড়ে গেছে। ‘না, এক মিনিট! কার কথা বলছেন আপনি? পলি…?’

রোমহর্ষক হাসির শব্দ ভেসে এল অপরপ্রান্ত থেকে। ‘পলি নামে কেউ ছিল না, মি. বড়ুয়া। তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেয়া হয় ছিল, এখন আর সে নেই। আপনি তো ব্ল্যাকহোলে যাবেন না,

গেলে ওদের কবরটা দেখতে পেতেন।' আর কোন প্রশ্ন করার সুযোগ না দিয়ে যোগাযোগ কেটে দিল ক্যারলিন।

দম আটকে ওখানেই বেশ কিছুক্ষণ পাথর হয়ে থাকল রানা। একা শুধু পলিকে নয়, সাযযাদকেও ওরা খুন করেছে!

লাঞ্চের পর ঝুল-বারান্দায় দাঁড়িয়ে আরেকবার লুকাস ইন-এর কমপাউন্ডটা দেখার ব্যর্থ চেষ্টা করল রানা। বুদ্ধি করেই ছয়তলার স্যুইট ভাড়া করেছে ও, কিন্তু দিক নির্ণয়ে ভুল হয়ে গেছে। এখন করণীয় হলো এমন একটা কামরায় ঢোকা যেখান থেকে লুকাস ইন ভাল করে দেখা যায়।

ঘরে ফিরে পুরনো রঙচটা একটা জিনস পরল রানা, সঙ্গে একটা পুলওভার আর স্পঞ্জের স্যান্ডেল। পকেট হাতড়ে নিশ্চিত হয়ে নিল, যথেষ্ট কয়েন আছে, তারপর স্যুইট থেকে বেরিয়ে এসে তালা লাগাল দরজায়।

নির্জন করিডর ধরে হাঁটার সময় মনে মনে একটা হিসেব করল রানা। সম্ভাবনাময় রূমগুলোর নম্বর ৭১৬ থেকে ৭২৯-এর মধ্যে হবে। এলিভেটরে চড়ে মেইন লবিতে নেমে এল ও, সম্ভাব্য টিকটিকির কথা মনে রেখে বড়সড়, আলোকিত লাউঞ্জে একটা বিয়ার নিয়ে বসল কিছুক্ষণ। যখন মনে হলো কেউ ওকে আর বিশেষভাবে লক্ষ করছে না, একজন ওয়েটারকে ডেকে মেন'স রূম কোথায় জেনে নিয়ে সোফা ছাড়ল।

যেমনটি আশা করেছিল, মেন'স রূমে পাশাপাশি একজোড়া ফোন বুদ রয়েছে। হোটেলের নম্বরে ডায়াল করে ৭২৭-এর গেস্টকে চাইল রানা। কয়েকবার রিঙ হবার পর কেউ যখন রিসিভার তুলছে না, ধরে নিল প্রথমবারই বিড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়েছে। কিন্তু তারপরই এক মহিলার ঘুম জড়ানো গলা ভেসে এল। মাইকেলকে

চাইল রানা। মহিলা বিরক্ত হয়ে বললেন, এই নামে তিনি কাউকে চেনেন না। ক্ষমা চেয়ে নিয়ে লাইন কেটে দিল রানা।

ধৈর্য ধরতে হবে, সোফায় ফিরে এসে নিজেকে মনে করিয়ে দিল রানা। পরবর্তী আধঘণ্টায় আরও দু'বার ফোন করল ওর ফ্লোরের দুটো কামরায়। দুটোতেই গেস্ট আছে। সিদ্ধান্ত নিল, পরেরবারও যদি খালি কোন রূম না পায়, তাহলে পদ্ধতি বদল করবে। যারা বড় মাপের রিসর্ট হোটেল চালায় তাদেরকে বোকা ভাবা উচিত নয়, টেলিফোন অপারেটর এক সময় ঠিকই টের পেয়ে যাবে একই লোক একই ফ্লোরের বিভিন্ন কামরায় ফোন করছে।

চারবারের বার সফল হলো রানা। দশবার রিঙ হবার পরও রিসিভার তুলল না কেউ। লবি হয়ে এলিভেটরে চড়ল ও, ফিরে এল নিজের ফ্লোরে।

রানার সব বেল্টেই বিশেষ কিছু টুলস থাকে, আর তালা খোলার ট্রেনিং তো নেয়াই আছে। এক মিনিটও লাগল না, ৭২১-এ ঢুকে পড়ল ও। দরজা সামান্য একটু খোলা রাখল, কামরার মালিক অকস্মাৎ ফিরে এলে যাতে বলতে পারে খোলা দেখেই ভেতরে ঢুকেছে, উদ্দেশ্য ঝুল-বারান্দা থেকে প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করা।

ঝুল-বারান্দায় বেরুবার দরকার হলো না, ঘরের ভেতর থেকেই লুকাস ইন কমপাউন্ডের বেশ বড় একটা অংশ দৃষ্টিগোচর হলো। পাঁচিলের ভেতর লোকজনের গতিবিধি উদ্দেশ্যবিহীন নয়, যে-যার কাজে ব্যস্ত সবাই, কোথাও কোন জটলা বা অলস আড্ডা নেই। দু'একজন বাদামী সুট পরে আছে, তবে কোন ইউনিফর্ম চোখে পড়ল না। সাধারণ পোশাকের ভেতর যে হ্যান্ডগান লুকানো আছে, এতটা ওপর থেকেও স্পষ্ট আভাস পাওয়া গেল। লেগুনে একজোড়া

ডিঙ্গি নৌকা দেখা গেল, সাদা আলখেল্লা পরা লোকজন বৈঠা চালাচ্ছে—ওরা সম্ভবত মধ্যপ্রাচ্যের কোনও দেশ থেকে আসা মক্কেল। তীরের কাছাকাছি কয়েকজন লোক সাঁতরাচ্ছে, তাদেরকেও আমেরিকান বা শ্বেতাঙ্গ বলে মনে হলো না। সাদা জ্যাকেট পরা ওয়েটাররা পানীয় পরিবেশন করছে লেগুনের কিনারা ঘেঁষে টাঙানো চাঁদোয়ার ভেতর। ওই চাঁদোয়া বা শামিয়ানার নিচেই নেপালী ভদ্রলোককে দেখতে পেল রানা, একটা চেয়ারে বসে দোল খাচ্ছেন, চোখের সামনে খুলে রেখেছেন সেই লাল বই।

মূল ভবনকে ঘিরে রেখেছে গায়ে গায়ে লেগে থাকা বৃক্ষসারি, তার ওপর দ্বিতীয় একটা পাঁচিল থাকায় ভবনের সামনের অংশ রানার দৃষ্টিপথের বাইরেই থেকে গেল।

হতাশই হলো রানা। প্রধান পাঁচিল টপকাতে পারলেও কোন লাভ নেই, বিল্ডিংটায় ঢুকতে হলে দ্বিতীয় পাঁচিলটাও টপকাতে হবে, অথচ নিশ্চিতভাবে বোঝার উপায় নেই ঠিক কোথায় ডিউটি দিচ্ছে গার্ডরা।

‘তো, স্যার, আমি কি আপনার কোন সাহায্যে আসতে পারি?’

বন করে ঘুরল রানা, জানে নরম কার্পেটকে গাল দিয়ে কোন লাভ নেই। দীর্ঘদেহী নিগ্রো হ্যাট পরে থাকায় অসম্ভব লম্বা দেখাচ্ছে। কালো সুট গায়ের সঙ্গে মিলে যাওয়ায় ভূত-ভূত লাগছে লোকটাকে। একটা হাত সুটের ভেতর ঢোকানো, দাঁড়িয়ে আছে দোরগোড়ায়। ঠোঁটে ক্ষীণ হাসি, প্রায় সকৌতুকই বলা যায়।

রানা ভান করল যেন সাংঘাতিক বিব্রতবোধ করছে। ‘এক্সকিউজ মি। দরজাটা খোলা দেখে লোভ হলো, ভাবলাম দেখি তো এদিক থেকে লেগুনটা কেমন দেখায়।’

‘ও, আচ্ছা!’ রানার চোখে চোখ রেখে বলল নিগ্রো। পিছন দিকে না তাকিয়েই দরজাটা বন্ধ করে দিল। ‘তবে এরকম

অনধিকার প্রবেশের কোন প্রয়োজন ছিল কি? রিসর্ট কর্তৃপক্ষকে বললেই তো হোত যে আপনি পাঁচিলের ওদিকটায় যেতে চান।' হঠাৎ হাসল সে, যেন অভয় দিচ্ছে রানাকে। ওই হাসি দেখেই তাকে চিনে ফেলল রানা।

লীয়ার জেটের পাইলট। 'সিজার?'

সামান্য একটু মাথা নোয়াল সিজার। 'অ্যাট ইওর সার্ভিস, মি. বড়ুয়া।'

'সত্যি আমি দুঃখিত। বিশ্বাস না হলে চেক করে দেখতে পারেন, আপনার কোন জিনিস আমি ছুঁইনি।'

কয়েক পা সামনে এগোল সিজার। 'তার কোন প্রয়োজন নেই, মি. বড়ুয়া। আপনাকে আমার চোর বলে মনে হয়নি।' হঠাৎ প্রসঙ্গ পাল্টাল সে। 'পাঁচিলের ভেতর পাঁচিল–অদ্ভুত, তাই না?'

'এক অর্থে অদ্ভুত। আরেক অর্থে অদ্ভুত বলা যায় না। সবাই জানে ওখানে মাঝেমধ্যে এসে লুকিয়ে থাকেন লুকাস ডেভেনপোর্ট। তিনি তো নিঃসঙ্গ আর গোপন জীবনই বেছে নিয়েছেন, তাই না?'

'তাঁর সম্পর্কে আমার কৌতূহল আপনার চেয়ে কম নয়, মি. বড়ুয়া। তিনি আমার বসের বস্, কিন্তু হলে কি হবে, তাঁর সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানি না আমি। সত্যি কথা বলতে কি, এদের কারও সম্পর্কেই বিশেষ কিছু জানি না। কৌতূহলী হওয়া হয়তো স্বাস্থ্যকর নয়, তবু অনেক প্রশ্নই জাগে মনে।'

'যেমন?'

ইঙ্গিতে লুকাস ইনকে ঘিরে থাকা দীর্ঘ বৃক্ষসারি দেখাল সিজার। 'এই কামরায় থাকার সুবাদে অন্তত আমার কাছে ব্যাপারটা গোপন কিছু নয়–ওই গাছগুলোয় টেলিভিশন ক্যামেরা ফিট করা আছে। কারণটা কি বলতে পারেন?'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা।

'লুকাস ইনে মি. ডেভেনপোর্টের যত মেহমান আসে, তারা প্রায় সবাই তৃতীয় বিশ্বের লোকজন, মি. বড়ুয়া। আরও একটা অদ্ভুত ব্যাপার কি জানেন? বলা হয় মি. ডেভেনপোর্টের মেহমান, অথচ তাঁর সঙ্গে ওদের কারও দেখা-সাক্ষাৎ হয় না। যদি শোনা যায় মি. ডেভেনপোর্ট লেটিসে আসছেন, রিসর্ট কর্তৃপক্ষ তাঁর মেহমানদের আক্ষরিক অর্থেই ঝেঁটিয়ে বিদায় করে দেন। ব্যাপারটা রীতিমত রহস্যময়, তাই না?'

অদ্ভুত একটুকরো হাসি টিম সিজারের মুখে। টিটকারী বা বন্ধুত্ব–দুইরকম অর্থই করা যায় হাসিটার। রানা দুই অর্থেই নিল, তবে প্রথমটার ওপর জোর দিল বেশি। ওর মনে হলো লোকটা বলতে চায়, দেখো, সব কেমন বলে দিচ্ছি গড়গড় করে তুমি সন্দেহজনক লোক হওয়া সত্ত্বেও। দেখা যাক, কি করতে পার তুমি, ক্ষমতা কতটুকু। আমরাও প্রস্তুত আছি।

'এর আগে কি ঘটেছে জানি না,' বলল রানা সহজ ভঙ্গিতে। 'তবে এবার মি. ডেভেনপোর্ট এলেও তাঁর মেহমানরা লেটিসে থাকবেন বলে শুনছি।'

'শনিবার আসুক, তারপর দেখবেন,' ফিসফিস করল সিজার। 'একটা জরুরী কথা, মি. বড়ুয়া। আপনাকে ওরা লুকাস ইনে আমন্ত্রণ জানায়নি, এটা আমাকে যেমন বিস্মিত করেছে, তেমনি চিন্তিতও করেছে। ওখানে যাদের ঠাঁই হয় তাদেরকে সন্দেহজনক চরিত্র মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। আপনি তাদের দলে নন। সেজন্যে এত কথা বলে ফেললাম। কেন যেন আমার মনে হচ্ছে, লেটিসে আপনি কিছু একটা উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছেন। সেটা অশুভ কোন উদ্দেশ্য নয় বলেই আমার বিশ্বাস।'

উত্তরে কিছু না বলার জন্যে হেসে উঠল রানা, হাসতে

হাসতেই সামনে এগোল। সিজার কথা বলছে মিষ্টি, কিন্তু দাঁড়িয়ে আছে শক্ত অনড় পাথরের মত। তাকে সাবধানে পাশ কাটানোর সময় ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল রানা, না থেমেই বলল, 'আপনার কথা শুনে মনে হলো, আপনাকে একজন বন্ধু হিসেবে ধরে নেয়া যায়। ধন্যবাদ, মি. সিজার।' করিডরে বেরিয়ে এসে দরজাটা বন্ধ করে দিল ও। নিজের স্যুইটে ফেরার সময় ভাবছে, চাল মারল লোকটা। একজন পাইলটের পকেটে রিভলভার থাকবে কেন? যাদের চাকরি করে তাদেরকে বলছে সন্দেহজনক চরিত্র, তার এই সন্দেহ সে গোপনও করে না। তাহলে ক্যারলিনরা এখনও তাকে জ্যান্ত কবর দেয়নি কেন?

লম্বা দুপুরের পুরোটা হাতে নিয়ে লেটিসের কোথায় কি আছে দেখার জন্যে বেরিয়ে পড়ল রানা। পার্কিং এরিয়ার অ্যাটেনডেন্ট হাসিখুশি লোকটা ওকে একটা বিধ্বস্ত ও জোড়াতালি দেয়া ফোক্সওয়াগেন দিল বাহন হিসেবে। সেটা চালিয়ে সারি সারি পাম গাছের ভেতর দিয়ে গলফ কোর্সে চলে এলো ও।

ক্লাবহাউসটা আসলে ছাদসহ একটা প্যাভিলিয়ন ছাড়া কিছু নয়, তিন দিক খোলা, বাকি দিকটায় সারি সারি লকার। ছোট একটা বার আছে, বাইরে ও ভেতরে টেবিল ফেলা, কোনটাতেই লোক নেই।

প্যাভিলিয়নের কাঠের মেঝে হেঁটে পার হলো রানা, চোখ ঘুরিয়ে গলফ কোর্সের এক মাথা থেকে আরেক মাথা পর্যন্ত দেখল। সামান্য ঢেউ খেলানো জমিন তাজা সবুজ ঘাসে ঢাকা, খানিক পর পর ফ্লাওয়ার বেড ও দু'একটা করে পাম গাছ। দূরে চারজনের একটা দলকে দেখা গেল, তাদের সঙ্গে একজোড়া গলফ কার্ট রয়েছে; তা না হলে গোটা গলফ কোর্সকে নির্জন বলা যেত।

বাহনে ফিরে এসে আবার রাস্তায় নামল রানা, দেখা যাক এ-রাস্তা কোথায় ওকে নিয়ে যায়। গলফ কোর্সকে পিছনে ফেলে এসে চওড়া হলো রাস্তা, শেষবার বাঁক নিয়ে ও উঁচু ঝোপ-ঝাড়কে পাশ কাটিয়ে একটা বোট বেসিনে পৌঁছে দিল ওকে। দু'দিক থেকেই বাঁকা হয়ে বে-তে বেরিয়ে গেছে ব্রেক ওয়াটার–উঁচু, মোটা আর শক্ত পাঁচিল, ঢেউ ঠেকাবার কাজ ভালই করছে।

দু'তিনটে মাঝারি আকৃতির ক্রুজার দেখা গেল, নিঃসঙ্গ ডক বরাবর বাঁধা রয়েছে। ওগুলোর সঙ্গে কয়েকটা জেলে নৌকা আর আউটবোর্ডও দেখা যাচ্ছে। তবে কোন হাইড্রোফয়েল নেই।

বে-র আরেক মাথায় ব্ল্যাকহোল দেখতে পেল রানা, গাছপালার ভেতর থেকে ইস্পাতের বিশাল কাঠামো মাথা তুলেছে। ব্রিজ আর ব্রিজ সংলগ্ন জেটির কিছু অংশও দেখা গেল–জেটিটা পানির ওপর লম্বা হয়ে আছে। ব্রিজটা অসমাপ্ত, নির্মাণ কাজ স্থগিত থাকায় কোন রকম ব্যস্ততা চোখে পড়ল না। তবে দূরে অস্পষ্টভাবে প্রকাণ্ড একটা ক্রেন দেখা যাচ্ছে। ক্রেনটা সচল, ইস্পাতের বীম বহন করছে। লোহার হেলমেট পরা খুদে আকৃতির কয়েকজন লোক ওটাকে ঘিরে হাঁটাচলা করছে। দূরত্ব আধ মাইলের কম নয়, কাজেই নিশ্চিতভাবে বলা কঠিন ঠিক কি ঘটছে ওখানে। প্রকাশ্য দিবালোকে আধ মাইল সাঁতার কেটে ওখানে পৌঁছানোর কোন প্রশ্নই ওঠে না।

এঞ্জিনের ভোঁতা আওয়াজ সচকিত করে তুলল রানাকে। ঝট করে বাঁ দিকে তাকিয়ে রানা দেখল খোলা সাগর থেকে বে-তে ঢুকছে সাদা একটা বোট। একটা হাইড্রোফয়েল। খোলা ককপিটের পিছন দিকে কোরিয়ান এক লোকের পাশে বসে রয়েছে ক্যারলিন, লোকটা সম্ভবত কিম উন। হুইল ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে আরেক লোক। এই লোকটা শ্বেতাঙ্গ, পরনে বাদামী সুট। কয়েক

সেকেন্ড পর তাকে চিনতে পারল রানা। মারটিন।

বড় একটা অর্ধবৃত্ত তৈরি করে বে থেকে লেগুনে ঢুকল হাইড্রোফয়েল। তারপর সোজা ছুটল ব্ল্যাকহোলের লম্বা জেটি লক্ষ্য করে। গাছপালার আড়াল থেকে জিনস আর লেদার জ্যাকেট পরা দু'জন লোক বেরিয়ে এল মুরিং লাইন ধরার জন্যে। বোট থেকে মই বেয়ে জেটিতে উঠল ওরা তিনজন, ব্যস্ত ভঙ্গিতে তীরের দিকে এগোল। গাছপালার ফাঁকে নিচু কয়েকটা ভবন দেখা যাচ্ছে, সেগুলোর ভেতর হারিয়ে গেল ওরা।

দৃষ্টি ফিরিয়ে এনে ডকে চোখ বোলাল রানা, ভাবছে ফারাহর বোট কোনটা হতে পারে। প্রথমে ওর প্ল্যান ছিল মেয়েটাকে পটিয়ে-পাটিয়ে লুকাস ডেভেনপোর্টের অপারেশন সম্পর্কে তথ্য আদায় করবে। সেটা বাতিল করে দিল ও। মাথায় আরও ভাল একটা আইডিয়া এসেছে।

ম্যারিনা বা ডকিং ফ্যাসিলিটি থেকে বেশি দূরে নয়, খানিকটা উঁচু জমিনের ওপর ল্যান্ডিং স্ট্রিপটা। একটা শেডের কাছাকাছি পার্ক করা রয়েছে লীয়ার জেট, শেডের মাথায় উইন্ডসক উড়ছে। কাছাকাছি আরও একজোড়া হালকা প্লেন ও একটা হেলিকপ্টার দেখা গেল। কাঁটাতারের বেড়া থাকলেও গেটটা খোলা। সিকিউরিটি কি রকম কড়া পরীক্ষা করার জন্যে ফোক্সওয়াগেন নিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল রানা। জানত কিছু একটা ঘটবে, তারপরও ঘটনাটা চমকে দিল রানাকে। শেড থেকে সুশৃংখল সৈনিকদের মত মার্চ করে বেরিয়ে এল একদল গার্ড, হাতে সাবমেশিন গান বাগিয়ে ধরা, সরাসরি রানার দিকে তাক করে দ্রুত পজিশন নিল।

বাহন না থামিয়ে ঘুরিয়ে নিল রানা, দুর্ঘটনার ঝুঁকি না নিয়ে পালিয়ে এল।

হোটেলে ফেরার পথে টেনিস কোর্টগুলোও দেখল রানা। হোটেলের কাছাকাছি, পাশাপাশি অনেকগুলো। গলফ কোর্সের মত এগুলোও খালি পড়ে আছে।

স্যুইটে ফিরে ষাট মিনিটের দিবানিদ্রার পর কফি খেলো রানা, তারপর ফারাহ্র সঙ্গে বেরুবার জন্যে প্রস্তুত হলো। এটা প্রমোদ-ভ্রমণ নয়, বলা যায় বিপজ্জনক অভিযানই, তাসত্ত্বেও সিদ্ধান্ত নিল ওয়ালথারটা নেবে না। ফারাহ্র মত মেয়ে সঙ্গে থাকলে শরীরে লুকিয়ে রাখা অস্ত্র বেশিক্ষণ গোপন রাখা সম্ভব নয়। মেয়েটির মনে কি আছে কে জানে, অস্ত্র সহ ধরা পড়তে রাজি নয় রানা। তবে বেল্টের সঙ্গে তৈরি খুদে পকেটে টুকিটাকি কয়েকটা জিনিস রাখল, তার মধ্যে মারবেল সাইজের গ্যাস বোমাও আছে।

গাঢ় রঙের স্ল্যাকস্ পরল রানা, সঙ্গে মেরুন টার্টলনেক, হালকা নীল জ্যাকেট আর তোবড়ানো ক্যানভাস শূ। প্রস্তুত হয়ে ঝুল-বারান্দায় দাঁড়াল, সুইমিংপুলের চারধারে নজর বোলাচ্ছে।

হঠাৎ খুক করে কে যেন কাশল। ঝট করে ঘুরল রানা, ভঙ্গিটা আক্রমণাত্মক, কিন্তু স্যুইটের ভেতর কাউকে দেখতে পেল না। তারপর আবার কানে ঢুকল চাপা কণ্ঠস্বর, এত অস্পষ্ট যে কোন কথাই বোঝা যাচ্ছে না। শব্দের উৎস আন্দাজ করে রেইলিঙের দিকে এগোল রানা, কান পেতে শোনার চেষ্টা করল। ভাষাটা পরিষ্কার না বুঝলেও চেনা-চেনা লাগল। একবার মনে হলো উর্দু, একবার মনে হলো নেপালী। তারপর বুঝতে পারল, বিভিন্ন ভাষায় কয়েকজন লোক কথা বলছে। রেইলিং ধরে নিচের দিকে ঝুঁকল রানা, দৃষ্টিপথে বেরিয়ে এল পাঁচতলার ঝুল-বারান্দার রেইলিং।

রেইলিঙে একটা হাত রয়েছে। হাতটার রঙ খয়েরী-হলুদে মেশানো, কব্জিতে ঝকঝকে একটা রোলেক্স ঘড়ি।

রেইলিং ছেড়ে দিয়ে পিছিয়ে এল রানা, মুখে গম্ভীর হাসি।

কোন ভুল নেই, ওই ঘড়ি কিম উনের হাতে দেখেছে ও। শুধু তাই নয়, ক্যারলিনের কণ্ঠস্বরও এখন চিনতে পারছে।

প্রশ্ন হলো, ক্যারলিন আর কিম উন ফারাহর স্যুইটে কি করছে? বুদ্ধি দিচ্ছে, ওকে যাতে নিয়ে গিয়ে ফাঁদে ফেলতে পারে ফারাহ? শুধু ওরা দু'জন নয়, রানা প্রায় নিশ্চিত নিচের স্যুইটে নেপালী ভদ্রলোক ছাড়াও আরও দু'একজন আছে। সুকায়া আর আমান নয়তো?

স্যুইটে ফিরে এসে কয়েকটা জিনিস গোছগাছ করল রানা। দু'মিনিটও পার হয়নি, নক হলো দরজায়।

দরজা খুলে ফারাহকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল রানা। মনে মনে আরেকবার স্বীকার করতে হলো, রূপ ও যৌবনের এমন সমারোহ খুব কমই চোখে পড়ে। ফারাহকে নিয়ে ওর একটা প্ল্যান আছে, সে-কথা মনে পড়ে যাওয়ায় এক মুহূর্তের জন্যে দুঃখ বোধ করল। তবে তা ওই মাত্র এক মুহূর্তের জন্যেই।

সাত

ফারাহ আজ পুরোদস্তুর শুভ্রবসনা। ড্রেসটা মেঝে পর্যন্ত লম্বা গাউনই, তবে জটিল ও কৌশলী হাতের কাজ দেখার মত–কাপড়ের ওপর আরও কাপড় সেলাই করা হয়েছে, স্তরে স্তরে অসংখ্য ভাঁজ, ভারতের রাজস্থানী রমণীর অনুকরণে নাভির কাছে গোঁজা। নড়াচড়ার সময় ড্রেসটা এখানে সেখানে ফাঁক হয়ে যাওয়ায় প্রতিবার পলকের জন্যে এক ঝলক দেখা যায় সোনালি পায়ের নানান অংশ।

পাশ কাটাবার সময় শ্বাসরুদ্ধকর মিষ্টি সুবাস শীতল একটা অনুভূতি ছড়িয়ে দিল রানার সারা শরীরে। সিটিংরুমের মাঝখানে পৌঁছে পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে বন করে আধপাক ঘুরল সে, ঝুল-বারান্দা থেকে আসা উজ্জ্বল আলোর বিপরীতে পোজ দিয়ে দাঁড়াল। 'ভাল করে দেখে তারপর বলো–কেমন লাগছে আমাকে।'

'এটা কোন প্রশ্নই নয়।'

হাসল ফারাহ। তারপর বলল, 'অভ্যাস নেই, তবু আজ দু'এক ঢোক খাব। যদি বেসামাল হয়ে পড়ি, তুমি আমাকে সামলে রাখবে তো?'

'কি খাবে? বিয়ার?'

'নাহ্! বিয়ার কেন! খেলে শ্যাম্পেনই খাব।'

'বলছ অভ্যাস নেই, অথচ খেতে চাইছ–কি ব্যাপার?'

‘জীবনে প্রথম কোন পুরুষের সঙ্গে ডেটিঙে বেরুচ্ছি; এটা বিরাট একটা উপলক্ষ নয়? আরও কারণ আছে, কিন্তু সব কথা তোমাকে বলা যায় না। কি, আমাকে তুমি সামলাতে পারবে না?’

‘পারব,’ বলে টেলিফোনের দিকে এগোল রানা। ‘দেখা যাক রূম সার্ভিস কত তাড়াতাড়ি পরিবেশন করতে পারে।’

‘রূম সার্ভিসকে ডাকার আগে এখানে কি আছে দেখলে হয় না?’ ছোট্ট রিফ্রিজারেটরটা নিজেই খুলে ফেলল ফারাহ, ভেতরে হাত ঢুকিয়ে শ্যাম্পেনের একটা বোতল বের করে আনল।

রানা অবাক। ‘এ নিশ্চয়ই তোমার কারসাজি!’

‘হতভাগিনীর অপরাধ ক্ষমা করুন, প্রভু!’ বলেই আবার হেসে উঠল ফারাহ। পেটে কিছু পড়ার আগেই সে যেন মাতলামি করছে। রানা আন্দাজ করল–নার্ভাসনেস। যে-কোন কারণেই হোক উদ্বেগ আর উত্তেজনায় ছটফট করছে মেয়েটা। একটু পর পর হেসে ওঠা আসলে মনের অস্থিরতা গোপন করার চেষ্টা মাত্র।

দু’জন যেন সচেতনভাবেই পরস্পরের কাছ থেকে সামান্য দূরে, নাগালের বাইরে বসেছে। ফারাহকে মাত্র এক গ্লাস শ্যাম্পেন বরাদ্দ করল রানা। ওইটুকু পেটে পড়তেই হাত নেড়ে আর মাথা ঝাঁকিয়ে নিজের জীবন, মা-বাবা, দেশ ও কৃষ্টি-কালচার সম্পর্কে অনর্গল বলে গেল ফারাহ। তার কথায় প্রচুর অসঙ্গতি লক্ষ করল রানা, বুঝতে পারল বানানো গল্প শোনাচ্ছে, তবে ভুলগুলো ধরিয়ে না দিয়ে চুপচাপ শুনে গেল।

সন্ধের পর গাঢ় অন্ধকার নামল বাইরে। নিজের গল্প শেষ করে রানার গল্প শোনার জন্যে প্রবল আগ্রহ দেখাল ফারাহ, তারই ফাঁকে গ্লাসে আরও শ্যাম্পেন ঢালার জন্যে বারবার অনুরোধ করল।

‘তুমিই বলেছ আমি যেন তোমাকে সামলে রাখি,’ বলল রানা।

'কাজেই এক গ্লাসই যথেষ্ট, আর পাবে না।'

'এ তোমার ভারি অন্যায়!' অভিমানে ঠোঁট ফোলাল ফারাহ। 'আগে তো মাতাল হই, তারপর না সামলাবে! তুমি আমার কথার ভুল অর্থ করে আমাকে ঠকাচ্ছ!'

কথা না বলে রানা শুধু হাসল।

'বেশ, দিয়ো না শ্যাম্পেন। এবার তাহলে তোমার গল্প শুনিয়ে মুগ্ধ করো আমাকে। কোথাকার রাজপুত্র তুমি? কোথায় রাজত্ব করো? কোন্ সে দেশ, যা তোমার মত সুপুরুষের জন্ম দেয়?'

'তোমার বন্ধুর কোন অভাব নেই লেটিসে,' উত্তরে বলল রানা। 'তারা আমার সম্পর্কে জানে। তারা যা জানে তার বেশি আর কিছু বলবার নেই আমার।'

চোখ মিটমিট করল ফারাহ, কি যেন বলতে গিয়েও বলল না। ম্লান মুখে কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ থাকার পর জিজ্ঞেস করল, 'আমাকে না তোমার ডিনার খাওয়ানোর কথা?'

'তুমি বললেই অর্ডার দিই।'

'এখানে, ঘরের ভেতর কেন?'

'কি বলেছিলে ভুলে গেছ? তুমি চাও না কেউ আমাদেরকে দেখুক।'

বিস্মিত দেখাল ফারাহকে। 'হয়তো আমারই বলতে ভুল হয়েছে, কিংবা তুমি আমার কথা বুঝতে ভুল করেছ। আমি আসলে তোমাকে বড় করতে চেয়েছিলাম। চেয়েছিলাম লোকে যেন দেখতে পায় তুমি নও, আমিই তোমার পিছনে ঘুর-ঘুর করছি।'

'শোনো, ফারাহ,' বলল রানা, গম্ভীর কণ্ঠস্বর, 'সাম্প্রদায়িকতা ঘৃণা করি আমি। কিন্তু তবু হিন্দু এক পুরুষের প্রতি মুসলমান নারীর, বিশেষ করে মিশরীয় সুন্দরী শ্রেষ্ঠার এই আকর্ষণ আমাকে শুধু বিস্মিত নয়, রীতিমত হতভম্ব করে তুলছে। সত্যি কথা বলো,

ফারাহ, তোমার উদ্দেশ্যটা কি? আসলে কি চাও তুমি?’

রানাকে আরও বিমূঢ় করে দিয়ে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল মেয়েটা। ব্যস্ত হয়ে ক্ষমাপ্রার্থনা করল রানা, সান্ত্বনাও দিল, কিন্তু সেই সঙ্গে মনে প্রশ্ন জাগল, সবটাই কি অভিনয়?

রানার নরম ব্যবহার সাহায্য করল, একটু পরই নিজেকে সামলে নিল ফারাহ, চোখ মুছে রুমালটা ফেরত দিয়ে বলল, ‘আমার সব কথা তুমি জানো না, সেজন্যেই তোমার মনে উল্টোপাল্টা সব প্রশ্ন জাগছে। কিন্তু একইরকম অদ্ভুত সব প্রশ্ন আমার মনেও জাগছে, কারণ তোমার সম্পর্কেও আমি প্রায় কিছুই জানি না।’

কথা না বলে অপেক্ষা করছে রানা।

‘দু’জনেই আমরা পরস্পরকে বিশ্বাস করে মনের সব কথা খুলে বলতে প্রস্তুত নই,’ আবার বলল ফারাহ। ‘তবে আমার তরফ থেকে আমি কথা দিতে পারি, জ্ঞাতসারে আমি তোমার কোন ক্ষতি করব না। তুমিও কি আমাকে এরকম কথা দিতে পারো?’

‘হ্যাঁ, পারি। আমি তোমার জন্যে কোন বিপদ নই।’

হাসল ফারাহ। ‘ধন্যবাদ। এবার তাহলে আমার ওপর ছেড়ে দাও নিজেকে।’

‘দিলাম।’

রানাকে নিয়ে নিচে নামল ফারাহ। ডাইনিংরূমকে এড়িয়ে লাউঞ্জে ঢুকল ওরা, লাউঞ্জের ম্লান আলোয় ফারাহর সাদা ড্রেস জ্বলজ্বল করছে, কাপড়টায় যেন ফসফরাস মাখানো আছে। পথ দেখিয়ে কোণের একটা টেবিলে নিয়ে এল সে রানাকে, এখান থেকে সুইমিং পুল আর ব্যান্ডপার্টি দেখা যায়।

ওরা বসতে না বসতে হাসিমুখে এগিয়ে এল একজন ওয়েটার, এক হাতে একটা মাত্র মেন্যু, অপর হাতে শ্যাম্পেনের বোতল।

‘ওরা আমাকে চেনে,’ ব্যাখ্যা করল ফারাহ। ‘জানে, আজ আমার সঙ্গে একজন থাকবে।’

কথা না বলে হাসল রানা।

‘এখানকার ফিলিট সত্যি খুব ভাল।’

‘বেশ তো, তাই দিতে বলো।’ পরিস্থিতিটা নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখছে ফারাহ, তবে রানা তাতে কিছু মনে করছে না। খেলাটা তার নিয়মেই চলুক। আপাতত।

আক্ষরিক অর্থেই প্লেটে একেবারে হুমড়ি খেয়ে পড়ল ফারাহ, মাখনের মত নরম হাড়বিহীন মাংসের ফালিতে এতই মনোযোগী হয়ে উঠল, রানার উপস্থিতি সম্পর্কে সে যেন এই মুহূর্তে সচেতন নয়।

দূরে বার, বার-এর পাশে ছোট্ট ডান্স ফ্লোর, সেখানে কয়েকজোড়া ছেলেমেয়ে নাচছে।

কফি খাওয়া শেষ হতে রানা বলল, ‘নাচবে?’

‘না।’

‘কেন?’

‘নাচ একটা মহৎ শিল্পমাধ্যম। কিন্তু গত ছয় মাসে ঘেন্না ধরে গেছে আমার। এখানে নাচি আমি বাধ্য হয়ে, ইচ্ছা ও রুচির বিরুদ্ধে।’

দীর্ঘ এক মুহূর্ত ফারাহকে খুঁটিয়ে দেখল রানা, তারপর বলল, ‘আমার ধারণা ড্রেসটা তুমি বদলাতে চাও।’

ধনুক আকৃতির ভুরু কপালে তুলল ফারাহ। ‘মানে?’

‘মানে, এই ড্রেস পরে যদি রেসবোটে চড়তে না চাও আর কি।’

‘রানঅ্যাবাউট। তুমিই শিখিয়েছ।’

‘হ্যাঁ।’

'কিন্তু চেঞ্জ করতে হবে কেন?' রানার হাতে চাপ দিল ফারাহ, কাপড়ের ভাঁজে ঢেউ খেলিয়ে হাসল। 'এ তো কিছুই নয়, স্রেফ নামকাওয়াস্তে।' আধো অন্ধকারে ঝিক করে উঠল তার সাদা দাঁত।

পাশের একটা দরজা দিয়ে সুইমিং পুলে চলে এল ওরা। আগেই ব্যবস্থা করা ছিল, ছোট একটা গাড়িতে রানাকে তুলে নিয়ে রওনা হলো ফারাহ, ডিনার টেবিলের মত একই মনোযোগের সঙ্গে ড্রাইভ করছে।

ইয়ট বেসিনে পৌঁছে নামল ওরা, সোজা ডকের দিকে হাঁটছে ফারাহ। ডকের শেষ মাথায় পানিতে দোল খাচ্ছে তার ছোট্ট রানঅ্যাবাউট, পাশেই দেখা যাচ্ছে বড়সড় একটা ক্রিস-ক্রাফট। ক্রিস-ক্রাফটের ডেকের নিচে একজোড়া আলো জ্বলছে, সেদিকে ইঙ্গিত করে হাসল সে।

ফারাহর বোট প্রায় ষোলো ফুট লম্বা, ককপিটের মেঝেতে নরম ম্যাট ফেলা আছে। কাকতালীয় কিনা কে বলবে, বোটটা পুরো সাদা রঙ করা। ব্যাপারটা পছন্দ না হলেও রানার কিছু করার নেই।

স্কার্ট উঁচু করে ধরল ফারাহ, স্যান্ডেল খুলল, তারপর রশির ওপর হাঁটার ভঙ্গিতে ককপিটে ঢুকে পড়ল। স্টার্ন লাইন খুলল রানা, সঙ্গে সঙ্গে সেভেনটিফাইভ হর্সপাওয়ার মার্ক আউটবোর্ড স্টার্ট দিল ফারাহ। এঞ্জিনের শব্দে নিয়মিত ছন্দ চলে আসার পর বো লাইন খুলে ফারাহর পাশে এসে বসল রানা। বোট নিয়ে পিছিয়ে এল ফারাহ খানিকটা, তারপর নব্বুই ডিগ্রি বাঁক নিয়ে বে ধরে ছুটল, গতি ক্রমশ বাড়াচ্ছে। সন্দেহ নেই, বোট চালনা ভালই জানে। 'কোথায়, কতদূর বেড়াতে চাও?' এঞ্জিনের গর্জনকে ছাপিয়ে উঠল ফারাহর চিৎকার।

একটা হাত তুলে চারদিকটা দেখাল রানা। 'বেশি দূরে যাওয়া

নিরাপদ নয়, দ্বীপের কাছাকাছিই থাকো।'

ছোট ছোট ঢেউ গুঁড়িয়ে দিয়ে ছুটছে বোট, বাঁ দিকে বহু দূরে হোটেলের আলো আর ব্ল্যাকহোলের একটা ক্রেনের মাথায় লাল বালব গাইড করছে ওদেরকে, কুয়াশা থাকায় এক ফালি রূপোর মত ম্লান চাঁদ তেমন কোন সাহায্যে আসছে না। ফারাহ ল্যান্ডিং স্ট্রিপটাকে পাশ কাটিয়ে এসে সৈকত ঘেঁষে বোট চালাচ্ছে। ব্ল্যাকহোলকে ঘিরে থাকা পাথুরে পাঁচিল পর্যন্ত এল ওরা, তারপর ফিরতি পথ ধরল।

জোড়া রিবন শিথিল হয়ে পড়ায় ফারাহর চুল কালো পতাকার মত উড়ছে বাতাসে। হাত তুলে রিবন ও ক্লিপ ঠিক করে দিল রানা। এক চিলতে হেসে ওর হাতে মৃদু চাপড় মারল ফারাহ।

'আমাকে একটা সুযোগ দেবে?' তার কানে চেঁচিয়ে বলল রানা, ইঙ্গিতে হুইলটা দেখাল।

এক মুহূর্ত ইতস্তত করে হাসল ফারাহ। 'হ্যাঁ, প্লীজ।'

জায়গা বদল করল ওরা। পরস্পরকে টপকাতে হলো, তবে রানা কোন সুযোগ গ্রহণ করল না।

স্টার্টিং পয়েন্টে ফিরে এসে ইউ টার্ন নিল রানা, স্পীড কমিয়ে এনে জিজ্ঞেস করল, 'ব্ল্যাকহোলে গেলে কেমন হয়?'

'না।' মুহূর্তে আড়ষ্ট হয়ে গেল ফারাহ।

'না কেন? কি আছে ওখানে?'

'কি আবার থাকবে—ক্রেন, বুলডোজার, টিনশেড, কোদাল, ইঁট-পাথর-সিমেন্ট, এই সব।'

'বন্দী নেই? কিংবা কোন লাশ? ঠিক জানো, ওখানে কাউকে জ্যান্ত কবর দেয়া হয়নি?'

ফারাহর মুখ শুকিয়ে গেল। 'এ-সব কি বলছ তুমি!'

'ভেবো না ঠাট্টা করছি,' বলল রানা। 'এ-ও ভেবো না যে তুমি

নিষেধ করলেই আমি শুনব।’

‘আমার মত তুমিও জানো, ওখানে যাবার অনুমতি নেই,’ বলল ফারাহ। ‘আমার শক্তি কোথায় যে তোমাকে যেতে বাধা দেব! তবে সাবধান করাটা আমার কর্তব্য। ওখানে গেলে বিপদ হতে পারে।’

‘কি বিপদ?’

‘ওখানে গার্ড আছে। কাউকে দেখামাত্র গুলি করার নির্দেশ আছে তাদের ওপর।’

‘কেন, কি আছে ওখানে?’

‘আমাকে জিজ্ঞেস করছ কেন? কি আছে না আছে আমি কি করে বলব?’

‘সত্যি তুমি জানো না?’

মাথা নাড়ল ফারাহ।

‘সেক্ষেত্রে সরেজমিনে তদন্ত করে দেখা দরকার না কি আছে ওখানে?’ জিজ্ঞেস করল রানা। ‘দেখামাত্র গুলি করার নির্দেশ কখন দেয়া হয়? গোপন করার মত নিশ্চয়ই কিছু আছে ওখানে।’

উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে থ্রটল পুরোপুরি খুলে দিয়ে সরাসরি ব্ল্যাকহোল লক্ষ্য করে বোট ছোটাল রানা।

খানিক পর পর কয়েকটা জেটি দেখা গেল, শেষ জেটিটাকে পাশ কাটাচ্ছে বোট, ঢাল বেয়ে ছুটে নেমে আসতে দেখা গেল কয়েকজন লোককে। চাঁদের আলো ম্লান হলেও তাদের হাতের রাইফেলগুলো চিনতে রানার কোন অসুবিধে হলো না। স্পীড কমাল ও, রানঅ্যাবাউটকে স্রোতের সঙ্গে ভেসে যেতে দিল। এক সময় বালির সঙ্গে ঘষা খেলো বোটের তলা।

শক্তিশালী ফ্ল্যাশলাইট অন্ধ করে দিল রানাকে। হাত তুলে চোখ ঢাকল ও, চোখের কোণ দিয়ে ফারাহর দিকে তাকাল।

নিষ্প্রাণ মূর্তি হয়ে বসে আছে ফারাহ। ঠোঁট জোড়া সামান্য ফাঁক, চোখে বিহ্বল দৃষ্টি।

'প্রাইভেট! প্রাইভেট! যান, ভাগুন—কেটে পড়ুন!' অন্ধকার পানির কিনারা থেকে ভাঙা-ভাঙা ইংরেজিতে ঘেউ ঘেউ করে উঠল এক লোক, তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বরে পরিষ্কার হুমকি।

চোখ ধাঁধানো আলোর দিকে ফিরে নিঃশব্দে হাসল রানা। 'আরে, ভাই, এত ঘাবড়াবার কি আছে! আমরা নিরীহ মানুষ, একটু প্রাইভেসির খোঁজে এসেছি। কি এমন আছে এখানে, বালি আর গাছপালা ছাড়া?' দাঁড়াল রানা, উইন্ডস্ক্রীন টপকে বোটের বো-তে আসার চেষ্টা করছে।

আলোর পিছনে মোটাসোটা এক লোকের কাঠামো নড়ে উঠল, হাতের কারবাইন সরাসরি রানার পেটে তাক করল সে। 'হল্ট!' এবার আরও কর্কশ গলায় হুকুম করল। 'আর যদি এক পা এগোও, আমি গুলি করব।'

'প্লীজ!' পিছন থেকে ফিসফিস করল ফারাহ। 'প্লীজ, ওদের সাথে লাগতে যেয়ো না!'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা, আলোয় চোখ রেখে আবার হাসল, ডান হাতের তর্জনী পিস্তল বানিয়ে অপর হাতের আঙুল দিয়ে হ্যামার নামানোর ভঙ্গি করল, তারপর বলল, 'দেখলে? তোমাকে আমি গুলি করছি না। তবে পরেরবার ঠিকই করব।' পিছিয়ে ককপিটে ফিরে এল ও।

সৈকত থেকে দূরে সরে এল রানা, এঞ্জিন বন্ধ করে স্রোতে ছেড়ে দিল বোট। 'ওরা কিন্তু সত্যি গুলি করত, তাই না?'

জোর করে একটু হাসল ফারাহ। 'আমি তো তোমাকে আগেই সাবধান করেছিলাম।'

'কিন্তু আইন কি বলে জানো? প্রাইভেট দ্বীপেও বোট ভেড়ানো

যায়–তুমি হাই ওয়াটার মার্ক-এর নিচে থাকলে কারও কিছু বলবার অধিকার নেই।'

নির্ভেজাল কৌতুকের হাসি ফুটল এবার ফারাহর ঠোঁটে। 'এ-সবও তোমার জানা আছে?'

'এক সময় বোট নিয়ে ঘোরাফেরা করতাম।'

রানার বাহুতে হাত রাখল ফারাহ। 'থাক, এনিয়ে আর বাড়াবাড়ি করার দরকার নেই। লেটিসে ওরা এ-সব আইন-টাইন মানে না।'

'না মানলে মানাতে হবে!' কৃত্রিম রাগে ফোঁস করে উঠল রানা। 'রাগে আমার গা জ্বালা করছে। ভেবেছ এ অপমান আমি মেনে নেব?'

'শোনো, প্লীজ...'

ফারাহকে নিজের বুকে টেনে নিল রানা।

নড়েচড়ে বসে রানাকে চুমো খাওয়ার সুযোগ করে দিল ফারাহ। রানার ঠোঁট কাছে চলে আসছে দেখে চোখ বুজল, মুখে লাজুক হাসি।

ব্ল্যাকহোলে একটা সার্চলাইট জ্বলল। ওদের পিছনের পানিতে পড়ল আলোটা। সচল আলো ধুয়ে দিল ওদেরকে, সরে গেল, তারপর ফিরে এসে স্থির হলো।

আবার নড়ল ফারাহ, চোখ খুলল। আলোয় ভেসে যাচ্ছে বোট। রানাকে ছেড়ে খানিকটা ঘুরে বসল সে, সোনালি একটা হাত লম্বা করে সার্চলাইটের উদ্দেশে আঙুল ঝাঁকাল। সরে গেল আলোটা।

'তুমি ওদেরই দলে, তাই না?'

'বোকার মত কথা বোলো না!' রানার বুকে আবার ফিরে এল ফারাহ, মুখ তুলে ঠোঁট সাধল রানাকে।

সহজ হলো না, নিজের ওপর জোর খাটিয়েই ফারাহকে প্রত্যাখ্যান করল রানা। নিজেকে ছাড়িয়ে নিচ্ছে, হতভম্ব হয়ে ফারাহ জিজ্ঞেস করল, 'কি হলো?'

এঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে বোট ছাড়ল রানা। স্পীড ক্রমশ বাড়িয়ে বে থেকে খোলা সাগরে বেরিয়ে যাচ্ছে।

'কি করছ তুমি?'

'আমাকে দেখতে হবে কি আছে ব্ল্যাকহোলে,' বলল রানা। 'ওদিকটায় ওরা পাহারা দিচ্ছে দিক, আমরা উল্টো দিক দিয়ে উঠব।'

'তুমি পাগল হয়ে গেছ!'

'প্রেমে পড়লে সবাই হয়,' বলে হেসে উঠল রানা।

'ইস, কি মিথ্যুক!' প্রতিবাদের সুরে চিৎকার করল ফারাহ। 'প্রেমে পড়লে তুমি আমার কথা শুনতে।'

'তুমি অ্যাডভেঞ্চার পছন্দ করো না?' ফারাহর কাঁধে একটা হাত রাখল রানা। 'ওরা রাইফেল হাতে খুঁজবে আমাদের, আর আমরা ঝোপের আড়ালে প্রেম করব। অস্বীকার করো, আইডিয়াটা রোমান্টিক নয়?'

হাসল না ফারাহ। চিন্তিত।

দ্বীপের উল্টোদিকে পৌঁছল বোট। খোলে বালি ঠেকতেই এঞ্জিন বন্ধ করে দিল রানা। সামনে লাফ দিয়ে পানিতে পড়ল, ছোট নোঙরটা টেনে নিয়ে এল সৈকতে। থমথমে মুখ, ওর ঠিক পিছনেই রয়েছে ফারাহ।

'শুনছ! ওরা যদি ধরে ফেলে?' ফিসফিস করল সে।

'তুমি আছ না!' হেসে উঠল রানা।

'এটা কি ঠাট্টা করার ব্যাপার হলো?' কৃত্রিম কিনা বোঝা গেল না, রেগে উঠল ফারাহ।

'কেন, ওরা তো তোমাকে চেনেই। নিজের চোখেই তো দেখলাম একবার হাত নাড়তেই সরিয়ে নিল আলোটা। ধরা পড়লে তুমি যদি মানা করো তাহলে নিশ্চয়ই ওরা আমাকে গুলি করবে না।'

'বোকার মত ঝুঁকি নিচ্ছ তুমি,' বলল ফারাহ। 'পরে কিন্তু বলতে পারবে না আমি তোমাকে সাবধান করিনি। আমি ইঙ্গিত করতে সার্চলাইট ঘুরিয়ে নিয়েছে ওরা, ঠিক, কিন্তু তার মানে এই নয় যে ওরা আমাকে চেনে বা আমার কথা শুনবে।'

'এত ভয় পাচ্ছ কেন?' হাসছে রানা। 'কুকুরগুলো তো দ্বীপের উল্টোদিকে রয়েছে। তারা জানবেই না এদিকে আছি আমরা।'

মাথার চুলে ধীরে ধীরে হাত বোলাল ফারাহ, শিরদাঁড়া বাঁকা করল, ফুলে উঠল বুক। তারপর রানার একটা হাত ধরে ছোট্ট পাথুরে ঢাল বেয়ে ওপরে উঠতে শুরু করল। 'কে জানে,' বিড়বিড় করল সে, 'তুমি এরকম দুঃসাহসী আর বেপরোয়া বলেই হয়তো তোমাকে এত ভাল লেগে যাচ্ছে আমার।'

'কি বললে?' ভাল করে শুনতে পায়নি রানা।

'একবার ফুলের মত নরম, আবার কখনও ইস্পাতের মত কঠিন—তোমাকে আমি চিনতে পারছি না।'

ঢালের মাথায় উঠে একটা বিশাল বোল্ডারকে পাশ কাটাল ওরা। সামনে নিঃসঙ্গ একটা গাছকে ঘিরে রেখেছে কিছু ঝোপ-ঝাড়। ওদিকে ঘাসও বেশ লম্বা।

ঘাসের রাজ্যে ঢুকে দাঁড়িয়ে পড়ল ফারাহ। চোখে প্রশ্ন।

রানা তাকিয়ে আছে আধমাইল দূরে, ক্রেনের মাথায় বসানো লাল আলোটার দিকে। 'এসো, ফারাহ, ঘুরেফিরে দেখি একটু।'

'এরকম কিন্তু কথা ছিল না,' ম্লান সুরে বলল ফারাহ।

'গল্প করার বা গান শোনার সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে না,' বলল

রানা। 'রাত তো সবে শুরু হলো।'

'তোমার উদ্দেশ্যটা কি, বলো তো?'

'বিশ্বাস করো, অন্তত অসৎ কোন উদ্দেশ্য নেই। আমি শুধু আমার কৌতূহল মেটাতে চাই। তুমি যদি যেতে না চাও, বোটে ফিরে গিয়ে অপেক্ষা করো।'

'কে বলল আমি যেতে চাই না?'

রানার কানে কথাটা যেন হুমকির মত শোনাল।

'তাহলে দেখো!' আবার বলল ফারাহ, তারপর রানা বাধা দেয়ার আগেই ছুটল সে, তার সাদা ড্রেস ঘাসের ওপর ঢেউ তুলল।

তাড়াতাড়ি তার পাশে চলে এল রানা, ছোটার গতি কমিয়ে আনতে বাধ্য করল। ফারাহ ওর দিকে তাকাল না, তবে বাহুতে রানার হাতটাকে মেনে নিল। রানার ওই হাত গাইড করছে তাকে। ঘাসের রাজ্য পার হয়ে এল ওরা, ঝোপগুলোকে পাশ কাটিয়ে ছুটছে। চারপাশের পাম গাছের ঝাঁকড়া মাথাগুলো খসখস আওয়াজ করছে বাতাসে। বোট থেকে অনেক দূরে চলে এসেছে ওরা, কনস্ট্রাকশন সাইট এখান থেকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

'এখানে অপেক্ষা করো,' ফিসফিস করল রানা, তারপর দ্রুত পা ফেলে বেঢপ আকৃতির একটা কংক্রিট মিক্সার মেশিনের পিছনে এসে থামল। কান পেতে অপেক্ষা করছে।

বাতাসের হা-হুতাশ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। কিছু গ্যালভানাইজড-মেটাল স্যাক বা কুটির, একটা ড্রিলিং রিগ আর খানিক দূরে একটা ক্রেনই শুধু দেখতে পাচ্ছে ও। ওর সরাসরি সামনে মুখ ব্যাদান করে আছে প্রকাণ্ড একটা গহ্বর, গহ্বরের তিন দিকে কংক্রিটের দেয়াল—অসমাপ্ত একটা ভিত। বাকি একটা দিক ঢালু হয়ে ভিতের তলায় নেমে গেছে, মাটিতে তৈরি বুলডোজারের

ক্ষতগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

ব্যাপারটা রানার বোধগম্য হলো না। ব্ল্যাকহোলের একদিকটায় কড়া পাহারা দিচ্ছে ওরা, অথচ আরেকদিকে টহলের ব্যবস্থাও রাখা হয়নি কেন? জায়গা বদলে আরও একটু সামনে যাবে, এই সময় চাপা একটা চিৎকার ভেসে এল পিছন থেকে।

ঝট করে ঘুরল রানা। অন্ধকারে ফারাহ্ অস্পষ্ট একটা ফোঁটা মাত্র, কিন্তু তার আর রানার মাঝখানে ওই রকম আরও দুটো ফোঁটা ঢুকে পড়ছে। তারা রানার দিকেই আসছিল, ফারাহর চিৎকার শুনে এইমাত্র দাঁড়িয়ে পড়ল।

দাঁড়িয়ে থাকার স্থির ভঙ্গিই বলে দিল, ফারাহকে তারা এখনও দেখতে পায়নি। সে যদি এখন শুধু মাথা নিচু করে ঝোপের ভেতর গা ঢাকা দেয়, লোকগুলোর চোখ ফাঁকি দিয়ে সহজেই ফিরে যেতে পারবে বোটে। কিন্তু তা না করে ঘুরে দৌড় দিল ফারাহ্, পিছনে সাদা পতাকার মত উড়ছে ড্রেসটা।

পঞ্চাশ গজও যেতে পারল না, ধরা পড়ে গেল ফারাহ। একটা সিমেন্ট ট্রাকের আড়াল থেকে রানা দেখল, পিছন থেকে পিঠে ধাক্কা দিয়ে ফারাহকে মাটিতে ফেলে দিল এক লোক। কি যেন বলছে লোকগুলো, ভাষাটা রানার বোধগম্য হলো না। এক মুহূর্ত পর ফারাহকে ধরে দাঁড় করাল তারা। ছাড়ল না, টেনে-হিঁচড়ে রানার দিকে হাঁটিয়ে আনছে তাকে।

অপেক্ষা করছে রানা, গার্ডদের হাবভাব আর উদ্দেশ্য বোঝার চেষ্টা করছে। দু'জনই শক্ত-সমর্থ, তবে তেমন লম্বা নয়। রানার সন্দেহ হলো, লোক দু'জন সম্ভবত কোরিয়ান। দু'জনের হাতেই একটা করে কারবাইন রয়েছে।

তিনজনের দলটা সিমেন্ট ভর্তি ট্রাককে বাঁয়ে রেখে আরেকদিকে চলে যাচ্ছে। দূরত্ব এই মুহূর্তে বিশ গজের বেশি হবে

না। কিছু একটা করা দরকার, তবে আশপাশে আরও কোন গার্ড আছে কিনা নিশ্চিত হওয়াটা জরুরী বলে মনে করছে রানা।

লোক দু'জনের মাঝখানে রয়েছে ফারাহ, মাথাটা নোয়ানো, পা ফেলতে হোঁচট খাচ্ছে দু'একবার। যেভাবেই হোক নাভির কাছে গোঁজা ড্রেসের কাপড় আলগা হয়ে যাওয়ায় আব্রু রক্ষা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে, হাত দুটো সারাক্ষণ ব্যস্ত শরীরে ড্রেসটাকে আটকে রাখতে। ব্যাপারটা লক্ষ করে হাসাহাসি শুরু করল গার্ড দু'জন। রানা শুনতে পেল ফারাহ ফোঁপাচ্ছে।

ট্রাকের আরেক পাশে চলে এসে ওদেরকে দূরে সরে যেতে দেখছে রানা। প্রকাণ্ড গহ্বরটার কিনারা ঘেঁষে হাঁটছে ওরা। একবার একটা কুটিরের আড়ালে হারিয়ে গেল, বেরুল আধ মিনিট পর, হাঁটার গতি আগের চেয়ে একটু যেন বেশি। পা টেনে টেনে হাঁটছে ফারাহ, গতি বাড়াবার জন্যে একজন গার্ড তার হাত ধরে টান দিল। ব্যথা পেয়ে কাতরে উঠল ফারাহ, আওয়াজটা এত দূর থেকেও শুনতে পেল রানা। লোকগুলো আবার হেসে উঠল।

ওরা দৃষ্টিপথের বাইরে চলে যেতে ট্রাকের আড়াল ছেড়ে একটা কুটিরের দিকে ছুটল রানা, ওটাই সবচেয়ে কাছে। কুটিরটার পাশে থামল, দূরে তাকাতে আবার দেখতে পেল তিনজনের দলটাকে। দূর আর অন্ধকার বলেই তিনজনকে ছয় পেয়ে একটা দানবের মত লাগল দেখতে। কংক্রিটের ব্লক দিয়ে তৈরি একটা বিল্ডিঙের দিকে যাচ্ছে ওরা। ওটার কাঠামো ইস্পাত দিয়ে তৈরি। একমুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকল ওরা। গেট খুলে যেতে ভেতরে ঢুকল। আবার বন্ধ হয়ে গেল সেটা।

কুটিরের ঠাণ্ডা ধাতব দেয়ালে হেলান দিয়ে পরিস্থিতিটা বিবেচনা করছে রানা। ঠিক হুবহু এরকম না হলেও, আজ সন্ধ্যায় ওর যে প্ল্যান ছিল তার সঙ্গে অনেকটাই মিলে গেছে ঘটনাগুলো।

সমস্যা হলো, অনুভূতি বলছে একা শুধু ওরই নয়, আরও অন্তত একজনের একটা প্ল্যান ছিল।

ফারাহ নিরীহ, ঘটনাচক্রের অসহায় শিকার, এটা কোনভাবেই মেনে নেয়া যাচ্ছে না। মানতে বাধা দিচ্ছে ওর সাদা কাপড়।

আট

ঘটা করে সিদ্ধান্ত নেয়ার কোন প্রয়োজন নেই। ফারাহর বন্দী হওয়াটা স্রেফ অভিনয় মাত্র, জানে রানা; অন্ধকারে সাদা ড্রেসটা পতাকার মত ওভাবে ওড়াবার সেটাই কারণ। কাজেই ওকেও এখন বিপদগ্রস্ত সুন্দরীকে উদ্ধারকারীর ভূমিকায় অভিনয় শুরু করতে হবে, কারণ তা না হলে ব্ল্যাকহোলের সিকিউরিটি কতটা কড়া তা যাচাই করা সম্ভব নয়। তাছাড়া, রানাকে এও জানতে হবে, এখানে কি এমন মূল্যবান জিনিস লুকানো আছে যে এত আয়োজন করে পাহারা দেয়া হচ্ছে!

কুটির, অর্থাৎ মেটাল কনস্ট্রাকশন স্যাকটাকে পিছনে ফেলে এগোল রানা। ইস্পাত ও কংক্রিটের বিশাল সব কাঠামোর মাথায় ওঅর্কলাইট জ্বলছে, ফলে সতর্ক থাকতে হলো গায়ে যাতে আলো না লাগে। বুলডোজার, মিক্সার মেশিন আর ট্রাকের একটা বহর থাকায় আড়াল পেতে তেমন অসুবিধে হলো না। খানিক পর সামনে পড়ল ঘন ঝোপ, ক্রল করে একটা থেকে আরেকটায় ঢুকতে হলো। এভাবে এগিয়ে কংক্রিট ব্লক দিয়ে তৈরি বিল্ডিংটার কাছাকাছি চলে এল রানা।

আকাশ ছোঁয়া কাঠামোটার ডান পাশে আরেকটা প্রকাণ্ড গহ্বর দেখা গেল। রানার মনে পড়ল, ওকে বলা হয়েছে ব্ল্যাকহোলে দুটো হোটেল কমপ্লেক্স তৈরির কাজ ফান্ডের অভাবে স্থগিত রাখা হয়েছে। ওই গহ্বরের কাছাকাছি, বিল্ডিংটার পিছন দিকে, এক

জোড়া ছায়ামূর্তি দেখতে পেল রানা। কিছু করছে না, ওর দিকে পিছন ফিরে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। গাঢ় একটা রেখা দেখে রানা আন্দাজ করল, ওদের সামনে থেকে ঢাল শুরু হয়েছে, নেমে গেছে সৈকতে।

এখন আর রানার সামনে ঝোপ বা অন্য কোন আড়াল নেই, বিল্ডিংটার ভেতর ফারাহকে কি অবস্থায় রাখা হয়েছে জানতে হলে ঝুঁকি নিয়ে এগোতে হবে ওকে। ক্রল করে আলোয় বেরিয়ে এল ও। দশ গজের মত এগিয়েছে, হঠাৎ একটা ছায়ামূর্তি ঢালের দিকে পিছন ফিরে এদিকে তাকাল। স্থির হয়ে গেল রানা–চারো চাক্কা জাম। ফাঁকা জায়গা, মাঝখানে লম্বা হয়ে পড়ে থাকল, চারপাশে প্রচুর আলো। মাথাটা উঁচু করা, তবে সেটা ভুলেও নাড়ছে না, দৃষ্টি স্থির হয়ে আছে লোকটার ওপর। মনে মনে গাল দিল রানা, 'ঘুরে দাঁড়া, শালা!' ঝাড়া এক মিনিট পার হলো, লোকটা ঘুরল তো না-ই, বরং একদৃষ্টে যেন রানার দিকেই তাকিয়ে থাকল। কপাল খারাপ, এবার দ্বিতীয় ছায়ামূর্তিও ঘুরে এদিকে তাকাল। তারপর, লোক দু'জনের ডানপাশে, কিছু একটা নড়ে উঠল। চোখের কোণ দিয়ে তাকাতে চকলেট রঙের চারপেয়েটাকে দেখতে পেল রানা, গহ্বরের ঢাল বেয়ে উঠে আসছে। একটা শেয়াল!

চুরি করে ধরা পড়ার ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে আছে শেয়ালটা। এত দূর থেকেও তার মুখে লম্বা কি যেন একটা দেখতে পাচ্ছে রানা, নিশ্চয়ই হাড় হবে। ঝট করে পলির কথা মনে পড়ে গেল ওর। মেয়েটা ওকে বলেছিল, ব্ল্যাকহোলের শেয়াল লাশ খেয়ে ফেলে। আর ক্যারলিন ওকে আজই টেলিফোনে বলেছে, বেশি কথা বলার অপরাধে জ্যান্ত কবর দেয়া হয়েছে পলিকে এই ব্ল্যাকহোলেই!

চতুর শেয়াল গার্ড দু'জনকে দেখতে পেয়ে ইতস্তত করছে। শেষ পর্যন্ত ওই চোরই সংকট থেকে মুক্ত করল রানাকে। শেয়ালের

উপস্থিতি টের পেয়ে পাশের একটা ঝোপ থেকে কক্ কক্ করে ডেকে উঠল একটা বনমোরগ। ওই ডাক শুনে ঘাড় ফেরাল দুই ছায়ামূর্তি। বিপদ টের পেয়ে খিঁচে দৌড় দিল শেয়াল, তবে মুখের জিনিসটা ফেলে দেয়নি। সেটা হাড় হোক বা অন্য কিছু, গার্ড দু'জনের কাছে তা অমূল্য বলে মনে হলো–হাতের কারবাইন বাগিয়ে ধরে শেয়ালটাকে ধাওয়া করল তারা, সেই সঙ্গে এমন হৈ-চৈ বাধিয়ে দিল, ধরতে পারলে যেন কাঁচা চিবিয়ে খেয়ে ফেলবে।

রানা একবার ভাবল গহ্বরে নেমে দেখে আসবে, নিচে সত্যি কোন কবর আছে কিনা। কিন্তু না, ওর প্রথম কাজ ফারাহ্ কি অবস্থায় আছে দেখা। তারপর যদি সময় সুযোগ পাওয়া যায়, একবার নাহয় নামবে গহ্বরটায়।

দুই ছায়ামূর্তি শেয়ালের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটছে, একটু পরই অদৃশ্য হয়ে গেল। সিধে হলো রানা, এক দৌড়ে ফাঁকা জায়গা পার হয়ে বিল্ডিংটার কাছে পৌঁছে গেল। এদিকে কোন জানালা নেই, গেটটাও বন্ধ। ওপরে তাকিয়ে একটা ভেন্টিলেটর দেখতে পেল রানা, পুরোটাই দখল করে রেখেছে এগজস্ট ফ্যান। দেয়াল ঘেঁষে এগোল ও, কোণ ঘুরে একটা ইস্পাত ও রিইনফোর্সড কাঁচ দিয়ে তৈরি জানালার সামনে থামল। সামান্য একটু খোলা, চোখ দিয়ে মেপে বুঝতে পারল শরীর ঢুকবে না।

জানালার ভেতর থেকে নারীকণ্ঠের আর্তনাদ ভেসে এল। কেউ একজন ব্যথায় কাতরাচ্ছে, তবে সে ফারাহ্ কিনা বলা কঠিন।

সাবধানে কংক্রিটের কার্নিসে উঠল রানা, ফাঁকটায় চোখ রেখে ভেতরে তাকাল। শক্ত কাঠের একটা চেয়ারে বসে রয়েছে ফারাহ্, হাত দুটো পিছমোড়া করে বাঁধা। মাথাটা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ায় চুলে ঢাকা পড়ে আছে মুখ। সিলিং থেকে ঝুলছে নিঃসঙ্গ একটা বালব, আলোর এত তেজ যে বন্ধ হবার পর চোখ সহজে

খোলা যাচ্ছে না। হিসাবে কি ভুল হয়ে গেছে ওর? গার্ডদের হাতে ফারাহর বন্দী হওয়াটা অভিনয় হলে এভাবে কি সে নির্যাতিত হত? শারীরিক এবং মানসিক, দু'ভাবেই চরম অপমান করা হচ্ছে তাকে। চেয়ারের সঙ্গে বাঁধার আগেই জোর করে তার সাদা ড্রেস খুলে নেয়া হয়েছে, ফারাহ এই মুহূর্তে সম্পূর্ণ বিবস্ত্র। তার বাহু আর ঊরুতে লম্বা দাগ ফুটে আছে, কারণটা বোঝা গেল তার সামনে দাঁড়ানো একজন গার্ডের হাতে চামড়া দিয়ে মোড়া ছোট একটা ব্যাটন দেখে।

ফারাহর নিরাবরণ বুক ঘন ঘন ওঠানামা করছে। ঘামের একটা ধারা নামছে বুক বেয়ে, তলপেট হয়ে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে নিচে। মাঝে মাঝে শিউরে উঠছে সে। খোলা ঊরুর ওপর লাঠির আরেকটা ঘা পড়ল, চিৎকার করে উঠল ফারাহ। আঘাতটা যেন রানার নিজের গায়েই লাগল। ব্যথা, সেই সঙ্গে তীব্র অপমান বোধ করল ও, সহ্য করল দাঁতে দাঁত চেপে।

ফারাহর সামনে, জানালার দিকে পিছন ফিরে যে লোকটা দাঁড়িয়ে রয়েছে তার পরনে খাকি ট্রাউজার ও শার্ট। লোকটা বেঁটে ও মোটা। কামরায় আরও দু'জন রয়েছে, তারাও প্রথম লোকটার মত কোরিয়ান, একই রঙের ট্রাউজার ও শার্ট পরে আছে। ব্যাটন ছাড়াও প্রথম লোকটার কাঁধে কারবাইন রয়েছে। বাকি দু'জনের হাতে শুধু কারবাইন, তবে কোমরের হোলস্টারে হ্যান্ডগানও দেখতে পেল রানা।

আবার লাফিয়ে উঠল ব্যাটন। অভিনয় বা ঘরোয়া বিবাদ হলে এত জোরে কেউ মারে না, সেই মার কেউ এভাবে সহ্যও করে না। ব্যথায় চিৎকার শুরু করল ফারাহ, যেন তাকে থামাবার জন্যেই এবার লোকটা ঠাস-ঠাস করে তার গালে দুটো চড় কষল। ঠোঁট ফেটে রক্ত গড়াচ্ছে, জানালা থেকে নেমে পড়ল রানা। কিছু

একটা করতেই হচ্ছে ওকে। কি করা যায়...ভাবতে গিয়েই বিদ্যুৎচমকের মত চিন্তাটা খেলে গেল মাথায়।

বিল্ডিংটাকে পিছনে রেখে ছুটছে রানা, ফিরে আসছে ট্রাকবহরের দিকে, এই সময় রাতের জমাট নিস্তব্ধতা চুরমার করে দিয়ে একটা রাইফেল গর্জে উঠল। ছ্যাঁৎ করে উঠল বুকটা, মারাত্মক অমঙ্গল আশঙ্কায় থরথর করে কেঁপে উঠল শরীর। পরমুহূর্তে আশঙ্কাটা অমূলক মনে হলো–বদ্ধ ঘরের ভেতর ফারাহকে ওরা রাইফেল দিয়ে গুলি করবে না। আওয়াজটা অন্য কোন দিক থেকে এসেছে। গার্ডদের কাজও হতে পারে, নাগালের মধ্যে পেয়ে টার্গেট করেছে শেয়ালটাকে।

বহরের প্রথম সারির তিনটে ট্রাক পরীক্ষা করল রানা। ইগনিশনে চাবি আছে, ফুয়েল আছে ট্যাংকে, স্টার্ট দিতে সাড়া দিল সবগুলোই। তিন নম্বর ট্রাকটা নিয়ে রওনা হলো ও। বাকি দুটোর মত এটাতেও তেরপল দিয়ে ঢাকা সিমেন্টের বস্তা ঠাসা।

পাঁচশো গজ দূরে বিল্ডিংটা, কাজেই স্পীড বাড়াবার সুযোগ পেল ও। ফারাহ আহত হবে, এরকম ঝুঁকি নিতে পারে না ও, তাই স্থির করল, দ্বিতীয় ট্রাকটা টার্গেট করবে ফারাহ যে ঘরে বন্দী তার পাশের কোন একটা কামরা। তৃতীয়টা নিয়ে ছুটছে এখন বিল্ডিংটার গেট লক্ষ্য করে।

গেট যখন বিশ গজ দূরে, চলন্ত ট্রাকের ক্যাব থেকে লাফ দিয়ে নিচে পড়ল রানা, গড়িয়ে খানিক দূর সরে এসে সিধে হলো, কি ঘটতে যাচ্ছে দেখার জন্যে অপেক্ষায় না থেকে ছুটে ফিরে আসছে ট্রাক বহরের দিকে।

সিমেন্টের বস্তা ঠাসা সাত টনী ট্রাক ঘণ্টায় পঁচিশ মাইল বেগে ছুটে এসে আঘাত করল লোহার গেটে। অসম্ভব মজবুত গেট, তাসত্ত্বেও প্রায় অনায়াসে সেটাকে ভেঙে ভেতরে ঢুকে পড়ল ট্রাক।

গেটের পাশে গার্ডরূম ছিল, ভেতরে দু'জন গার্ড খেতে বসেছিল, সাবধান হবার আগেই তাদের ঘাড়ের ওপর চড়াও হলো ঘাতক ট্রাক। গার্ডরূম মাটির সঙ্গে মিশে গেল, লোক দু'জন পিষ্ট হলো চাকার তলায়।

প্ল্যানটা বদলাতে হলো রানাকে। দ্বিতীয় ট্রাক নিয়ে বিল্ডিংটার দিকে এগোবার সময় দেখল, ভাঙা গেটের কাছে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে আট-দশজন গার্ড, প্রত্যেকের হাতে কারবাইন। ওদেরকে ব্যস্ত রাখা দরকার, কাজেই বাঁক না ঘুরে সোজা ট্রাক ছোটাল ও, ফাঁকা জায়গায় বেরুবার আগেই লাফ দিয়ে নেমে পড়ল ক্যাব থেকে।

দানবটাকে ছুটে আসতে দেখে প্রথমে হেডলাইট, তারপর উইন্ডস্ক্রীন লক্ষ্য করে গুলি করল গার্ডরা, সেই সঙ্গে পিছিয়ে ঢুকে পড়ছে বিল্ডিঙের খোলা উঠানে। কি ঘটছে কারও কোন ধারণা নেই, অন্তত চিৎকার-চেঁচামেচি শুনে তাই মনে হলো রানার।

প্রথম ট্রাকটা নিয়ে ঘুরপথে এগোল রানা এবার, টার্গেট—বিল্ডিংটার বাম পাশ, ঠিক যেখানে কোণটা শেষ হয়েছে।

নাক বরাবর বিল্ডিঙের দেয়াল ও কোণ বিশ গজ দূরে থাকতে মাটিতে গড়িয়ে পড়ল রানা, তিন সেকেন্ড পর সিধে হয়ে দেখল, দেয়াল ভেঙে ভারী যন্ত্র-দানব বিল্ডিঙের ভেতর ঢুকছে, সামনে পড়া ফার্নিচার গুঁড়িয়ে দিয়ে উল্টোদিকের দেয়াল ধসাল, তারপর একদিকে সামান্য কাত হয়ে স্থির হয়ে গেল। ইতিমধ্যে ছুটতে শুরু করেছে রানা, ট্রাকের পিছু নিয়ে প্রায় একই সঙ্গে সরু ফাঁক গলে নিজেও ঢুকে পড়ল বিল্ডিঙের ভেতর।

ঘরের ভেতর ট্রাকের অর্ধেকটার মাত্র জায়গা হয়েছে, বাকি অর্ধেক সামনের দেয়াল ভেঙে ঢুকে পড়েছে আরেক ঘরে। শুধু এই দুটো ঘরই নয়, ডান পাশের আরেকটা ঘরের দেয়ালও ধসে

পড়েছে। সেই ভাঙা দেয়াল টপকে ভেতরে ঢুকল রানা।

সময় নষ্ট না করার সুফল হাতেনাতেই পাওয়া গেল। দেয়াল ধসে চাপা পড়েছে দু'জন গার্ড। দেয়ালটা বিস্ফোরিত হবার সময় ছুটে আসা ইঁটের আঘাতে তাদের একজনের মাথার মগজ বেরিয়ে পড়েছে। অক্ষত অবস্থায় মাত্র একজনকেই দেখল রানা, যে লোকটা ফারাহকে মারছিল। সে তার আহত সঙ্গীকে ভাঙা দেয়ালের তলা থেকে বের করার জন্যে ব্যাটন ফেলে আবর্জনা সরাচ্ছে। চেয়ার সহ উল্টে পড়ে আছে ফারাহ, ব্যথায় কাতরাচ্ছে।

মেঝে থেকে একটা কারবাইন তুলে উল্টো করে ধরল রানা, অক্ষত লোকটার মাথায় নামিয়ে আনল। হিসেবের গরমিল, খুলি ফাটার আওয়াজ শুনে বুঝতে পারল প্রয়োজনের চেয়ে বেশি জোরাল হয়ে গেছে মারটা। কি ঘটছে বুঝতে পেরে গোঙানি থামিয়ে চোখ বুজে জ্ঞান হারানোর ভান করল আহত লোকটা। তাকে কিছু না বলে ফারাহর সামনে এসে হাঁটু মুড়ে বসল রানা। হাতের বাঁধন খোলার সময় ফিসফিস করল, 'কোথায় লেগেছে? ছুটতে পারবে?'

'ছুটে পালাব কোথায়!' স্বগতোক্তি করল ফারাহ পরিষ্কার বাংলায়।

'এটাই বোধহয় অষ্টম আশ্চর্য!' মাতৃভাষায় বিড়বিড় করল রানাও। কান দুটো সজাগ, দূর থেকে গার্ডদের চিৎকার ভেসে আসছে।

শুনতে পেয়ে কি না পেয়ে বলা মুশকিল, রানার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল ফারাহ। তারপর অস্ফুটে জিজ্ঞেস করল, 'কি…কি বললে তুমি?'

পরিষ্কার বাংলায় বলল রানা, 'গ্রীক ভাষা! ও তুমি বুঝবে না!' ঘরের চারদিকে চোখ বুলিয়ে ফারাহর ড্রেসটা কোথাও দেখতে

পেল না।

ফারাহকে হতভম্ব দেখাচ্ছে। 'তুমি তাহলে বাঙালী?'

জ্যাকেট খুলছে রানা, কথা না বলে হেসে উঠল।

ওই জ্যাকেট খুলতে দেখেই, এতক্ষণে, নিজের নিরাবরণ শরীর সম্পর্কে সচেতন হলো ফারাহ। চেয়ারে কুঁকড়ে গেল সে, হাত দুটো দিয়ে লজ্জা নিবারণের ব্যর্থ চেষ্টা করছে। রানা জ্যাকেটটা বাড়িয়ে ধরতে মাথা নাড়ল সে, বলল, 'শার্টটা দাও, প্লীজ!'

'দুঃখিত, আমারই ভুল,' বলল রানা, দ্রুত শার্ট খুলে ধরিয়ে দিল ফারাহর হাতে। জ্যাকেটের চেয়ে শার্ট অনেক বেশি লম্বা হওয়ায় নিজেকে সহজেই ভালভাবে ঢাকতে পারবে ফারাহ। বলতে হলো না, তার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াল রানা। এই সুযোগে জানালা দিয়ে একবার বাইরেটা দেখে নিল। গার্ডরা এখনও কেউ এদিকে আসছে না।

'শার্ট পরেও কোন লাভ নেই, তবে যদি বেল্টটা দিতে...কোমরে ওটা বাঁধলে নিচের দিকে শার্টটা উড়তে পারত না...'

ইতিমধ্যে জ্যাকেটটা আবার পরেছে রানা। জানালার দিকে পিছন ফিরে কোমর থেকে বেল্ট খুলল, ধরিয়ে দিল ফারাহর বাড়ানো হাতে। 'দৌড়াতে পারবে?'

'পারব। কিন্তু ব্ল্যাকহোলে ওরা পঞ্চাশজন গার্ড, পালানো কি সম্ভব?'

বেল্টটা কোমরে বাঁধতে ফারাহকে সাহায্য করল রানা। 'খুব সাবধান, কেমন? এর ভেতর একজোড়া ক্ষুদে বোমা আছে, নার্ভগ্যাস।'

'কিভাবে পালাব বলছ না যে?' ফারাহ উদ্বিগ্ন।

‘ব্ল্যাকহোল থেকে ভার্জিনে যাবার আর কি উপায় আছে বলো, বোট ছাড়া? পাঁচিল টপকে যাওয়া যায়?’

‘না, অসম্ভব! পাঁচিলের মাথায় ইলেকট্রিফায়েড তার আছে, পাহারাও আছে।’ ইতস্তত একটা ভাব দেখা গেল ফারাহর চোখে, তারপর আবার বলল, ‘আন্ডারগ্রাউন্ড টানেল হয়ে লুকাস ইনে যাওয়া যায়, কিন্তু টানেলের গেট আর এলিভেটরে গার্ড আছে…’

‘সেক্ষেত্রে যেভাবে হোক বোটেই পৌঁছতে হবে,’ বলল রানা, জানালা দিয়ে আরেকবার দেখে নিল বাইরেটা। গার্ডদের কাউকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না, হাঁক-ডাকও থেমে গেছে।

‘তুমি কি ওকে মেরে ফেলেছ?’ হাঁটু মোড়া, সেজদা দেয়ার ভঙ্গিতে পড়ে থাকা লোকটার দিকে তাকাল ফারাহ।

‘জানি না। বোধ হয়।’ লোকটাকে এড়িয়ে তার আহত সঙ্গীর দিকে ঝুঁকল রানা, খানিকটা ইঁট-বালি সরিয়ে কোমরের হোলস্টার থেকে পিস্তলটা বের করে নিল। ‘পালাতে গিয়ে আরও লোক মারতে হতে পারে।’

উদ্বেগে অসুস্থ দেখাল ফারাহকে। ‘এরকম ভয়ঙ্কর অবস্থা হবে জানলে…তোমার সঙ্গে আমি আসতাম না! আমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়বে এখন। এর জন্যে তুমি আর তোমার উদ্ভট…’

ঝট্ করে ফারাহর মুখে হাতচাপা দিল রানা। ‘সাবধান, আস্তে কথা বলো!’ গার্ডদের অদ্ভুত আচরণ ভাল চোখে দেখছে না ও। ‘এসো। পিস্তল চালাতে জানো?’ ফারাহর হাত ধরে ভাঙা দেয়াল টপকে ট্রাকের ঘরে চলে এল, পিস্তলটা বাড়িয়ে ধরেছে।

হঠাৎ আড়ষ্ট হয়ে গেল ফারাহ। ‘হ্যাঁ, চালাতে জানি,’ একমুহূর্ত ইতস্তত করে বলল। ‘কিন্তু, দুঃখিত, আমি ওদেরকে গুলি করতে পারব না!’

ফারাহর কাঁধ ধরে ঝাঁকাল রানা। ‘তুমি কি এখনও ওদের

দলে? ধরতে পারলে কি অবস্থা করবে জানো, তারপরও বলছ গুলি করবে না?'

'লাগছে!' কাঁধ থেকে রানার হাতটা নামিয়ে দিল ফারাহ। 'তোমার সব কথার উত্তর আমার পক্ষে দেয়া সম্ভব নয়। আমাকে ওদের দরকার, কাজেই মেরে ফেলবে বলে বিশ্বাস করি না। এখন আমার মনে হচ্ছে, পালাতে চেষ্টা না করে ওদের হাতে আমার ধরা দেয়াই উচিত। তুমি বরং একাই পালাতে চেষ্টা করো।'

তর্ক করা বৃথা, রানা বলল, 'এক মিনিট।' ফারাহকে রেখে আবার পাশের ঘরে ঢুকল ও। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এল, তবে এবার কাঁধে একটা লাশ।

'কি করছ!' ফারাহ হতভম্ব।

'এসো!' ফিসফিস করল রানা, ট্রাকের পাশ ঘেঁষে পিছন দিকে চলে এল। ওর সামনে বিধ্বস্ত দেয়াল, এই দেয়াল ভেঙেই ভেতরে ঢুকেছে ট্রাকটা। বাইরের ফাঁকা জায়গাটা আলোকিত, কেউ নেই সেখানে। ভাঙা ঘর থেকে বের না হয়ে ট্রাকের পিছনে দাঁড়িয়ে থাকল ও, গলা আরও খাদে নামিয়ে ফারাহকে বলল, 'এখুনি জানা যাবে তোমাকে নিয়ে কি করতে চায় ওরা। আমার পাশে দাঁড়াও, তারপর ওদের ভাষায় চিৎকার করে বলো তোমার সঙ্গী অর্থাৎ আমি আহত হয়েছি। আরও বলো, আমাকে কাঁধে নিয়ে বেরুচ্ছ তুমি, ওরা যেন গুলি না করে।'

কি যেন চিন্তা করল ফারাহ, তারপর রানার পাশে এসে কোরিয়ান ভাষায় ওর শেখানো কথাগুলো চিৎকার করে বলল। সে থামতেই কাঁধে ও পিঠে ফেলা লাশ নিয়ে পিছু হটতে শুরু করল রানা, ভাঙা ঘর থেকে সাবধানে বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে।

ভাঙা দেয়াল মাত্র টপকেছে, এক সঙ্গে চার-পাঁচটা রাইফেল গর্জে উঠল। ঝাঁকি খেলো রানা, ঘন ঘন কয়েকটা হোঁচট খেয়ে

ঘরের ভেতর সেঁধিয়ে এল। পিঠে লাশ না থাকলে অন্তত একটা বুলেট ওর শিরদাঁড়া গুঁড়িয়ে দিত। লাশ ফেলে ফারাহর হাত খামচে ধরল ও। 'এখনও চাও আমি একা পালাই?' উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে ট্রাকের পাশ ঘেঁষে সামনের দিকে ছুটল, ফারাহকে দু'হাতে ধরে তুলে দিল ক্যাবে, তারপর এক লাফে নিজেও উঠে বসল ড্রাইভিং সীটে। 'ওরা জানত আমরা এখানে আছি, ওত পেতে ছিল কখন বেরোই সেই অপেক্ষায়।' সংঘর্ষের পরপরই বন্ধ হয়ে গেছে ট্রাকের এঞ্জিন, নিতান্ত ভাগ্যই বলতে হবে যে গিয়ার নিউট্রাল করে ইগনিশনে চাবি ঘোরাতেই আবার সেটা সচল হলো। তবে হেডলাইট গুঁড়ো হয়ে গেছে, ট্রাক নিয়ে পালাতে হলে রানাকে চোখ জ্বালতে হবে।

কারবাইন কোলের ওপর রেখেছে রানা, পিস্তলটা ফারাহর হাতে গুঁজে দিল। 'অকারণে কাউকে খুন করার দরকার নেই, তবে আত্মরক্ষার জন্যে অবশ্যই গুলি করবে। মাথা যতটা পারো নিচু করো, আমরা বেরুচ্ছি।' ব্যাক গিয়ার দিয়ে ছেড়ে দিল ট্রাক, পিছন দিকে যাচ্ছে ওরা।

এঞ্জিনের গর্জনকে ছাপিয়ে শোনা গেল গুলির তীক্ষ্ণ শব্দ, আট-দশটা রাইফেল একযোগে গর্জে উঠল। ভাগ্য ভাল যে সরাসরি সামনে থেকে কেউ গুলি করছে না, তা করলে উইন্ডস্ক্রীন বলে কিছু থাকত না, ক্যাবের ভেতর বন্দী ভোমরার মত দিগ্বিদিক ছুটোছুটি করত দু'একটা বুলেট। স্নাইপাররা বিল্ডিঙের দু'পাশের গাছ, ঝোপ, বোল্ডার, মাটির স্তূপ আর ছোট গর্তের আড়াল থেকে গুলি করছে।

বেশি দূর পিছু হটলে উইন্ডস্ক্রীনকে টার্গেটের মধ্যে পেয়ে যাবে ওরা, কাজেই আলোকিত ফাঁকা জায়গায় বেরিয়ে এসেই ট্রাক ঘুরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করল রানা। ব্ল্যাকহোলে পাকা রাস্তা বলে কিছু

নেই, ফাঁকা জায়গায় ট্রাক চলাচলের ফলে দু'সারি গর্ত তৈরি করেছে চাকাগুলো, সেই গর্ত অনুসরণ করে অন্তত পাঁচশো গজ এগোতে চায় রানা। ট্রাক বহরের কাছাকাছি পৌঁছে জঙ্গলের ভেতর ঢোকার ইচ্ছা। আশা, গা ঢাকা দিয়ে যদি বোটের কাছে ফেরা যায়।

ট্রাক ঘোরাচ্ছে, এই সময় হাড়ে হাড়ে টের পেল কাদের সঙ্গে লেগেছে ও। অন্ধকারে ওটাকে আসতে দেখেনি, পড়তেও দেখেনি, প্রচণ্ড শব্দ আর প্রবল ঝাঁকি জানিয়ে দিল একেবারে পিঠের কাছে গ্রেনেড বিস্ফোরিত হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তেরপল আর সিমেন্টের ব্যাগে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল।

আয়নায় চোখ পড়তে পিছনটা দেখতে পেল রানা, খুনের নেশায় উন্মাদ হয়ে ওদেরকে ধাওয়া করছে দশ-বারোজন গার্ড। গুলি তো করছেই, দাঁত দিয়ে পিন খুলে গ্রেনেডও চার্জ করছে।

'গুলি করো!' চিৎকার করল রানা। ভাবছে, এ-যাত্রা বোধহয় পৈত্রিক প্রাণটা হারাতেই হচ্ছে। একা হলে একটা ফাইটিং চান্স ছিল, কিন্তু সঙ্গে ফারাহ থাকায় নির্ঘাত ঝামেলায় পড়তে হবে ওকে, খুনীদের চোখ ফাঁকি দেয়া অসম্ভব হয়ে উঠবে।

পিস্তল সহ ডান হাতটা বাইরে বের করে দিল ফারাহ, হাতের পিছু নিয়ে মাথাটাও বেরিয়ে গেল। ট্রিগার টানল সে। কি ঘটছে বুঝতে একটু দেরি করে ফেলল রানা, কিন্তু ততক্ষণে যা হবার হয়ে গেছে–পর পর সাতটা গুলি করে চেম্বার খালি করে ফেলেছে ফারাহ।

গুলির ভয়ে পিছিয়ে পড়েছিল গার্ডরা, এখন আবার ছুটছে তারা। দ্বিতীয় গ্রেনেড কি কারণে যেন ফাটেনি। খানিকটা স্বস্তিকর ব্যাপার হলো, ট্রাকের পিছনের আগুন নিভে আসছে।

ট্রাক বহর আর মাত্র পঞ্চাশ কি ষাট গজ দূরে, এই সময় ওপর

থেকে একটা সার্চলাইট জ্বলে উঠল। পঞ্চাশ ফুট উঁচু একটা মাচার ওপর ওটা, পিছনে দু'জন লোকও দাঁড়িয়ে আছে—একজন সার্চলাইটটাকে ঘোরাচ্ছে, আরেকজন রাইফেল তুলে লক্ষ্যস্থির করছে। আলোর বন্যা আরও বিপদ উন্মোচন করলঃ মাচার নিচে বুলডোজার, ট্রাক আর মিক্সার মেশিনের আড়াল থেকে রাইফেলের ব্যারেল বেরিয়ে আছে পাঁচ-সাতটা। পঞ্চাশজন গার্ড, ধীরে ধীরে মিলছে হিসাবটা।

'হুইলটা ধরো!' ফারাহকে বলল রানা। কোল থেকে কারবাইন তুলে ক্যাব থেকে মাথা বের করল, হাতের অস্ত্র মাচার দিকে তাক করে ট্রিগার টানল—সেমি অটোমেটিকে দিয়ে।

এক পশলা বুলেটের অপেক্ষায় টান-টান হয়ে ছিল রানার পেশি, কোন শব্দ না পেয়ে ঢিল পড়ল, সেই সঙ্গে নিস্তেজ হয়ে গেল স্নায়ু—মনে হলো শরীরের সব শক্তি কেউ যেন শুষে নিয়েছে।

'কি হলো?' কান্না চাপতে গিয়ে ককিয়ে উঠল ফারাহ।

তাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে হুইলটা একরকম কেড়ে নিল রানা, ওর হাতে বন বন করে ঘুরছে সেটা। 'কারবাইন জ্যাম হয়ে গেছে!'

'ট্রাক ঘোরাচ্ছ কেন?' আঁতকে উঠল ফারাহ। 'বোট তো ওদিকে নয়!'

বাধ্য হয়েই রণকৌশল বদল করছে রানা। এই মুহূর্তে ট্রাক থেকে নামা আর আত্মহত্যা করা একই কথা। হাস্যকর মনে হলেও, এখনকার পরিস্থিতিতে ট্রাকটাই ওদের একমাত্র অস্ত্র। এটাকে ডিফেন্সিভ অর্থাৎ পালানোর কাজে লাগাতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে ও, কাজেই অফেন্সিভ কাজে না লাগিয়ে উপায় নেই। 'পিছনে লোক লেগে থাকলে বোটে পৌঁছেই বা লাভ কি?'

ট্রাক ঘুরছে দেখে আট-দশজন গার্ড দাঁড়িয়ে পড়েছে। স্পীড

বাড়িয়ে সরাসরি তাদের দিকে ছুটল রানা, মাথাটা নিচু করে রেখেছে। মাচা ও মাচার নিচ থেকে গুলি হচ্ছে। সামনের গার্ডরা ছিটকে সরে যাচ্ছে দু'পাশে। একটা ঝোপের ভেতর ঝলসে উঠল মাজল ফ্ল্যাশ, পরমুহূর্তে বিস্ফোরিত হলো উইন্ডস্ক্রীন।

ফুঁপিয়ে উঠল ফারাহ, গা ঝাড়া দিতে এক রাশ ভাঙা কাঁচ ছড়িয়ে পড়ল ক্যাবের মেঝেতে।

'গ্রেনেড!' হিসহিস করল রানা, দু'হাতে বন বন করে হুইল ঘোরাচ্ছে।

গ্রেনেডটা যেন অলস ডানায় ভর দিয়ে অসহ্য রকম সময় নিয়ে উড়ে এল। ট্র্যাফিক পুলিসের মত একটা হাত লম্বা করল রানা, তালু খাড়া হয়ে আছে জানালার মুখে, যেন কাউকে থামতে ইঙ্গিত করছে। সরাসরি ওই তালুতে এসে লাগল কালো ও মোটা ক্ষীরা আকৃতির গ্রেনেড, হাতের ধাক্কা খেয়ে পড়ল বাঁক নিতে থাকা ট্রাকের পাশে।

বিস্ফোরণের শব্দ হলো আরও পাঁচ সেকেন্ড পর। ক্যাব রক্ষা পেয়েছে, তার সঙ্গে বেঁচে গেছে রানা ও ফারাহ, তবে কপাল পুড়েছে সাত টনী ট্রাকের।

তীব্র একটা ঝাঁকি খেলো ওরা, রানার অনুভূতি হলো ওদেরকে নিয়ে শূন্যে পাড়ি জমিয়েছে ট্রাক। তারপর হুইলের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল ও, চোখের কোণ দিয়ে দেখল উইন্ডস্ক্রীন না থাকায় ফাঁকটা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে ফারাহ। হাত বাড়িয়ে খপ করে তাকে ধরে ফেলল।

ক্যাব মাটিতে নাক ঠেকাতে চাইছে, পিছনটা উঠে পড়ছে শূন্যে। ফড় ফড় করে ছিঁড়ে গেল ফারাহর শার্ট, সামনের ফাঁকটা গলে বেরিয়ে গেল সে।

মুঠোয় শুধু ছেঁড়া শার্ট, সেটা ফেলে দিয়ে আবার হাত বাড়াল

রানা। ড্যাশবোর্ডের কিনারা ধরে ট্রাকের নাকে ঝুলছে ফারাহ, তার চুলের গোছা ধরে টান দিল ও। আর ঠিক সেই সময় সিধে হতে শুরু করল ক্যাব, পিছনটা ফিরে আসছে মাটিতে।

আরেকবার প্রচণ্ড ঝাঁকি খেলো রানা, প্রায় উড়ে এসে ওর গায়ে পড়ল ফারাহ।

মেয়েটি যুবতী, বিবস্ত্র ও কোমল; কিন্তু আপত্তিকর কোন অনুভূতিই হলো না রানার। মাতলামি শুরু করলেও, বিস্ময়কর ব্যাপার হলো মাটিতে চাকা পড়ার পর আবার পূর্ণগতিতে ছুটতে শুরু করেছে ট্রাক। ফারাহকে যে কোল থেকে নামিয়ে দেবে, তার কোন সুযোগই পেল না রানা, দু'হাতে হুইল ধরে সামনের ছুটন্ত তিনজন গার্ডকে ধাওয়া করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

চাকার নিচে চাপা পড়ল একজন, একজন ধাক্কা খেয়ে ছিটকে দূরে সরে গেল, আতঙ্কিত শেষ লোকটাকে দেখা গেল ছুটে নিরাপদ দূরত্বে সরে যাবার পরও থামছে না।

ট্রাকের স্পীড আগের চেয়ে বেশি, যেন ওর হিসাবের চেয়েও জোরে ছুটতে চাইছে। ক্যাবের পিছনের দেয়ালে ছোট্ট একটা জানালা আছে, সেটার কবাট সরিয়ে ট্রাকের পিছন দিকে তাকাল রানা।

দৃশ্যটা দেখে হকচকিয়ে গেল ও। ট্রাক অর্ধেকের বেশি খালি হয়ে গেছে, সিমেন্টের ব্যাগগুলো নেই। থাকবে কিভাবে, দ্বিতীয় গ্রেনেডটা আসলে ট্রাকের অর্ধেক মেঝেই উড়িয়ে দিয়েছে। পিছনের দুটো চাকা এখন সম্পূর্ণ নগ্ন, ওগুলোর ওপর কোন আচ্ছাদন নেই।

গার্ডরা ঘাতক ট্রাকের ধাওয়া খেয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। আহত সঙ্গীদের সরিয়ে নিতেও কিছুক্ষণ ব্যস্ত থাকতে হবে তাদেরকে।

হাতে খানিকটা সময় পেয়ে চিন্তা করতে পারছে রানা। ফারাহ নড়ে উঠতেই হুইল থেকে হাত সরিয়ে তাকে পাশের সীটে চলে যাবার সুযোগ করে দিল। মেয়েটা ফোঁপাচ্ছে শুনেও তাকাল না, শুধু গায়ের জ্যাকেট খুলে ধরিয়ে দিল হাতে।

জ্যাকেটটা পরছে ফারাহ, নিচের দিকটা গুঁজে দিল বেল্টে। রুদ্ধস্বরে জানতে চাইল, 'এই সুযোগে বোটটা খোঁজা উচিত না?'

'আলোটা দেখছ?' ইঙ্গিতে সামনেটা দেখাল রানা। 'আমরা যখন বিল্ডিংটা থেকে বেরুলাম তখন তো এই আলো দেখিনি।'

'তাই তো!'

কয়েকটা ঝোপ-ঝাড়কে পিছনে ফেলে এল ওরা। ওদের সেই ভাঙা বিল্ডিংটা দেখা গেল। ওটার ডান পাশে জ্বলছে আলোটা। মাটির ওপর কোথাও নয়, উঠে আসছে মাটির নিচে থেকে।

'ও, বুঝেছি!' বলল ফারাহ। 'ওদিকে...'

রানাও ব্যাপারটা ধরতে পারল। আলোটা উঠে আসছে ব্ল্যাকহোলের নির্মাণাধীন দ্বিতীয় হোটেল কমপ্লেক্স থেকে। আলোর রেখা বিশাল গহ্বরটাকে স্পষ্ট করে তুলেছে। 'কিন্তু আলো জ্বালার মানে কি? কি হচ্ছে ওখানে?' বিল্ডিংটাকে পাশ কাটাচ্ছে ট্রাক, আপনমনে বিড়বিড় করল রানা।

বিল্ডিংটাকে পিছনে ফেলল ওরা, সামনে গহ্বর আর গহ্বর থেকে উঠে আসা উজ্জ্বল আলো দেখা যাচ্ছে। স্পীড কমাতে যাবে রানা, বেশ খানিকটা পিছন থেকে দুটো রাইফেল গর্জে উঠল। ক্যাব থেকে মাথা বের করে পিছন দিকে একবার তাকাল ফারাহ। 'সর্বনাশ! ওরাও ট্রাক নিয়ে আসছে!'

এখন আর মাথার চুল ছিঁড়েও কোন লাভ নেই, বোকামি যা করার করা হয়ে গেছে। সামনে ভিত, অর্থাৎ প্রকাণ্ড গর্ত; দু'পাশে মাটির স্তূপ, পাহাড় বললেই হয়। 'ট্রাকে ওরা ক'জন?' জানতে

চাইল রানা।

'অনেক দূরে, কি করে বলি!'

গহ্বরের কিনারায় ট্রাক থামাল রানা, ঠিক সামনে থেকেই গর্তের নিচে নেমে গেছে ঢাল। তলাটা ঢাকা স্টেডিয়ামের প্রায় অর্ধেক হবে, তার অর্ধেকটা জুড়ে খানিক পর পর দাঁড়িয়ে আছে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ ফুট লম্বা কংক্রিট কলাম, একেকটা এত মোটা যে বেড় দিয়ে ধরতে চাইলে দু'জন মানুষ লাগবে। সব মিলিয়ে ওই রকম ষাট-সত্তরটা পিলার দেখা যাচ্ছে। তবে রানার দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছে একটা মোবাইল ফ্লাডলাইট আর দু'জন গার্ড। গর্তের মেঝের অর্ধেকটা পিলারের দখলে থাকলেও, বাকি অর্ধেক একদম খালি, নরম লালচে মাটি ছাড়া আর কিছু নেই। সেই মাটিতে একটা লম্বা কবর দেখা যাচ্ছে। একজন গার্ড স্ট্যান্ডসহ ফ্লাডলাইটটা ধরে আছে, অপর লোকটা সদ্য মাটি চাপা দেয়া কবরে ইঁট বা পাথর বসাচ্ছে। রানা আন্দাজ করল, ওটা পলি ও সাযযাদের কবর, শেয়াল নষ্ট করায় নতুন করে মাটি ফেলা হয়েছে।

নিচ থেকে মুখ তুলে ট্রাকটার দিকে তাকাল গার্ড দু'জন। দ্বিতীয় লোকটা ঝট করে রাইফেলের দিকে হাত বাড়াল।

'লাফ দাও নিচে!' হিস হিস করে বলল রানা। 'যেভাবে পারো বাঁচার চেষ্টা করো!'

'আমি একা?' আতঙ্কে বিকৃত শোনাল ফারাহর গলা। 'তোমার কি হবে? তাছাড়া একা আমি কিভাবে পালাব?'

ট্রাকটা আগুপিছু করে খানিকটা আড়াআড়ি ভঙ্গিতে দাঁড় করাল রানা। 'এবার তুমি আড়াল পাবে, গর্তটার কিনারা ধরে হামাগুড়ি দাও, কয়েকটা মাটির ঢিবি পার হতে পারলে জঙ্গলে গা ঢাকা দিতে পারবে। আমার জন্যে অপেক্ষা কোরো না, বোটটা খুঁজে

পেলে একাই ফিরে যেয়ো।’

পিছন থেকে এঞ্জিনের আওয়াজ ভেসে আসছে, সেটাকে চাপা দিয়ে গর্তের নিচে গর্জে উঠল একটা রাইফেল। ফারাহ্ ইতস্তত করছে দেখে ক্যাবের দরজা খুলে তাকে বাইরের দিকে ঠেলে দিল রানা। ‘আমার জন্যে বোট হাউসে অপেক্ষা কোরো তুমি।’

একবার ফুঁপিয়ে উঠে ক্যাব থেকে নেমে গেল ফারাহ্। গর্তের কিনারা ঘেঁষে হামাগুড়ি দিচ্ছে সে। ক্যাবের ছোট্ট জানালা দিয়ে পিছন দিকে তাকাল রানা। পিছনের ট্রাকটা স্পীড কমিয়ে হেলেদুলে এগিয়ে আসছে। ক্যাবের পিছনে চার কি পাঁচটা কালো মাথা দেখতে পেল রানা, ছাদে ফেলা রাইফেলের ট্রিগারে আঙুল পেঁচিয়ে রেখেছে বলে মনে হলো।

স্ক্রীনবিহীন উইন্ডো দিয়ে সামনে, অর্থাৎ গর্তের নিচে তাকাল রানা। মাত্র একটা গুলি করার পর দ্বিতীয় লোকটা স্থির হয়ে গেছে, কান পাতার ভঙ্গিতে কিছু শোনার চেষ্টা করছে। ফ্লাডলাইটটা কবরের দিকে তাক করা ছিল, প্রথম লোকটা সেটা ঘুরিয়ে গহ্বরের মাথায় দাঁড়ানো রানার ট্রাকের দিকে উঁচু করল।

মৃত্যুর মুখোমুখি আগেও বহুবার দাঁড়িয়েছে রানা। ভাগ্য বিরূপ হয়ে উঠলে ও টের পায়। তখন ক্ষোভ বা অভিমানকে প্রশ্রয় দেয় না, হয়ে ওঠে ঠাণ্ডা ও নির্লিপ্ত, তবে মনের গভীরে হতাশ না হবার একটা জেদকে সযত্নে লালন করে। আজও তার ব্যতিক্রম ঘটল না।

খুন করার জন্যে সরাসরি গুলি চালাচ্ছে, এমন একদল লোকের সঙ্গে নিরস্ত্র ও কোণঠাসা অবস্থায় কেউই বেশিক্ষণ টিকে থাকতে পারে না। নিজেকে মিথ্যে কোন আশ্বাস না দিয়ে আবার ট্রাক ছাড়ল রানা। কপালের লিখন মেনে নিয়েছে ও, তবে একা মরতে রাজি নয়।

গভীর খাদের কিনারা থেকে ট্রাকটাকে নেমে আসতে দেখে গার্ড দু'জন যেন সম্মোহিত হয়ে পড়ল। তিন সেকেন্ড এক চুল নড়ল না তারা। ট্রাকের গতি প্রতি মুহূর্তে বাড়ছে, ঢালের চারভাগের এক ভাগ এরই মধ্যে পেরিয়ে এসেছে ওটা। তারপর একযোগে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল দু'জনের শরীরে। রাইফেল ও ফ্লাডলাইট ফেলে ঘুরল ওরা, প্রকাণ্ড পিলারগুলোর দিকে ছুটছে।

রানা এই মুহূর্তে নির্মম। শুধু অনধিকার প্রবেশের অপরাধে যারা খুন করার জন্যে গুলি চালায়, যারা নিরপরাধ মানুষকে ধরে এনে জ্যান্ত কবর দেয়, তাদেরকে ঠাণ্ডা মাথায় দুনিয়া থেকে বিদায় করার দায়িত্ব নিতেও ওর আপত্তি নেই। প্রয়োজনে এ-ধরনের কঠিন দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতে পারবে ও, এ-কথা জেনেই বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স পেশাদার এসপিওনাজ এজেন্ট হিসেবে নিয়োগ পত্র দিয়েছে ওকে।

পিলারগুলোর কাছে পৌঁছানো যাবে না, তার আগেই ট্রাক গায়ে উঠে আসবে, বুঝতে পেরে দ্বিতীয় লোকটা মরিয়া হয়ে রুখে দাঁড়াল। আতঙ্কিত হয়ে পড়ায় রাইফেলটা ফেলে এসেছে ঠিকই, কিন্তু মৃত্যু নিশ্চিত বুঝতে পেরে পিস্তলটা বের করার কথা মনে এলো ওর। হোলস্টারে হাত, ঘুরে দাঁড়াল, পরমুহূর্তে বিস্ফারিত হয়ে গেল চোখ। হায়, ট্রাক তো এসে পড়েছে!

ঝাঁকিটা অনুভব করল রানা, মটমট করে দু'তিনটে হাড় ভাঙার শব্দ ঢুকল কানে, পটকার মত আওয়াজটা সম্ভবত খুলি ফাটার। ট্রাকের স্পীড এত বেশি, রানার বলতে গেলে কোন নিয়ন্ত্রণই নেই। তবে হুইল ঘোরাতে কথা শুনল যন্ত্র দানব, অনুগত ভৃত্যের মত ঘুরে গেল প্রথম লোকটার দিকে।

আবার সেই একই অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি। সামান্য একটা ঝাঁকি, হাড় ভাঙার শব্দ, মরণ চিৎকার। তারপর ব্রেক অ্যাপ্লাই

করল রানা–ধীরে ধীরে, সাবধানে। আরও প্রায় পঁচিশ গজ ছোটার পর, পিলারগুলোর কাছাকাছি দাঁড়িয়ে পড়ল ট্রাক। ক্যাব থেকে সঙ্গে সঙ্গে নেমে পড়ল, ইচ্ছা, ফিরে গিয়ে অন্তত পিস্তলটা তুলবে।

হাঁটছে, সেই সঙ্গে চোখ বোলাচ্ছে খাদের মাথায়। হাঁটার গতি কমতে শুরু করল। দ্বিতীয় ট্রাকটা গহ্বরের কিনারায় দাঁড়িয়ে আছে, ঠিক যেখানে নিজের ট্রাক নিয়ে ও দাঁড়িয়েছিল। ট্রাকের সামনে দু'জন গার্ড, হাতের রাইফেল ওর দিকে তাক করা। হেডলাইটের আলোয় তাদেরকে পরিষ্কারই দেখতে পাচ্ছে রানা। বাকি সবাই ছায়ামূর্তি। হাঁটার গতি আরও কমে এল ওর। খাদের চারদিকের মাথাতেই দেখা যাচ্ছে ওদের। দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। ঘিরে ফেলা হয়েছে ওকে। পিস্তলটা এখনও অনেকটা দূরে। তাছাড়া, ওটা পেলেও এখন কোন কাজে আসবে না।

গহ্বরের চার মাথা থেকে নেমে আসছে ওরা। প্রত্যেকের হাতের রাইফেল ওর দিকে তাক করা।

সামনের দিক থেকে আসছে পাঁচজন। তাদের একজন হ্যান্ডমাইকে কথা বলল, 'মিস ফারাহ! মি. জুসাইওর সঙ্গে এইমাত্র আমার কথা হয়েছে। তোমাকে তিনি ধরা দিতে বলেছেন। বলেছেন, তোমার ব্যাপারটা বিবেচনা করা হবে। মাথার ওপর হাত তুলে বেরিয়ে এসো।'

রানা এখন আর নিজের কথা ভাবছে না। ভাবছে মেয়েটার কথা। ফারাহ কি হ্যান্ডমাইকের ঘোষণা শুনতে পাচ্ছে? বোকার মত ওদের ফাঁদে পা দেবে না তো? এখন যদি আড়াল থেকে বেরিয়ে খাদে নেমে আসে ফারাহ, রানার দুঃখটা হবে আন্তরিক। কি তার ভূমিকা, কি তার উদ্দেশ্য, এ-সব এই মুহূর্তে কোন গুরুত্ব বহন করে না। রানা চায় বেঁচে থাকুক সে।

খাদে নেমে রানাকে ওরা ছেঁকে ধরল।

ফ্লাডলাইটটা এখনও জ্বলছে, রানার দিকে ঘুরিয়ে দিল ওরা। খাদের কিনারায় দাঁড়ানো ট্রাকের হেডলাইটও নিচের দিকে তাক করা।

'মিস ফারাহ...' আবার শুরু হলো একঘেয়ে ঘোষণা।

গুনল রানা। মোট তেরোজন গার্ড। দু'জন এগিয়ে এল। সাবধানে আসছে, নিরস্ত্র ও নিঃসঙ্গ রানাকে যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। বাকি সবাই ওর চারধারে দাঁড়িয়ে রাইফেল তাক করে রেখেছে।

লোক দু'জন ওকে দ্রুত সার্চ করল। তারপর পিছিয়ে গিয়ে মাথা নাড়ল। ঘোষণা শেষ করে মুখের সামনে থেকে হ্যান্ডমাইক নামাল ওদের লীডার। দু'পা এগিয়ে এসে রানাকে বলল, 'আমাদের বস্ নির্দেশ দিয়েছেন, জ্যান্ত কবর দিতে হবে তোমাকে। গত হপ্তায়ও তোমার মত এক বদমাশকে এভাবে পোঁতা হয়েছে।'

রানা বলল, 'তোমাদের বস্? কে সে? গত হপ্তায় কাকে কবর দিয়েছ তোমরা?' ওর বুকটা মোচড় দিয়ে উঠল। লোকটা নিশ্চয়ই সাযযাদের কথা বলছে।

'মি. সেল সি সা জুসাইও,' জবাব দিল লোকটা। 'তিনি আরও বলেছেন, কবরটা তোমাকেই খুঁড়তে হবে। খোঁড়ার পর কবরে নেমে শোবে তুমি। আমরা শুধু মাটি ভরাট করব। কাকে কবর দেয়া হয়েছে তা জেনে তোমার কোন লাভ নেই। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত গোটা ব্যাপারটা ভিডিও ক্যামেরায় ধারণ করব আমরা।'

'কেন?'

রানার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে নিজের লোকদের নির্দেশ দিল লীডার। দু'জন লোক ছুটল কোদাল, শাবল আর ভিডিও ক্যামেরা

আনতে। লীডার আবার রানার দিকে ফিরল। 'ফারাহকে তুমি ট্রাক থেকে কোথায় নামিয়েছ?'

রানা জবাব দিল, 'সে এতক্ষণে বোট নিয়ে ভার্জিনে ফিরে গেছে।'

রানাকে আশ্বস্ত করার সুরে গার্ডদের লীডার বলল, 'বস্ ওকে মারবেন না। মানে এখন মারবেন না আর কি!' হাসছে সে। 'বললেন, কাজ ফুরালে ন্যাংটো করে অ্যাসিড ভরা গামলায় চুবিয়ে গোসল করাবেন।'

'তার অপরাধটা কি?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'তার বা আমার?'

জবাব না দিয়ে পকেট থেকে একটা মোবাইল ফোন বের করল লীডার। 'মি. উন? বসকে জানান, ফারাহ পালিয়েছে। লেগুন, বোটহাউস আর জেটির ওপর নজর রাখতে হবে।...হ্যাঁ, মি. ডেভেনপোর্টের মেহমান বড়ুয়া ধরা পড়েছে...হ্যাঁ, কোদাল আর ভিডিও ক্যামেরা আনতে পাঠিয়েছি...ভেরি গুড।'

'তোমার বস্ কি পাগল?' বলল রানা, 'আমাকে খুন করে তার লাভ কি? বরং বাঁচিয়ে রাখলে ভারতীয় একশো কোটি টাকার জিনিস কিনতাম...'

'বস্ বললেন, ক্রেতার তালিকা থেকে তোমার নাম কেটে দেয়া হয়েছে,' বলল লোকটা। 'সাপ্লাই নেই।'

'সাপ্লাই নেই মানে?'

'তুমি যে জিনিস কিনতে চাও তা শেষ হয়ে গেছে। তোমাকে যেগুলো দেবার কথা ভাবা হয়েছিল সেগুলো সাতটা পার্টি নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে কিনে নিয়েছে। এগুলো তাদের প্রয়োজনের চেয়ে অতিরিক্ত, তাই শর্তসাপেক্ষে কিনতে রাজি হয়েছে।'

'কি শর্তে?'

‘তোমাকে ব্ল্যাকহোলে কবর দিতে হবে।’

‘কেন? এরকম অদ্ভুত শর্তের কারণ?’ একটা ঢোক গিলল রানা।

‘বসকে ওরা বলেছে, তুমি সন্দেহজনক চরিত্র। তোমাকে বাঁচিয়ে রাখলে তাদের ক্ষতি হয়ে যেতে পারে।’

‘ওরা মানে কারা?’

‘ঝিং থাপা, নেপালি পার্টি; আমান মোহাম্মদ, পূর্ব-পাকিস্তানী পার্টি...’

‘পূর্ব-পাকিস্তান? মানে?’

‘মানে জানি না, পার্টিরা নিজেদের যে পরিচয় দিয়েছে আমি সেটাই শুধু উল্লেখ করছি।’

কোদাল আর শাবল ট্রাকে থাকতে পারে, কিন্তু ভিডিও ক্যামেরা নিশ্চয়ই কোন বিল্ডিং থেকে আনতে হবে, সেজন্যে লোক দু’জনের ফিরে আসতে দেরি হচ্ছে। খানিকটা হলেও সময় পাওয়া গেছে, কিন্তু রানার মাথায় বাঁচার কোন বুদ্ধি আসছে না।

লীডার লোকটা রানার কথা পুরোপুরি বিশ্বাস করেনি, মুখের সামনে হ্যান্ডমাইক তুলে আবার ফারাহকে ধরা দিতে বলল। সে থামতে রানা জিজ্ঞেস করল, ‘মেরেই যখন ফেলবে, আমার অন্তত একটা প্রশ্নের জবাব দাও। কি এমন সাতরাজার ধন আছে ব্ল্যাকহোলে যে এত কড়া পাহারা?’

হেসে উঠে লীডার বলল, ‘সাতরাজার ধনই আছে, আছেও তোমার চোখের সামনে, কিন্তু যার দেখার চোখ নেই সে কিভাবে...’ হঠাৎ চমকে উঠল সে, রানার দিকে একটু পাশ ফিরে মুখ তুলল–তাকাল খাদের মাথায়, যেখানে ট্রাকটা দাঁড়িয়ে।

জোড়া হেডলাইটের সামনে নগ্ন একটা নারীমূর্তি, ঢাল বেয়ে ধীর পায়ে নামতে শুরু করল। লজ্জা ঢাকার ভঙ্গীটা ক্লাসিক–একটা

হাত আড়াআড়ি ভাবে বুকে, আরেকটা হাত নাভীর নিচে।

ফারাহকে চিনতে পেরে রানার শরীর ঠাণ্ডা হিম হয়ে গেল। নিজের অজান্তেই অকস্মাৎ চিৎকার করে উঠল ও, 'ফারাহ, পালাও!'

আঘাতটা এল পিছন থেকে, রাইফেলের বাঁট দিয়ে মাথার পিছনে মারল কেউ। দড়াম করে পড়ে গেল রানা। চোখে সর্ষে ফুল দেখলেও জ্ঞান হারায়নি। উঠে বসার চেষ্টা করছে, ছুটে এসে বুট দিয়ে লাথি মারল একজন। রক্তে ভরে উঠল নাকের ফুটো। মাটিতে শুয়েই দেখতে পেল ধীরে ধীরে খাদের তলায় নেমে আসছে ফারাহ।

'সাবধান! কেউ নড়বে না!' বলল লীডার। 'ভয় পেলে পালাবে আবার!'

খাদের তলায় নেমে ওদের দিকে এগিয়ে আসছে ফারাহ। এখন তার কান্না আর ফোঁপানোর আওয়াজ পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে ওরা।

'কি যেন বলছে শালী!' ফিসফিস করল একজন গার্ড।

দশ-বারো হাত দূরে থামল ফারাহ। সবাই ওরা তার কথা শুনতে পেল। 'ওর তো কোন দোষ নেই, শুধু শুধু ওকে তোমরা মারছ কেন? আমি জানি তোমাদের কাছে টেলিফোন আছে, মি. জুসাইওর সঙ্গে আমাকে একবার কথা বলতে দাও, প্লীজ!'

কষ্টেসৃষ্টে এবার রানা দাঁড়াতে পারল, সামনে নগ্ন নারীমূর্তি থাকায় ওর দিকে তেমন খেয়াল দিচ্ছে না গার্ডরা।

'বস্ নির্দেশ দিয়েছেন, বড়ুয়া শালাকে জ্যান্ত কবর দিতে হবে,' ফারাহকে বলল লীডার। 'তোমাকে বসের দরকার, তাই হালকা কিছু সাজা দিয়ে এবারের মত রেহাই দেয়া হবে।'

'জ্যান্ত কবর দিতে হবে!' ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল ফারাহ। 'কিন্তু

কেন? সব দোষ তো আমার, কারণ আমিই ওকে এখানে নিয়ে এসেছি। কবর দিতে হলে আমাকে কবর দাও!' তার গলার স্বর থেকে কাতর মিনতি ঝরে পড়ছে। দু'পা সামনে বাড়ল। 'তোমাদের যে-কোন আবদার রক্ষা করব আমি, শুধু অনুরোধ, নিরীহ একটা মানুষকে অকারণে খুন কোরো না। যদি বলো...'

'চিন্তা করে দেখো, ওস্তাদ!' জিভ দিয়ে ঠোঁট চেটে বলল একজন গার্ড। 'বলছে, যে-কোন আবদার রক্ষা করবে!'

আরেকজন গার্ড সমর্থন করল তাকে। 'মালটা তো শালী সত্যি খাসা!'

'মি. জুসাইওর সঙ্গে আমাকে কথা বলতে দাও, প্লীজ!' ঠিক সোজা নয়, তির্যক একটা রেখা ধরে আরও দু'তিন পা এগোল ফারাহ। ফলে রানা আর তার মাঝখানের জায়গাটা ফাঁকা এখন, গার্ডরা রয়েছে একপাশে।

মোবাইল ফোনটা আবার বের করল গার্ডদের লীডার। 'মি. উন? বসকে বলুন মেয়েটা ধরা পড়েছে। আরেকটা কথা, স্যার।' গার্ডরা তার কথা ভাল করে শোনার জন্যে কাছে সরে এল। 'আমার লোকজন বলছে, মেয়েটাকে নিয়ে ওরা একটু ফুর্তি করতে চায়...না, মানে, মেয়েটা নিজেই বলছে সে রাজি...' ফোনটা আরও কিছুক্ষণ কানে ধরে রাখল সে, তারপর নামাল। মাথা নেড়ে বলল, 'কাজ হলো না! মি. উন বললেন, বসকে এ-কথা বলাই যাবে না।'

'ফোনটা আমাকে দাও, প্লীজ!' বলল ফারাহ। 'আমি মি. জুসাইওকে রাজি করাতে পারব।'

'মি. উন বললেন, যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তার কোন নড়চড় হবে না।'

'ফাটল কিন্তু!' বলল ফারাহ, সরাসরি রানার দিকে তাকিয়ে

আছে। কথাটা বলেই ডান হাত বাম বগলে তুলল, বাম হাত উঠে এল ডান বগলে।

কি ঘটতে যাচ্ছে বুঝতে পেরে দম বন্ধ করল রানা।

বগলে লুকিয়ে রাখা মার্বেল দুটো এখন ফারাহর হাতে। গার্ডরা কেউ নড়ে ওঠার আগেই মাটিতে আছাড় মেরে ফাটাল ওগুলো। সাদা, ঝাঁঝাল ধোঁয়া এক পলকেই ঢেকে ফেলল চারদিক। শক্তিশালী নার্ভ গ্যাস, কেউ টুঁ-শব্দ করার সময় পর্যন্ত পেল না, যে যেখানে ছিল সেখানেই জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল। লীডারের হাত থেকে রাইফেলটা কেড়ে নেয়া হলো, কিন্তু সে কিছু টেরই পেল না।

দু'জনেই ওরা দম আটকে রেখে ছিটকে বেরিয়ে এসেছে ধোঁয়ার ভেতর থেকে, এই মুহূর্তে ফারাহর হাত ধরে ছুটছে রানা। পিলারগুলোকে পিছনে ফেলে এল ওরা, ট্রাকের হেডলাইট আর ফ্লাডলাইটের আভাও এখন ওদের নাগাল পাচ্ছে না।

সামনে অন্ধকার ঢাল পড়ল। খানিকটা উঠেই হাঁপাতে লাগল ফারাহ। বিশ্রাম নেয়ার জন্যে থামতে চাইছে সে। কোন কথা হলো না, ফারাহ এমনকি প্রতিবাদও করল না, দু'হাতে ধরে নিজের কাঁধে তুলে নিল রানা তাকে। রাইফেলটা এখন ফারাহর হাতে।

স্বাস্থ্যবান, বলিষ্ঠ পুরুষ রানা; কাঁধে ফারাহকে নিয়ে প্রায় অনায়াসে ঢাল বেয়ে উঠে যাচ্ছে। মনটা ছেয়ে আছে কৃতজ্ঞতায়, বোঝাটাকে বোঝা বলে মনেই হচ্ছে না।

আশ্চর্য এক আরাম আর পরম এক তৃপ্তিতে চোখ বুজল ফারাহ। তার অনুভূতি হলো, সে যেন প্রাগৈতিহাসিক যুগে ফিরে গেছে। যুবতী এক নারী সে, পূর্ণযৌবনা, তাকে বিপদের মুখ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ভালবাসার পাত্র, কোনও এক আদিম বীরপুরুষ।

নয়

চারদিক অন্ধকার, ঝোপ-ঝাড় ভেঙে কোনদিকে যাচ্ছে নিজেরাও জানে না ওরা। ঢালের মাথায় ওঠার পর রানার কাঁধ থেকে নেমে পড়েছে ফারাহ, তাও দশ মিনিট পার হয়ে গেছে।

আকাশের গায়ে গাঢ় একটা ছায়া ফুটে আছে, দেখে চিনতে পারল ফারাহ। 'ভার্জিন থেকেও দেখা যায় ওটা,' বলল সে। 'ওভারহেড ট্যাংক। সৈকত সম্ভবত বাঁ দিকে।'

বাঁ দিকে ঘুরে গেল ওরা। খানিক পরই সামনে, ঝোপ আর গাছপালার ফাঁকে আলোর আভা চোখে পড়ল। 'সাবধান!' ফিসফিস করল রানা। এখন আর ছুটছে না ওরা, সাবধানে পা ফেলে হাঁটছে।

দূর থেকেই দেখা গেল শেডটা। গ্যালভানাইজড-মেটাল দিয়ে তৈরি। শেডের মুখে গেট আছে, ভেতরটা এত বড় যে শেষ মাথা দেখা যায় না। ভেতরে কিছু বস্তা, কিছু ফার্নিচার দেখা গেল। দেয়ালে দেয়ালে টিউব লাইট জ্বলছে। কিন্তু লোক বলতে মাত্র একজন। লোহার গ্রিল দেয়া গেট, গেটের ভেতর কংক্রিটের তৈরি গার্ডরুম, তার ভেতর রাইফেল হাতে বসে আছে সে। নাক না চুলকালে লোকটাকে পাথরের মূর্তি বলে চালিয়ে দেয়া যেত। 'শেডের ভেতর কি আছে, জানো?'

'জানি না, তবে আন্দাজ করতে পারছি,' বলল ফারাহ।

‘শুনেছি একটা শেডের ভেতর থেকে আন্ডারগ্রাউন্ড টানেলে নামতে হয়, এটাই বোধহয় সেই শেড।’

‘বোটটা যদি ওরা ডুবিয়ে দিয়ে থাকে তাহলে এই শেড আর টানেল হয়েই ভার্জিনে ফিরতে হবে তোমাকে।’

‘আমি একা ফিরব? তুমি?’

‘আমার কি ফেরার উপায় আছে?’

‘আমি যদি তোমাকে লুকিয়ে রাখতে পারি? তবে এ প্রসঙ্গ এখন থাক, আগে চলো বোটটা খুঁজি।’

শেডটাকে দূরে রেখেই সৈকতের দিকে এগোল ওরা। গার্ডরা কোনদিকে ব্যস্ত বোঝা যাচ্ছে না, তবে এদিকটায় তারা আসছে না।

সৈকতে পৌঁছেও বোটটাকে ওরা খুঁজে পেল না। ফারাহ বলল, ‘দেখতে পেয়ে ওরা বোধহয় সরিয়ে নিয়ে গেছে। এখন আমি পরব কি! এতক্ষণ ভাবিছলাম বোটে পৌঁছাতে পারলে লকারে নিশ্চয়ই কিছু কাপড়চোপড় পাব...’

কৌতুক করার লোভটা রানা ছাড়তে পারল না। ‘যেমন আছ তেমনি থাকতে কি তোমার খুব অসুবিধে হচ্ছে? আমার তো ভালই লাগছে দেখতে।’

দুম-দুম করে রানার বুকে পাঁচ-সাতটা ঘুসি মারল ফারাহ। ‘অসভ্যতা করলে ভাল হবে না কিন্তু!’

ফারাহর হাতটা ধরে ফেলল রানা। ‘এই, চুপ!’

দু’জনেই কান পাতল ওরা। সৈকতের আরও খানিক সামনে থেকে ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দ ভেসে এল। নিস্তব্ধতা ভাঙল ফারাহ। ‘সন্দেহ নেই, ডাকছে আমাদের।’

‘ডাকছে মানে?’

‘আমি অনেকগুলো ভাষা জানি,’ রানার কানে ফিসফিস করল

ফারাহ। ‘সত্যি কথা বলতে কি, এতগুলো ভাষার ওপর দখল থাকার কারণেই ওদের কাছে আমার এত গুরুত্ব।’

‘যদিও ব্যথা পেলে মানুষ মাতৃভাষাতেই কাতরায়,’ বলল রানা। ‘কাঁদেও নিজের ভাষায়।’

‘ব্যাপারটাকে অভ্যাস না বলে ঐতিহ্য বলাই বোধহয় ঠিক হবে।’ রানার কাঁধে হাত রেখে হেসে উঠল ফারাহ। ‘আমার মাতৃভাষা কিন্তু বাংলা নয়, যেহেতু মা বাঙালী ছিলেন না। তবে বাবার কাছে তো বাংলা শিখেছিই, শান্তিনিকেতনে লেখাপড়াও করেছি, সেই সূত্রে আমার প্রথম ভাষা বলা যায় বাংলাই...’

চট্ করে রানার মনে পড়ে গেল, গার্ডস করপরেশন-এর প্রধান বিজ্ঞানী ও ট্রিপলহেডার-এর ডিজাইনার সৈয়দ মনিরুল হকের একমাত্র সন্তান শান্তিনিকেতনে লেখাপড়া করে। এই তথ্য ইন্টারনেটের মাধ্যমে দি টাইমস-এর ওঅর করিসপন্ডেন্ট জন রবসন জানিয়েছিল ওকে। ‘তুমিই তাহলে সৈয়দা শিরি হক! বিজ্ঞানী মনিরুল হকের মেয়ে।’

শিরি হতভম্ব, দশ সেকেন্ড কোন কথাই বলতে পারল না। চাঁদের আলোয় তন্নতন্ন করে কি যেন খুঁজছে রানার মুখে। ভাষা ফিরে পেয়ে রানার কাঁধে নখ ঢুকিয়ে দিল। ‘তুমি কে? এ-কথা তুমি কি করে জানলে?’

‘আমি মাসুদ রানা। তোমার পিতৃভূমির একজন নগণ্য সেবক। আমাকে পাঠানো হয়েছে। বেঈমান আমান মোহাম্মদের পিছু নিয়ে লেটিসে এসেছি।’

‘আমি ভেবেছিলাম,’ বড় করে নিঃশ্বাস ফেলল শিরি, ‘তুমি সম্ভবত সিআইএ বা এফবিআই।’

মাথা নাড়ল রানা। ‘আমি বাংলাদেশী। তোমার বাবা একটা বিপদসঙ্কেত পাঠিয়েছিলেন আমার বসের কাছে। যাকে খোঁজ

নিতে পাঠানো হয়েছিল, তার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে এসেছি আমি।'

'মাসুদ রানা,' ধীরে ধীরে উচ্চারণ করল শিরি। 'জানি না কেউ কখনও বলেছে কিনা—নামটার মধ্যে কেমন যেন একটা পুরুষ-পুরুষ ভাব আছে। না, ঠিক বোঝাতে পারলাম না। মাসুদ রানা। নিরেট, ভরাট, শাঁসসমৃদ্ধ, গম্ভীর, উঁচু তারে বাঁধা, অভিজাত...' খিলখিল করে হেসে উঠল। 'নাহ্, দুঃখিত, তোমার নামের মাহাত্ম্য বর্ণনা করার সাধ্য আমার নেই। লেটিসে তুমি কেন এসেছ? বাবাকে উদ্ধার করতে?'

'যদি তিনি এখানে থাকেন।'

'তুমি জানো না?'

এক সেকেন্ড চিন্তা করে রানা বলল, 'তোমার বোট তোমাকে ডাকছে। আগে নিরাপদ কোথাও সরে যাই চলো, তারপর কথা হবে।'

'এসো,' রানার হাত ধরে টানল শিরি।

সামনের সৈকত ধনুকের মত বাঁকা হয়ে গেছে। জায়গাটা পার হয়ে আসতেই বোটটা দেখতে পেল ওরা, খোলের তলা বালির সঙ্গে ঘষা খাচ্ছে।

বোটে নোঙর তোলার পর রানা বলল, 'স্টার্ট না দিয়েই ব্ল্যাকহোল থেকে যতটা সম্ভব দূরে সরে যেতে চাই। তারপর, তোমার সব কথা শুনে সিদ্ধান্ত নেব ভার্জিনে আমি ফিরব কিনা।'

ইতিমধ্যে লকার থেকে এক প্রস্থ প্যান্ট-শার্ট বের করে পরে নিয়েছে শিরি। 'লেটিস থেকে পালানো সম্ভব নয়,' বলল সে। 'রাতদিন চব্বিশ ঘণ্টা হেলিকপ্টার আর হাইড্রোফয়েল নিয়ে টহল দিচ্ছে ওরা সাগরে।'

'কথাটা আমাকে ক্যারলিনও বলেছে, কিন্তু সাগরে কোন হাইড্রোফয়েল বা আকাশে কোন কপ্টারকে আমি টহল দিতে

দেখিনি।'

'রিসর্ট থেকেও ভাল আয় করে জুসাইও, কড়াকড়ি পাহারা দেখলে ট্যুরিস্টরা কেউ লেটিসে আসবে? ওগুলো লেটিসকে ঘিরে চক্কর দেয় ঠিকই, তবে দূর থেকে; দেখা যায় না।'

স্রোতের টানে ভেসে চলেছে রানঅ্যাবাউট, ব্ল্যাকহোল এরই মধ্যে এক-দেড়শো গজ পিছিয়ে পড়েছে।

'জুসাইও আর তার শিষ্যরা জানে আমরা ব্ল্যাকহোল থেকে পালিয়েছি,' বলল রানা। 'জেটিতে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করবে ওরা।'

'তার আগেও ধরা পড়ে যেতে পারি,' বলল শিরি।

'ধরা পড়লে তোমাকে হয়তো কিছু বলবে না, কারণ তোমাকে ওদের দরকার—যদিও জানি না কেন। কিন্তু আমাকে দেখামাত্র খুন করবে।'

ককপিটে রানার পাশের সীটে বসে আছে শিরি। নিচের দিকে ঝুঁকে পায়ের সামনে থেকে কার্পেটের প্রান্ত ধরে টান দিয়ে বলল, 'দেখো।'

কার্পেট সরে যেতে কাঠের একটা ঢাকনি দেখতে পেল রানা। ঢাকনিটা এক পাশে সরাতে একটা গর্ত দেখা গেল।

'নিচে একজনের শোয়ার মত জায়গা আছে,' বলল শিরি। ঢাকনি বন্ধ করে তার ওপর কার্পেট টেনে দিল আবার। 'এটার অস্তিত্ব আমারও জানা ছিল না, হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করেছি। যদি দেখি কেউ আসছে, ওখানে তোমাকে লুকিয়ে রাখব। ওদেরকে বলব, তুমি একা সাঁতার কেটে পালাতে চেষ্টা করছিলে, স্রোতের টানে ভেসে গেছ। এ-কথা শুনে বোট সার্চ করবে বলে মনে হয় না, তবু যদি করে, সে তোমার...'

'দুর্ভাগ্য,' বলল রানা। 'তবে ধন্যবাদ, শিরি, বুদ্ধিটা মন্দ নয়।'

একটু থেমে জিজ্ঞেস করল, 'এবার তোমার সব কথা খুলে বলবে আমাকে?'

'হ্যাঁ, বলছি,' শুরু করল শিরি।

লরেলি বা লরা হক, শিরির মা, আমেরিকান শ্বেতাঙ্গ হলেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। একটা সময় ছিল যখন বছরের বেশিরভাগ সময় তাঁর কাটত শান্তিনিকেতনে বসে টেগোরের কবিতা ইংরেজিতে ভাষান্তর করে। এই অনুবাদের কাজ করার সময় কোলকাতাতেই তাঁর একমাত্র সন্তান শিরির জন্ম দেন তিনি।

মায়ের সঙ্গে শান্তিনিকেতনেই বড় হয় শিরি; নাচ, গান, লেখাপড়া ও ভাষাচর্চা, সবই তার সেখানে শুরু। বাবা মনিরুল হক জন্মসূত্রে রাজশাহীর সন্তান হওয়ায় বাংলাদেশে, এবং তাদের স্থায়ী ঠিকানা ও বাবার কর্মস্থল যুক্তরাষ্ট্র হওয়ায় ওয়াশিংটনে প্রায়ই তার বেড়াতে যাওয়া হত। বিভিন্ন ভাষার প্রতি আগ্রহটা শিরি তার মায়ের কাছ থেকে পায়। খুব ছোটবেলা থেকে চর্চা করায় উপমহাদেশের প্রায় দশ-বারোটা ভাষা ছাড়াও অন্যান্য আরও কয়েকটা ভাষায় লিখতে ও কথা বলতে পারে সে।

শিরি আঠারো বছর বয়েসে মাকে হারায়। তাঁর ক্যান্সার হয়েছিল, মারা যান ওয়াশিংটনে নিজেদের বাড়িতে। বৈজ্ঞানিক বাবা আত্মভোলা মানুষ, স্ত্রী মারা যাবার পর পরিবার এবং সংসার সম্পর্কে আরও উদাসীন হয়ে পড়েন। কাজের মধ্যে ডুবে গিয়ে ভুলতে চাইতেন স্ত্রী হারানোর ব্যথা। যদিও মেয়ের প্রতি ভালবাসায় কখনও ঘাটতি পড়েনি তাঁর। গার্ডস করপরেশনে গবেষণার সূত্রে ল্যাবরেটরিতেই তাঁর বেশিরভাগ সময় কাটত, এমনকি রাতেও তিনি মাঝে মাঝে বাড়ি ফিরতেন না। বাবাকে

কাছে পাবার কোন উপায় নেই, এটা বুঝতে পেরে মা মারা যাবার পর শিরি আবার শান্তিনিকেতনেই ফিরে যায়। তবে সেই থেকে বছরে দু'বার ওয়াশিংটনে এসে বাবার সঙ্গে দেখা করত সে।

আজ থেকে প্রায় চার বছর আগে নাসা গার্ডস করপরেশন যখন অধিগ্রহণ করে শিরি তখন ওয়াশিংটনেই ছিল। কোম্পানি এভাবে হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে দেখে লুকাস ডেভেনপোর্ট সাংঘাতিক খেপে যান। নাসা, পেন্টাগন ও হোয়াইট হাউসকে তিনি বোঝাবার চেষ্টা করেন, ট্রিপলহেডারের ডিজাইনে এবং প্রযুক্তিগত সেক্টরে যে ব্রেকথ্রু তাঁরা ঘটিয়েছেন তার কৃতিত্ব গার্ডস করপরেশনের প্রাপ্য। তিনি প্রস্তাব দেন, গার্ডস করপরেশনকেই মিসাইলটা বানাবার সুযোগ দেয়া হোক, তৈরি হবার পর নাসার কাছেই সেটা বিক্রি করা হবে। হিসাব কষে এ-ও তিনি দেখান, তাতে নাসার খরচও পড়বে অনেক কম—বাজেটের মাত্র বিশভাগের এক ভাগ। কিন্তু তাঁর যুক্তি মানা হয়নি, নাসা গার্ডস করপরেশন দখল করে নিল। প্রচণ্ড রেগে গিয়ে লুকাস ডেভেনপোর্ট প্রতিজ্ঞা করলেন, তিনি তাঁর প্রধান বিজ্ঞানী ও বন্ধু মনিরুল হকের সাহায্যে গোপনে ট্রিপলহেডার তৈরি করবেন। তাঁর এই পরিকল্পনা পুরোপুরি সমর্থন করলেন সৈয়দ মনিরুল হক। দু'জনে মিলে সিদ্ধান্ত নিলেন, ট্রিপলহেডার তৈরি করার পর নাসার কাছেই তা বিক্রি করা হবে। সে-সময় বাবা ও লুকাস আংকেলের কথা শুনে শিরি বুঝতে পেরেছিল, ট্রিপলহেডার সংক্রান্ত জটিল অনেক কারিগরি সূত্র ও তথ্য নাসাকে তাঁরা জানতে দেননি, সেজন্যে দু'জনেই নিশ্চিত ছিলেন যে নাসার বিজ্ঞানীরা ট্রিপলহেডার তৈরি করতে পারবেন না, অন্তত তাঁদের চেয়ে আগে তো নয়ই।

সিদ্ধান্ত অনুসারে কাজ শুরু হলো। বাহামা সরকারের কাছ থেকে লেটিস আইল্যান্ড কিনে রিসর্ট ফ্যাসিলিটি তৈরি করলেন

ডেভেনপোর্ট, ফ্যাসিলিটির ও ট্রিপলহেডার প্রজেক্টের ম্যানেজার করা হলো সেল সি সা জুসাইওকে। কিভাবে কি করতে হবে সব তাকে বুঝিয়ে দিয়ে স্বেচ্ছা নির্বাসনে চলে গেলেন, অর্থাৎ প্রায় নিখোঁজ হয়ে গেলেন ডেভেনপোর্ট। মনিরুল হক আশ্রয় নিলেন লেটিসে, এখানেই তাঁর গবেষণা শুরু করার কথা, তবে রটিয়ে দেয়া হলো তিনিও নিখোঁজ। বাবা নিষেধ করায় লেটিসে শিরি এল না, তবে বছরে দু'বার ওয়াশিংটনে নিজেদের বাড়িতে এসে বাবাকে ফ্যাক্স করত সে, মনিরুল হকও ফ্যাক্সযোগে মেয়ের খোঁজ খবর নিতেন। বাবা শিখিয়ে দেয়ায় প্রতিবার ওয়াশিংটনে এসে পুলিস ও এফবিআই-এর সঙ্গে যোগাযোগ করেছে শিরি, জানতে চেয়েছে তারা তার নিখোঁজ বাবার কোন হদিশ বের করতে পেরেছে কি না।

এভাবেই চলছিল, ব্যত্যয় ঘটল মাস ছয়েক আগে। সেবার শান্তিনিকেতন থেকে ওয়াশিংটনে এসে যথারীতি বাবাকে ফ্যাক্স করল শিরি, কিন্তু অপরপ্রান্ত থেকে কোন সাড়া পেল না। বাবা তাকে একটা মোবাইল ফোন নম্বর দিয়েছিলেন, সেই নম্বরে ফোন করল শিরি। কেউ ধরে না। স্বভাবতই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল সে। লুকাস আংকেল চিরকুমার মানুষ, তার ওপর তিনিও নিখোঁজ, অনেক চেষ্টা করে তাঁর সঙ্গেও যোগাযোগ করতে ব্যর্থ হলো শিরি। অগত্যা মরিয়া হয়ে, বাবার কঠিন নিষেধ থাকা সত্ত্বেও, সাধারণ একজন ট্যুরিস্ট হিসেবে লেটিস আইল্যান্ডে চলে এল সে। সিআইএ বা এফবিআই পিছু নিতে পারে, এই ভয়ে নাম-পরিচয় বদলে নকল পাসপোর্ট ব্যবহার করল।

দ্বীপে পা দিয়েই শিরি বুঝতে পারল, এখানে বিপজ্জনক কিছু একটা ঘটছে। লুকাস ফাইভ স্টার-এর কর্মচারীরা জানাল, কি কারণে যেন ব্ল্যাকহোলে তল্লাশী চালিয়েছিল এফবিআই, কিন্তু

সন্দেহজনক বা আপত্তিকর কিছুই তারা খুঁজে পায়নি। লীয়ার জেটের পাইলট সিজার ওর ওপর বিশেষ নজর রাখছে, বুঝতে পেরে সাবধান হয়ে গেল শিরি। ধীরে ধীরে জানতে পারল, বাদামী সুট পরা স্মার্ট একদল তরুণ ইনার সার্কেল হিসেবে পরিচিত, জুসাইওর প্রতিটি নির্দেশ তারা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে। ক্যারলিনও তাদেরই একজন। লুকাস আংকেল বছরে দু'একবার আসেন, ওঠেন লুকাস ইনে, দু'একদিন থেকে আবার চলে যান। তাঁর সঙ্গে গোপনে দেখা করতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো শিরি। বাবা মনিরুল হক সম্পর্কে কোন তথ্যই সে যোগাড় করতে পারল না।

লেটিস দ্বীপে ট্যুরিস্ট হিসেবে এক হপ্তা কাটাবার পর বিপদটা টের পেল শিরি। রাতদিন চব্বিশ ঘণ্টা ওর ওপর কড়া নজর রাখছে জুসাইওর লোকজন। লুকাস ফাইভ স্টার-এ ও যে স্যুইটটা ভাড়া নিয়েছিল তার বাইরে দু'জন গার্ড সারাক্ষণ পাহারায় থাকে। একা ঘোরাফেরা ছেড়ে পালাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো শিরি, নিগ্রো সিজার বন্দী করল তাকে। সিজার আসলে সাবেক পুলিস অফিসার, জুসাইওর সিক্রেট এজেন্টদের লিডার। একটানা কয়েক ঘণ্টা জেরা করা হলো শিরিকে। ও বুঝতে পারল, সে যে মনিরুল হকের মেয়ে, এটা ওরা যেভাবেই হোক জেনে ফেলেছে। ওর মুখ দিয়ে সেটা স্বীকারও করানো হলো। এরপর খোদ জুসাইওর সামনে হাজির করা হলো ওকে। সে জানাল, তারা অনুমতি না দিলে লেটিস ত্যাগ করা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। তারপরও শিরি যদি সে চেষ্টা করে, শাস্তি হিসেবে মনিরুল হককে নির্মম শারীরিক নির্যাতন করা হবে। বিজ্ঞানীকে এখনও তাদের প্রয়োজন, তাই মেরে ফেলতে রাজি নয়, তবে একটা পা বা একটা হাত কেটে নিলেও তাঁর সার্ভিস পেতে কোন অসুবিধে হবে বলে তারা মনে করে না। ভয় দেখিয়ে বলা হলো, পা বা হাত যাই কাটা হোক,

একটু একটু করে কাটা হবে। জুসাইও হাসতে হাসতে এ-ও বলল, এই একই শাস্তি পেতে হবে শিরিকেও, মনিরুল হক যদি সহযোগিতা করতে অসম্মতি জানান। দুজনকেই সহযোগিতা করতে হবে, বিনিময়ে সপ্তাহে দু'বার দুই মিনিটের জন্যে টেলিফোনে কথা বলতে পারবে বাপ-বেটি—কিন্তু কোনও অবস্থাতেই সাক্ষাতের অনুমতি দেয়া হবে না। এরপর জুসাইও নির্দেশ দিল, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শিরিকে বেলি ডান্স আর স্ট্রিপটিজ শিখে নিতে হবে। ওকে এখানে বসিয়ে রেখে খাওয়াতে পরাতে পারবে না সে, নাচ শেখা শেষ হলে খদ্দের ধরে রাখার জন্য হোটেলে নিয়মিত নাচতে হবে ওকে। তবে ওর আসল কাজ হবে দোভাষীর দায়িত্ব পালন করা। লেটিসে বিভিন্ন দেশ থেকে লোকজন আসবে, সবাই তারা ভাল ইংরেজি জানবে এমন কোন কথা নেই।

বন্দী হবার ছ'মাস পর এখন শিরি অনেক কথাই জানে। তল্লাশী চালিয়ে এফবিআই কিছু খুঁজে পেতে ব্যর্থ হলেও, ও জানে, ট্রিপলহেডার ব্ল্যাকহোলেরই কোথাও তৈরি করা হচ্ছে। তার ধারণা, ব্ল্যাকহোলের নিচে আন্ডারগ্রাউন্ড একটা নয়, দুটো; ওই দ্বিতীয় স্তরেই বিশাল কারখানা গড়ে তোলা হয়েছে। প্রথমে একটা মাত্র ট্রিপলহেডার তৈরি করা হয়, প্রায় বছরখানেক আগে। মডেল টেস্ট-এর জন্যে জুসাইও বেছে নেয় উত্তর কোরিয়ার একটা নো ম্যানস ল্যান্ড। টেস্ট সফল হবার পর মনিরুল হকের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদন শুরু হয়েছে। মনিরুল হক সহ অন্যান্য বিজ্ঞানী ও টেকনিশিয়ানরা জুসাইওর হাতে বন্দী। জুসাইও লুকাস ডেভেনপোর্টকেও বোকা বানিয়ে রেখেছে। কালেভদ্রে লেটিসে যখন আসেন তিনি, মনিরুল হক তাঁকে জানান ট্রিপলহেডার তৈরি করতে আরও কিছুদিন সময় দরকার। মনিরুল

মিথ্যে কথা বলতে বাধ্য হন, কারণ শিরির ওপর অত্যাচারের হুমকি তো আছেই, সে-সময় তাঁর শরীরে বোমা ফিট করা থাকে, আর সেটা ফাটাবার জন্যে রিমোট কন্ট্রোল থাকে জুসাইওর হাতে।

ডেভেনপোর্টকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রেখে জুসাইও ট্রিপলহেডার তৈরি করে ফেলেছে, এবং সে তার ইনার সার্কেলের সদস্য মারটিন ও সিক্রেট এজেন্টদের লীডার সিজারের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের আন্ডারগ্রাউন্ড পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ করে ওগুলো বিক্রি করারও ব্যবস্থা চূড়ান্ত করতে যাচ্ছে। লুকাস ইনে এই মুহূর্তে সাতজন ক্রেতা রয়েছে–আমান মোহাম্মদ, মালুই সুকায়া, ঝিং থাপা, গ্যাব্রিয়েল আথানবেন, ফার্নান্দো ডোবার, রস গালাপ্পা ও বিগ বেঞ্জামিন। গালাপ্পা আর বেঞ্জামিন মাফিয়া পরিবারের সদস্য, নিউ ইয়র্ক আর ক্যালিফোর্নিয়া থেকে এসেছে। মালুই সুকায়া তামিল টাইগার, গেরিলা লীডার, গোলাবারুদের চোরাই ব্যবসার পাশাপাশি থাইল্যান্ড থেকে মাদক কিনে উপমহাদেশের বিভিন্ন শহরে সাপ্লাই দেয়। আমান মোহাম্মদ বাংলাদেশের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী নয়, সে এবং তার পরিবারের সবাই নিজেদেরকে এখনও পূর্ব-পাকিস্তানী বলে মনে করে, বাংলাদেশকে ‘মুসলিম বাংলা’ বানাবার চেষ্টা করছে। ঝিং থাপা নিষিদ্ধ ঘোষিত মাওপন্থী কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য, সে এবং তার স্ত্রী শ্রেণী সংগ্রামের নামে নেপালে বহু ব্যবসায়ীকে জবাই করেছে। আথানবেন ব্রাজিলের গুপ্তসংগঠন ‘রেড অ্যালার্ট’-এর লীডার, ‘রেড অ্যালার্ট’-কে আর্থিক সাহায্য দেয় নাৎসী ওঅর ক্রিমিনালদের একটা সংগঠন। আর ডোবার হলো পেরুর আন্ডারগ্রাউন্ডের কুখ্যাত এক সন্ত্রাসী গ্রুপের লীডার, তার বাহিনীতে দু’হাজার গুণ্ডা-মাস্তান আছে।

হ্যাঁ, প্রথমবারের মত এদের কাছেই জুসাইও ট্রিপলহেডার বিক্রি করতে যাচ্ছে। মাঝ সাগরে ঠিক কোথায় কার্গো ডেলিভারি

দেয়া হবে, সাতজনকে তা জানিয়ে দেয়া হয়েছে। ক্যারিয়ার অর্থাৎ সসার ও মিসাইল বিচ্ছিন্ন অবস্থায় তোলা হবে জাহাজে, সন্ত্রাসীরা ওগুলো যে-যার দেশে নিয়ে গিয়ে নিজেরাই জোড়া লাগাবে। সব মিলিয়ে একশো ষাটটা মিসাইল কিনেছে ওরা সাতজন। সিদ্ধান্ত হয়েছে রবিবার রাতে লেটিস ছেড়ে চলে যাবে ওরা, তার একহপ্তা পর মাঝ সাগরে ডেলিভারি পাবে কার্গো। টাকা-পয়সা এরই মধ্যে সব লেনদেন হয়ে গেছে।

মারাত্মক দুঃসংবাদ হলো, শনিবার সকালে লুকাস ডেভেনপোর্ট লেটিসে আসছেন। শনিবারে এসে রবিবারেই চলে যাবেন তিনি। দুঃসংবাদ এই জন্যে যে জুসাইও হয় তাঁকে বন্দী করবে, নয়তো টেক-অফ করার সময় রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে বোমা ফাটিয়ে তাঁর প্লেন উড়িয়ে দেবে–ঠিক কি ঘটবে তা নির্ভর করছে শিরির রিপোর্ট পাবার পর। এখানেই রানার প্রসঙ্গ এসে যাচ্ছে।

জুসাইও ব্যক্তিগতভাবে শিরিকে নির্দেশ দিয়েছিল, আজ রাতে বোট নিয়ে বেড়াতে বেরিয়ে তাকে জানতে চেষ্টা করতে হবে নরেশ বড়ুয়া লুকাস ডেভেনপোর্টের চর কিনা। তার সন্দেহ লেটিসে কি ঘটছে গোপনে জানার জন্যে বড়ুয়াকে ডেভেনপোর্টই পাঠিয়েছেন। শিরি যদি রিপোর্ট করে বড়ুয়া ডেভেনপোর্টের লোক, তাহলে তাঁর প্লেন রবিবারে টেক-অফ করার পর টাইম বোমা ফাটিয়ে উড়িয়ে দেবে সিজার। এ বিষয়ে শিরির সামনেই সিজারের সঙ্গে আলাপ করেছে জুসাইও। জুসাইওকে সিজার জানিয়েছে, একটা শক্তিশালী বোমা ব্রিফকেসে ভরেই রেখেছে সে, নির্দেশ পাওয়া মাত্র ক্যারলিনের মাধ্যমে ডেভেনপোর্টের প্লেনে তুলে দিতে পারবে–রিমোট কন্ট্রোল থাকবে জুসাইওর হাতে।

চার বছর আগে ডেভেনপোর্টের প্রাইভেট সেক্রেটারি ছিল ক্যারলিন, সেই সূত্রে ডেভেনপোর্ট লেটিসে এলে তাঁর ব্যক্তিগত

আরাম-আয়েশের দিকে সে-ই খেয়াল রাখে, এমনকি বিদায় নেয়ার সময় নিজে দাঁড়িয়ে থেকে প্লেনে লাগেজ ও খাবারদাবার তুলে দেয়। ওই লাগেজের সঙ্গেই বোমা ভরা ব্রিফকেসটা ডেভেনপোর্টের প্লেনে তুলে দেবে সে।

স্রোতের টানে বেশ কিছুক্ষণ ভেসে যাবার পর ওদের বোট লেটিসকে পিছনে ফেলে খোলা সাগরে চলে যাচ্ছে দেখে বাধ্য হয়েই এঞ্জিন চালু করতে হলো শিরিকে। দ্বীপের দিকে ফিরে আসছে ওরা, এই সময় সাগর আলোকিত করে ধেয়ে এল প্রথম হেলিকপ্টার।

শিরি চিৎকার করে সাবধান করলেও, তার আসলে কোন প্রয়োজন ছিল না, হেলিকপ্টারের সার্চলাইট দেখামাত্র কার্পেট সরিয়ে ঢাকনি তুলে ফেলেছে রানা, গর্তের ভেতর ঢুকে রাইফেলটাও টেনে নিয়েছে।

ত্রিশ সেকেন্ড পর বোটের মাথার ওপর চলে এল হেলিকপ্টার। পাইলট আর গানার দু'পাশের দুটো খোলা জানালা দিয়ে নিচের দিকে ঝুঁকে পড়ল। সার্চলাইটটা অপারেট করছে তৃতীয় এক লোক, আলোটা সরাসরি বোটে তাক করা। গানার তার মেশিনগানের ট্রিগারে আঙুল পেঁচিয়ে রেখেছে। তৃতীয় লোকটা মুখের সামনে হ্যান্ডমাইক তুলে প্রশ্ন করল, 'তুমি একা কেন? তোমার সঙ্গী কোথায়?'

হাসি হাসি মুখ, ওপর দিকে তুলে চিৎকার করল শিরি, 'ভেসে গেছে!' চিৎকারটা ওদের শুনতে পাবার কথা নয়, তাই খোলা সাগরের দিকটা ইঙ্গিতে দেখিয়ে দু'হাত দিয়ে সাঁতরানোর ভঙ্গি করতে হলো, তারপর নিঃসাড় ঢলে পড়ার অভিনয় করে বোঝাবার চেষ্টা করল তার সঙ্গী মারা গেছে।

হ্যান্ডমাইক থেকে বলা হলো, ‘তাড়াতাড়ি ভার্জিনে ফিরে যাও, বস্ তোমার জন্যে অপেক্ষা করছেন।’

মাথা ঝাঁকিয়ে বোটের স্পীড বাড়িয়ে দিল শিরি। হেলিকপ্টার নিয়ে খোলা সাগরের দিকে চলে গেল পাইলট।

শিরির পায়ের কাছে ফুলে উঠল কার্পেট, ঢাকনি খোলার চেষ্টা করছে রানা। ‘তোমার কথা বিশ্বাস করল ওরা?’

কার্পেট সরিয়ে রানাকে মুখ বের করার সুযোগ করে দিল শিরি। ‘যতক্ষণ না তোমাকে দেখতে পাচ্ছে এই ব্যাখ্যাই ওদেরকে মেনে নিতে হবে।’

‘এভাবে কতক্ষণই বা ফাঁকি দেয়া সম্ভব?’ জিজ্ঞেস করল রানা। ‘বোট বেসিনে পৌঁছে আমাকে নিয়ে কি করবে তুমি?’

‘আমি বোট ভেড়াব ঠিক এই রকমই একটা বোটের পাশে। ওটা সিজারের বোট, অনেকদিন হলো বেসিনে পড়ে আছে। রিসিভ করার জন্যে নিশ্চয়ই কেউ না কেউ থাকবে ওখানে, কাজেই তোমাকে এই বোটে রেখেই চলে যেতে হবে আমাকে।’

‘তারপর?’

‘আমার রিপোর্ট পাবার পর জুসাইও হয়তো বোটটা সার্চ করার নির্দেশ দেবে। কিন্তু তার আগেই তুমি এই বোট থেকে সিজারের বোটে চলে যাবে।’ হাতঘড়ির ওপর চোখ বোলাল শিরি। ‘সাড়ে নটা বাজে, এত রাতে জেটিতে বা বোট বেসিনে অন্য কারও না থাকারই কথা। তবু বোটটা বদলাবার আগে মাথা তুলে চারদিকটা ভাল করে দেখে নিয়ো। আমার বোট ওরা সার্চ করুক বা না করুক, রাত আরেকটু গভীর হলে তোমাকে নিতে আসব আমি।’

‘হাসি পাচ্ছে, যদিও পাওয়া উচিত কান্না। এত সহজ করে বলছ, এটা যেন কোন সমস্যাই নয়। কিভাবে নিয়ে যাবে, শুনি?

নিয়ে যাবেই বা কোথায়?'

'বোট আসছে!' হিসহিস করল শিরি। 'লুকাও!'

একটা হাইড্রোফয়েল তীর বেগে ছুটে এল। সরাসরি ওদের দিকেই আসছে। বোটের সামনের দিকে মেশিনগান দেখতে পেল শিরি। ছয়-সাতজন লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে রেইলিং ঘেঁষে, প্রত্যেকের হাতে রাইফেল। থামল না বা শিরিকে থামতেও বলল না, বিশ গজ দূর দিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে। হাইড্রোফয়েলের ক্যাপটেন হাত তুলে নাড়ল একবার, মুখটা হাসি হাসি। একজন লোকের হাতে একটা রেডিও-ফোন দেখতে পেল শিরি।

হাইড্রোফয়েল চলে যেতে আবার কার্পেট সরাল সে। 'রেডিওতে হেলিকপ্টার পাইলটের সঙ্গে কথা হয়েছে ওদের, তাই আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করল না।'

'তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দাওনি, শিরি,' মনে করিয়ে দিল রানা।

'হোটেলের কিচেন থেকে খানিকটা কাঠকয়লা যোগাড় করব,' বলল শিরি। 'সেই কয়লা গুঁড়ো করে একটা পলিথিন ব্যাগে ভরে রেখে যাব সিজারের বোটে। পিছনে ফেউ লাগতে পারে, তাই সিজারের বোটে আমি উঠব না, ফেলে যাওয়া কিছু একটা নিতে এসেছি এই অজুহাতে নিজের বোটে চড়ে পাশের বোটের ডেকে রেখে যাব ব্যাগটা। ওই ব্যাগের ভেতর আরও একটা ব্যাগ থাকবে, তাতে থাকবে সিজারের ট্রাউজার, শার্ট আর জ্যাকেট। এবার তুমি বলো ওগুলো পেয়ে কি করবে।'

'আমাকে রঙ মেখে সিজার সাজতে হবে,' বলে হেসে উঠল রানা। 'বেশ, সাজলাম। তারপর? কোথায় গিয়ে উঠব? তোমার স্যুইটে?'

'না। আমার স্যুইটে প্রায়ই ওরা আসা-যাওয়া করে, তোমাকে

লুকিয়ে রাখা সম্ভব হবে না। তোমাকে পিছনের দরজা দিয়ে হোটেলে ঢুকে ছয়তলায় না উঠে পাঁচতলায় উঠতে হবে। আমার পাশের স্যুইটটা বেশিরভাগ সময় খালিই পড়ে থাকে, ওটায় ঢুকবে তুমি। পলিথিনের ব্যাগে ওই স্যুইটের চাবিও থাকবে।'

'চাবি? চাবি পাবে কোত্থেকে?'

হাসল শিরি। 'পেতে হবে না, আমার স্যুইটের চাবিই ওই স্যুইটে লাগে। স্যুইট আসলে একটাই, আমাদের দু'জনকে ভাগ করে দেয়া হয়েছে। মাঝখানে একটা দরজা আছে, সেটা শুধু আমার দিক থেকে খোলা যায়।'

'বললে বেশিরভাগ সময় খালি পড়ে থাকে, কথাটার মানে কি?'

'সিজারের একজন রক্ষিতা আছে, ওই স্যুইটটা তার,' বলল শিরি। 'মেয়েটা আসলে জুসাইওর স্টাফ, তাই লুকাস ইনেই থাকে সে। সিজার ডাকলে মাঝেমধ্যে আসে। জুসাইওর নির্দেশে দু'একজন ট্যুরিস্টকেও সঙ্গ দিতে হয় তার, সেজন্যেই আমার স্যুইটের অর্ধেকটা বরাদ্দ করা হয়েছে তাকে।'

'কে সে? ক্যারলিন নয়তো?'

কথা না বলে হেসে উঠল শিরি।

'হাসছ যে? সত্যি ক্যারলিন?'

'হ্যাঁ, সত্যি।'

প্রস্তাবটা বিবেচনা করল রানা। তারপর মাথা ঝাঁকাল। 'ধন্যবাদ, শিরি। ওই আশ্রয় আমার খুব কাজে লাগবে। এরপর কি করতে হবে, সব আমার ওপর ছেড়ে দাও।'

'রানা, তোমাকে আমি চিনি না, তবু জীবনের ওপর ঝুঁকি নিয়ে সাহায্য করছি শুধু বাবাকে উদ্ধার করতে পারব এই আশায়। কিন্তু তোমার কোন প্ল্যান আছে কিনা আমি জানি না। তুমি কি একা, নাকি তোমার সঙ্গে আরও লোকজন আছে? জুসাইওর বিরুদ্ধে

এফবিআই আর সিআইএ কিছুই করতে পারেনি, তুমি একা হলে প্রাণটাই শুধু হারাবে...'

শিরিকে থামিয়ে দিল রানা। 'বললামই তো, এ-সব নিয়ে তোমাকে চিন্তা করতে হবে না। প্ল্যান তো অবশ্যই একটা আছে, কিন্তু সেটা এত অবাস্তব মনে হবে, তোমার না শোনাই ভাল। লুকিয়ে থাকার সময় যদি তোমার সঙ্গে দেখা করার সুযোগ হয়, আমি হয়তো দু'একটা তথ্য জানতে চাইব। ব্যস, তোমার আর কোন সাহায্য আমার দরকার হবে না। ভাল কথা, সাতজন ক্রেতাকে নিয়ে দ্বিতীয় প্লেনটা রবিবারে ঠিক কখন রওনা হবে, তুমি জানো?'

'কি করে জানব!'

'ওটা কি লীয়ার জেট? সিজার চালাবে?'

মাথা ঝাঁকাল শিরি।

'গুড,' বলল রানা। 'জুসাইওকে তুমি রিপোর্ট করবে, আমার সঙ্গে কথা বলে তুমি নিশ্চিত হয়েছ যে তার সন্দেহই ঠিক—অর্থাৎ আমি লুকাস ডেভেনপোর্টের ভাড়া করা প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর।'

আঁতকে উঠল শিরি। 'অসম্ভব! না! এ-কথা বললে সিজার লুকাস আংকেলের প্লেন উড়িয়ে দেবে।'

'তাঁকে বাঁচানোর দায়িত্ব আমার, শিরি,' গম্ভীর গলায় বলল রানা। 'আমি যা বলছি তুমি তাই করবে। আরেকটা কথা। যে ব্রিফকেসে বোমাটা আছে। ওটা কি রকম দেখতে, কি রঙের, কত বড়, চেষ্টা করলে জানতে পারবে?'

'খয়েরী রঙের ছোট ব্রিফকেস,' বলল শিরি। 'ইনার সার্কেলের সবাই এই একই ব্রিফকেস ব্যবহার করে। প্লেনে ওঠার সময় সিজারের হাতেও তো দেখি। ওই একই ব্রিফকেস আমাকেও দেয়া হয়েছে একটা। কিন্তু এ-কথা জানতে চাইছ কেন?'

‘এমনি,’ উত্তরটা এড়িয়ে গেল রানা। ‘এবার বলো, হোটেল থেকে লুকাস ইনে যাবার গোপন কোন পথ আছে কিনা।’

‘আছে, কিন্তু টানেলে গার্ড থাকে…’

‘টানেলে ঢোকার উপায়টা বলো।’

‘ছাদে দুটো কংক্রিটের পানির ট্যাংক আছে। একটা শুকনো। ওই শুকনোটার ভেতর এলিভেটর আছে। গার্ড আছে নিচের টানেলে।’

‘এফবিআই যখন সার্চ করল, ওটা দেখেনি?’

‘কেন দেখবে না। টানেল হয়ে আন্ডারগ্রাউন্ডে ঢুকে সারা দিন তল্লাশী চালিয়েছে, কিন্তু কিছু পায়নি।’

‘অথচ তোমার ধারণা ট্রিপলহেডার এই লেটিসেই কোথাও তৈরি করা হচ্ছে?’

‘সত্যি কথা বলতে কি, ধারণা নয়, আমি জানি।’

‘মানে! এত জোর দিয়ে কি করে বলছ?’

‘জুসাইও কিম উনকে একটা পাঁচশো টনী কার্গো জাহাজ আনতে বলেছে। জাহাজটা লেটিসে ভিড়বে মঙ্গলবারে–ক্রেতারা বিদায় নেয়ার দু’দিন পর, এবং কার্গো ডেলিভারি পাবার পাঁচ দিন আগে। এর অর্থ কি, তুমিই বলো।’

চিন্তা করছে রানা।

‘মনে রেখো,’ আবার বলল শিরি, ‘জাহাজটা লেটিসে ভিড়বে, ব্ল্যাকহোল সাইডে।’

‘হুম, চিন্তারই কথা,’ খানিক পর বলল রানা, তারপর অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল। ‘তুমি যে স্বেচ্ছায় বাঘের মুখে পড়তে যাচ্ছ, ভয় করছে না? বোমা ফাটিয়ে অতগুলো লোককে অজ্ঞান করলে, তার কি ব্যাখ্যা দেবে?’

‘কোনও ব্যাখ্যা নেই। তবে এখনও কারিগরি অনেক তথ্য

ক্রেতাদের ব্যাখ্যা করে শোনাতে হবে, কাজেই এই দোভাষীকে এখনও দরকার ওদের। গ্যাস বোমা? কত কথাই তো বলা যায়। বলতে পারি তোমার বোমা তোমাকে ঘায়েল করার জন্যেই ফাটিয়েছিলাম। কিংবা বলা যায়, গার্ডরা আমাকেও খুন করতে যাচ্ছিল, বাধ্য হয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করতে হয়েছে।' কথার ফাঁকে কোর্স বদল করল শিরি, অনেকক্ষণ পর আবার সরাসরি ভার্জিনের দিকে ছুটল রানঅ্যাবাউট।

আকাশের দিকে তাকাল রানা। মেঘ জমছে দেখে বলল, 'মনে হচ্ছে বৃষ্টি হবে।'

'সর্বনাশ! বৃষ্টি হলে তো কাঠ-কয়লা সব ধুয়ে যাবে! তোমার জন্যে তাহলে একটা রেনকোট নিয়ে আসব? চেহারা ঢাকার কাজও চলবে।'

'তারচেয়ে বেশি দরকার পিস্তলটা,' বলল রানা। 'কোথায় আছে বলে দিলে আনতে পারবে?' ট্রাউজারের পকেটে হাত ভরল। 'আমার কাছে চাবি আছে। আর, হ্যাঁ, সুইমিং ট্রাঙ্কটাও নিয়ে এসো।'

'কেন? সুইমিং ট্রাঙ্ক দিয়ে কি হবে?'

আজ রাতেই আবার ব্ল্যাকহোলে ফিরে যেতে চায় রানা, তবে সে-কথা শিরিকে এখুনি বলার কোন মানে হয় না। 'বেল্টের মত ওতেও দু'একটা জিনিস আছে, দরকার হতে পারে,' সত্যি কথাই বলল রানা।

'ঠিক আছে, চেষ্টা করব আনতে। এবার তুমি লুকাও। বোট বেসিনে পৌঁছাচ্ছি আমরা। দেখা হবে ক্যারলিনের স্যুইটে, কেমন?' যেন লজ্জা পেয়েই আকাশের দিকে তাকাল শিরি। 'মাঝখানের দরজাটা খোলাই থাকবে।'

দশ

কিছু একটা বিপদ নিশ্চয়ই ঘটেছে, তা না হলে শিরি ফিরছে না কেন?

বোট যখন বেসিনে ভিড়ল, আশপাশে কেউ ছিল না। শিরি ওকে সিজারের রানঅ্যাবাউটে লুকিয়ে রেখে ফিরে গেছে। প্রথমে নিজের স্যুইটে যাবে সে, শাওয়ার সেরে কাপড় বদলাবে, তারপর ছাদ থেকে এলিভেটরে চড়ে টানেল হয়ে লুকাস ইনে যাবে জুসাইওকে রিপোর্ট করার জন্যে। সব মিলিয়ে কতক্ষণ লাগতে পারে? দেড় ঘণ্টা? দু'ঘণ্টা?

শিরি চলে যাবার পর হেলিকপ্টার ও হাইড্রোফয়েলের আওয়াজ শুনেছে রানা। ওগুলো ফিরে এসে আবার চলে গেছে খোলা সাগরের দিকে টহল দিতে।

রাত এখন একটা। শিরি যাবার পর তিন ঘণ্টা পনেরো মিনিট পার হয়ে গেছে। সন্দেহ নেই, কঠিন কোন বিপদেই পড়েছে সে। জুসাইও হয়তো ছাড়ছে না তাকে। মেরে ফেলেনি তো?

আজ রাতে আর রানার ব্ল্যাকহোলে যাওয়া হবে না। প্রথম কাজ শিরির খবর নেয়া। কিন্তু কিভাবে? ওকে খালি গায়ে ফিরতে দেখলে হোটেল স্টাফ হাঁ করে তাকিয়ে থাকবে। সিকিউরিটি অফিসারদের নিশ্চয়ই সতর্ক করা হয়েছে। স্যুইটে ঢোকার পর পাঁচ মিনিটের মধ্যে নক হবে দরজায়। আর যদি পথেই বাদামী

সুট পরা কেউ দেখে ফেলে, দেখামাত্র গুলি করলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। ওর সঙ্গে রাইফেল থাকলেই বা কি, শক্তিশালী ও সুসংগঠিত একটা অর্গানাইজেশনের বিরুদ্ধে একা কি করতে পারবে ও?

মন যুক্তি দিল, হোটেলে ওর ফেরা চলে না; সেটা স্রেফ আত্মহত্যা করা হবে। কিন্তু সব যুক্তি বাতিল হয়ে গেল মনেরই গভীর থেকে উঠে আসা একটা কথায়, 'তুমি ছাড়া শিরিকে উদ্ধার করার কেউ নেই!'

চারদিক অন্ধকার, বোট বেসিনকে পিছনে ফেলে গলফ কোর্সের মাথায় পৌঁছাল রানা, ধীর পায়ে সাবধানে হাঁটছে। এক পাশে কয়েকটা গাছ আর কিছু ঝোপ পড়ল। সামনের জমিন ক্রমশ উঁচু হয়ে আবার ঢালু হয়ে নেমে গেছে। প্রথমে বোঝা গেল না কি ওটা, যেন ঢালের মাথায় গোল কিছু একটা রেখে দিয়েছে কেউ। কিন্তু না, স্থির নয় ওটা, একটু একটু করে শূন্যে উঠছে। সময় নিয়ে স্পষ্ট হলো আকৃতিটা– মাথা, গলা, কাঁধ, বুক। স্যাঁৎ করে একটা গাছের আড়ালে সরে এল রানা। প্রথমে চিনতে না পারলেও, পাশ ঘেঁষে হেঁটে যাবার সময় বুঝতে অসুবিধে হলো না নারীমূর্তিটি আসলে শিরি। নেহাতই ট্রেনিঙের গুণ বলতে হবে, শিরিকে চমকে দেয়ার লোভটা প্রায় অনায়াসে সামলে নিল রানা; আর সংযমের সুফলটাও পেল একেবারে হাতে-হাতে।

লম্বা লম্বা পা ফেলে দ্রুত বোট বেসিনের দিকে চলে যাচ্ছে শিরি। আড়াল থেকে রানা বেরুচ্ছে না, তাকিয়ে আছে ঢালের মাথায়। পনেরো সেকেন্ড পর আবার ওখানে গোল একটা আকৃতি ফুটল। ধীরে ধীরে গলা, কাঁধ আর বুক স্পষ্ট হতে দেখল রানা। তারপর, মেঘের কোল থেকে চাঁদটা বেরিয়ে আসতেই, লোকটাকে চিনতে পারল। কিম উন! জুসাইওর ডান হাত। মনে মনে হাসল

রানা। ঠিক এইরকম একজনকেই দরকার ওর।

'উন নাকি?' আড়াল থেকে লোকটার পিছনে বেরিয়ে এল ও।

পিঠে রাইফেলের মাজল ঠেকতেই ঝট করে মাথার ওপর হাত তুলল উন, নাকি সুরে বলল, 'আই সারেন্ডার!'

'চোপ!' চাপা গলায় গর্জে উঠল রানা। 'কোন কথা নয়।' আধ মিনিট অপেক্ষা করল, কিন্তু শিরি ফিরল না। সে সম্ভবত টেরই পায়নি পিছনে কি ঘটছে। অপেক্ষা করার সময় উনকে সার্চ করে একটা পিস্তল আর টর্চ পেল ও। পিঠ থেকে মাজল না সরিয়ে তাকে নিয়ে সরে এসেছে ঝোপের আড়ালে। 'জোরে কথা বললে খুলি ফাটিয়ে দেব। কি ঘটছে বলো।'

'বস্ বললেন ফারাহর ওপর নজর রাখতে হবে, তাই...'

'আমার কথা কিছু বলেনি?'

'বললেন আপনি নাকি ডুবে মারা গেছেন।'

হাসল রানা। 'আর কিছু?'

'ফারাহকে বলতে শুনলাম, আপনি নাকি মি. ডেভেনপোর্টের এজেন্ট।'

'তো কি সিদ্ধান্ত হলো?'

'কিসের সিদ্ধান্ত?'

'থাক, ভুলে যাও।'

একটু পর উন বলল, 'একটা কথা বলি, মি. বড়ুয়া। আপনাকে আমার বোকা বলে মনে হয়নি। অথচ শুধু নিরেট একটা গর্দভই আমাদের বিরুদ্ধে একা লাগতে আসবে। রহস্যটা কি বলুন তো?'

'কে বলল আমি একা? তুমি, ক্যারলিন, সিজার–তোমাদের সবার সাহায্যই তো নেব আমি।'

'মানে?'

'ভাল সাঁতার জানো তো?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'সৈকত ঘেঁষে

মাইলখানেক সাঁতরে ব্ল্যাকহোলে যাব আমরা। শেড হয়ে আন্ডারগ্রাউন্ডে নামতে চাই আমি, তুমি আমাকে পথ দেখাবে।’

‘ফর গড’স সেক, নো! বিশ্বাস করুন, আমি সাঁতার জানি না।’

‘সেটা তোমাকে প্রমাণ করতে হবে পানিতে ডুবে মারা গিয়ে।’ হাসছে রানা।

উন চুপ মেরে গেল। ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে আছে রানা, দেখছে শিরি ফিরে আসছে কিনা। বোটে ওকে না পেয়ে এদিক ওদিক খুঁজবে সে, দেরি হবার সেটাই কারণ।

আরও প্রায় দশ মিনিট পর শিরিকে দেখা গেল। খালি হাত, হন হন করে হাঁটছে। উনকে আগেই শব্দ করতে নিষেধ করে দিয়েছে রানা, নিজেও কোন আওয়াজ করল না। সন্ত্রস্ত হরিণীর মত ঝোপটাকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল শিরি।

কিম উনকে নিয়ে একটু চিন্তা ছিল, কিন্তু দেখা গেল প্রতিটি নির্দেশ সুবোধ বালকের মত পালন করছে সে, একটু যেন উৎসাহই বোধ করছে। মনটা খুঁত খুঁত করলেও ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামানোর বেশি সময় পাওয়া গেল না। সুইমিং ট্রাঙ্ক পরে রাইফেলটা সিজারের বোটে লুকিয়ে রাখল রানা, একই জায়গায় রাখল উনের পিস্তল। নিজের পিস্তল পলিথিনের ব্যাগে ভরে মুখের কাছে গিঁট দিতে ওয়াটারপ্রুফ হয়ে গেল। উন ইতিমধ্যে কাপড়চোপড় খুলে ফেলেছে, পরনে এখন শুধু আন্ডারওয়্যার। ‘তুমি আমার পাঁচ গজ সামনে থাকবে,’ উনকে বলল রানা।

পানিতে নামার দশ মিনিট পরই টের পেল রানা, বোট নিয়ে রওনা হলে কি বিপদেই না পড়ত। হেলিকপ্টারটা আরও একবার ফুয়েল নিতে ফিরে এল, বোট বেসিনের চারপাশে সার্চলাইটের আলো ফেলে তন্নতন্ন করে কি যেন খুঁজছে। কিছুক্ষণ পর এক

জোড়া হাইড্রোফয়েলকেও ওই একই কাজ করতে দেখল ও।

ভাগ্যই বলতে হবে কারও চোখে ধরা না পড়ে ব্ল্যাকহোলে পৌঁছাল ওরা। সৈকত থেকে ঢাল বেয়ে খানিকটা উঠে এসে উনকে দাঁড় করাল রানা। পলিথিনের ব্যাগ খুলে কাপড়-চোপড় বের করে ছুঁড়ে দিল ঘাসের ওপর। 'পরো।'

কাপড় পরার সময় উন এমন সুরে কথা বলল, যেন কৌতুক করছে, 'মি. বড়ুয়া, আমাকে আপনি সঙ্গে করে না আনলেও পারতেন। শেড হয়ে আন্ডারগ্রাউন্ডে নামা খুব সহজ, কাউকে চিনিয়ে দেয়ার দরকার পড়ে না।'

'আমার গন্তব্য দ্বিতীয় আন্ডারগ্রাউন্ড,' বলল রানা। 'যেখানে তোমরা ট্রিপলহেডার তৈরি করছ।'

অন্ধকারে শব্দ করে হাসল উন। 'বাহ্, আমাদের কারখানার খবরও আপনি পেয়ে গেছেন! তবে কি জানেন, আমাদের সিক্রেসি ও সিকিউরিটি সম্পর্কে সত্যি আপনার কোন ধারণা নেই। একবার সিআইএ, আর দু'বার এফবিআই গোটা দ্বীপ তন্নতন্ন করে খুঁজে গেছে, কিন্তু কিছুই তারা পায়নি। আপনি যদি পান, কৃতিত্বটা জাহির করার সুযোগ হবে না।'

'কি বলতে চাও?'

'বলতে চাই শুধু এইটুকুই যে, সংক্ষেপে, যদি সাহস থাকে তো সাগরে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করুন। তবু আমার বস্ জুসাইওর হাতে ধরা দেবেন না। কারণ তার শাস্তি বড় নির্মম।'

প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল উন। সে যেন নিজেকে অসাধারণ বুদ্ধিমান বলে জাহির করতে চাইছে। শুধু তাই নয়, বুদ্ধির প্যাঁচ কষে রানাকে চ্যালেঞ্জও করছে সে।

রানা সিদ্ধান্তে পৌঁছাল, উনের কাছে গোপন কোন তথ্য আছে, হেঁয়ালি করার সেটাই কারণ। এমন হতে পারে, আন্ডারগ্রাউন্ডের

দ্বিতীয় স্তরে যাবার পথে কোন ফাঁদ আছে, আভাসে সেটার কথা বলে মজা পাচ্ছে লোকটা।

ব্যাগ খুলে পিস্তলটা হাতে নিল রানা। 'হাঁটো, উন। কোথায় যেতে হবে তুমি জানো।'

ওর ফিরে আসার অপেক্ষায় ব্ল্যাকহোলের গার্ডরা সতর্ক, এরকম কোন লক্ষণ চোখে পড়ল না। কোন ঘটনা ছাড়াই শেডের কাছে চলে এল ওরা। ঝোপের আড়াল থেকে রানা দেখল, গার্ডরুমের ভেতর লোকটা এখনও সেই একই ভঙ্গিতে বসে আছে, ঠিক যেন একটা পাথুরে মূর্তি। গ্রিল দেয়া গেটের ভেতর টিউবলাইট জ্বলছে, ভেতরে কিছু পরিত্যক্ত ফার্নিচার আর চটের বস্তা ছাড়া কিছু নেই। ভেতরটা বিশাল ও নির্জন।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে নিশ্চিত হলো রানা, শেডের আশপাশে কোন গার্ড নেই। পিস্তলের মাজলটা উনের শিরদাঁড়ায় চেপে ধরল ও। 'বেরোও!'

ঝোপ থেকে ওদেরকে বেরুতে দেখে টুল ছেড়ে সিধে হলো গার্ড। জানালা দিয়ে তাকিয়ে থাকল সে, গার্ডরুম থেকে বেরুল না। রাইফেলটা আগেই ওদের দিকে তাক করেছে।

গেটের কাছে আলো বেশি। উনকে নিয়ে সেদিকেই যাচ্ছে রানা। চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেল গার্ডের হাতের রাইফেল ধীরে ধীরে নিচু হচ্ছে। তারপর গার্ডরুম থেকে প্রায় ছিটকে বেরিয়ে এল সে, সামরিক কায়দায় স্যালুট করল উনকে। 'মি. উন! স্যার!'

'স্যারকে যদি বাঁচাতে চাও, গেটটা খুলে দাও, পিয়াং,' হালকা সুরে যেন কৌতুক করছে উন। 'মি. বড়ুয়া আমার পিছনে লোহা ধরে রেখেছেন।'

মুখ টিপে হাসতে গিয়েও হাসল না গার্ড। 'স্যার মনে হয় আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছেন। আপনি তো জানেনই যে এই গেট সব

সময় খোলা থাকে–তালা দেয়ার ব্যবস্থাই রাখা হয়নি।'

খেয়াল করতে রানা দেখল, কথাটা ঠিক, গেটে তালা দেয়ার কোন ব্যবস্থা নেই।

'আমি জানলে কি হবে, যিনি আমাকে জিম্মি করেছেন তিনি তো জানতেন না,' বলল উন। 'ঠিক আছে, পিয়াং, এবার তুমি গেটের দিকে পেছন ফেরো। ও, হ্যাঁ, তার আগে রাইফেলটা ফেলে দাও হাত থেকে।' একটু থেমে নিচু গলায় রানাকে জিজ্ঞেস করল, 'ঠিক আছে তো, মি. বড়ুয়া? দেখুন, কথা খরচের ঝামেলা থেকে কেমন বাঁচিয়ে দিচ্ছি আপনাকে।'

উনের অতি চালাকি ভাব লক্ষ করছে রানা, তবে কিছু বলছে না। রাইফেল ফেলে দিয়ে পিয়াংকে পিছন ফিরতে দেখল ও।

শিরদাঁড়ায় ব্যারেলের গুঁতো খেয়ে সামনে বাড়ল উন। বলতে হলো না, গেট টেনে ফাঁক করল সে। 'আপনি এত চুপচাপ কেন, বস্? এরপর কি করতে হবে বলে দিন। মুখে কাপড় গুঁজে, হাত-পা বেঁধে ফেলে রাখবেন পিয়াংকে, নাকি মাথায় বাড়ি মেরে অজ্ঞান করবেন?'

মনে জমে থাকা সমস্ত ঝাল উনের মাথায় ঝাড়ল রানা। উল্টো করে ধরা অস্ত্রটা নেমে এসে খুলিতে চিড় ধরাল, থ্যাচ্ করে শব্দ হতে শিউরে উঠল পিয়াং।

উন পাক খাচ্ছে, কিন্তু পড়ছে না, দেখে বিব্রতবোধ করল রানা। বাধ্য হয়েই আবার একবার মারতে হলো, এবার কপালে। দড়াম করে কাছেই পড়ল উন, এক লাফে তাকে টপকে এসে রাইফেলটা মেঝে থেকে তুলল রানা। পিয়াং একচুলও নড়েনি, পিঠে শক্ত কিছু অনুভব করে আরেকবার শিউরে উঠল শুধু।

রানার নির্দেশে অজ্ঞান উনকে বস্তাগুলোর আড়ালে টেনে আনল সে, মুখে রুমাল গুঁজে শার্ট ছিঁড়ে হাত-পা বাঁধল।

‘আমি দু’নম্বর আন্ডারগ্রাউন্ডে যেতে চাই,’ বলল রানা। ‘কারখানাটা দেখব, দেখব ট্রিপলহেডার কোথায় লুকিয়ে রাখা হয়েছে। তুমি আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে।’

কথা না বলে পিয়াং শুধু মাথা ঝাঁকাল। লোকটা যে ভয় পেয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই, তা না হলে এভাবে দরদর করে ঘামত না।

‘কি, নিয়ে যাবে না?’

‘স্যার, মার খেতে আমার সাংঘাতিক ভয় করে,’ বলল পিয়াং। ‘বিশ্বাস করুন আমি সত্যি কথা বলছি। দ্বিতীয় একটা আন্ডারগ্রাউন্ড আছে, তা আমি বেশ বুঝতে পারি, কিন্তু কিভাবে সেখানে যেতে হয় তা আমি জানি না।’

‘কিভাবে বুঝতে পারো দ্বিতীয় আন্ডারগ্রাউন্ড আছে?’

‘ব্ল্যাকহোলের অনেক গার্ডই এই গেট দিয়ে ভেতরে ঢোকে, তারপর কিভাবে যেন অদৃশ্য হয়ে যায়। আমি নতুন তো, সম্ভবত সেজন্যেই রহস্যটা আমাকে এখনও জানানো হয়নি।’

‘শেষবার এই গেট দিয়ে কে গেছে, কবে গেছে?’ জিজ্ঞেস করল রানা, ধরে নিল পিয়াং সত্যি কথাই বলছে।

‘শেষবার এই তো খানিক আগে রেমো খেং গেছেন, সঙ্গে তিনজন গার্ডও ছিল। রেমো খেং আমাদের লীডার, স্যার।’

‘ঠিক আছে, আমার সঙ্গে চলো তুমি, দেখি কোনদিকে গেছে তারা।’

একটু ইতস্তত করে মাথা ঝাঁকাল পিয়াং। সে ঘুরে দাঁড়াল, কিন্তু পা বাড়াতে পারল না।

পিয়াংকেও অজ্ঞান করে বাঁধল রানা, মুখে কাপড় গুঁজে রওনা হলো একাই।

জায়গাটা এয়ারপোর্ট হ্যাঙ্গারের মত বিশাল। দু’পাশে ও

মাথার দিকে টিউবলাইট জ্বলছে, ফলে আলোর কোন অভাব নেই। কিন্তু আলো থাকলেই বা কি, ভেতরে এমন কিছু নেই যে রানার মনোযোগ কাড়তে পারে। সিলিঙে ইস্পাতের বীম, পরস্পরকে ভেদ করে জটিল নকশা তৈরি করেছে, ওখানে কোথাও যদি ভিডিও ক্যামেরা লুকানো থাকে, সহজে দেখতে পাবার কথা নয়।

হঠাৎ একটা খটকা লাগল রানার। শেডটা ভেতরে এত বড়, অথচ বাইরে থেকে তো এত বড় দেখায় না। মেঝে ক্রমশ ঢালু কেন, এর একটা উত্তর পাওয়া গেল। শেডের বেশিরভাগই মাটির নিচে তৈরি করা হয়েছে।

শেডটা প্রায় দুশো গজ লম্বা। এত দূর হেঁটে আসার সময় গেট ছাড়া আর কোন দরজা বা জানালা দেখেনি রানা। তবে বিশ ফুট ওপরে, সিলিঙের কাছাকাছি সারি সারি ভেন্টিলেটর আছে। তবে শেষ দিকে তাও নেই। দরজা দেখা গেল নাক বরাবর সামনে। নিরেট লোহার বা ইস্পাতের দরজা, পাশাপাশি তিনটে। প্রতিটি দরজার কবাট দেয়ালের ভেতর সেঁধিয়ে আছে, এত ভারী যে টেনে বের করা অসম্ভব। খোলা বা বন্ধ করার জন্যে নিশ্চয়ই বিদ্যুৎচালিত যান্ত্রিক কোন ব্যবস্থা আছে। যদিও দরজার গায়ে বা আশপাশের দেয়ালে কোন হাতল কিংবা বোতাম নেই। ক্যামেরা ও রিমোট কন্ট্রোল-এর সাহায্যে অপারেট করা হয়।

মাঝখানের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকল রানা। পাথুরে টানেল, ছাদ খুব নিচু, আধুনিকতার ছোঁয়া বলতে দেয়ালে টিউবলাইট লাগানো আছে। কয়েকটা বাঁক নিয়ে বড় একটা চেম্বারে পৌঁছাল রানা, ভেতরে পাহাড়ের মত উঁচু হয়ে আছে মদের পিপে। পিপেগুলো মান্ধাতা আমলের, অনেক আগেই পচন ধরেছে। টক টক একটা গন্ধ ঢুকল নাকে। তবে পিপেগুলো সব খালি।

চেম্বার থেকে বেরুবার আর কোন দরজা বা টানেল নেই।

দেয়াল হাতড়ে পরীক্ষা করেও গোপন কোন পথের হদিস পাওয়া গেল না।

ফিরতি পথ ধরে আবার শেডে বেরিয়ে এল রানা। এবার ডান দিকের টানেলে ঢুকল। এটাও হুবহু আগেরটার মত, দেয়াল ও সিলিং পাথর বসিয়ে তৈরি। ওগুলোর গায়ে ছোট-বড় অসংখ্য গর্ত আর খাঁজ, সবগুলো পরীক্ষা করা অসম্ভব; ভেতরে যদি বোতাম, হাতল বা লেন্স থাকে, আশ্চর্য হবার কিছু নেই। দু'বার বাঁক ঘোরার পর লোহার একটা দরজা দেখল রানা। টানেলে ঢোকার মুখে ঠিক এই রকম দরজাই দেখেছে—একটাই কবাট, দেয়ালের ভেতর সেঁধিয়ে আছে। দরজা টপকে এল রানা, বিশ গজ সামনে আরেকটা বাঁক দেখা যাচ্ছে। দশ গজের মত এগিয়েছে, কর্কশ ঘড়ঘড় আওয়াজ শোনা গেল। চমকে উঠে ঘাড় ফেরাতেই দেখল, দেয়াল থেকে বেরিয়ে এসে ইস্পাতের কবাট চৌকাঠের আরেক দিকে ঢুকছে।

বন্ধ দরজার কাছে ছুটে ফিরে এল রানা। পরীক্ষা করে বুঝল, এই দরজা ভাঙা কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়, যদি না শক্তিশালী বিস্ফোরক ব্যবহার করা হয়।

কয়েকটা ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে গেল। টানেলে ভিডিও ক্যামেরা আছে, ক্লোজ সার্কিট টিভিতে দেখা যাচ্ছে ওকে। ওই টিভি কন্ট্রোল রূম থেকেই অপারেট করা হচ্ছে ইলেকট্রনিক মেকানিজম সম্বলিত দরজা।

তারমানে ওদের ফাঁদে ধরা পড়েছে ও। উনের হেঁয়ালি অর্থহীন ছিল না। সে জানত রানা এখানে আসতে পারে, আর এলে তাকে বন্ধ দরজার ভেতর আটকে ফেলা হবে। এ থেকে আরেকটা তিক্ত সত্য বেরিয়ে আসে। শিরির রিপোর্ট ওরা বিশ্বাস করেনি।

ফিরে যাবার পথ নেই, রানাকে সামনে এগোতে হলো।

ওকে নিয়ে ভালই খেলা শুরু করেছে প্রতিপক্ষ। ওর পিছনে একে একে আরও তিনটে দরজা বন্ধ হলো।

এবার নিয়ে তৃতীয়বার টানেলের তিন মাথায় এসে দাঁড়াল রানা। এর আগের দু'বার নাক বরাবর সামনের টানেল ধরে এগিয়েছে ও। এবারও তাই করতে যাচ্ছিল, কিন্তু বাধা পেয়ে থমকে দাঁড়াল।

মৃদু শব্দে হাসল কেউ। মেয়েলি কণ্ঠস্বর, চেনা চেনা লাগল। হাসি থামিয়ে কথা বলে উঠল মেয়েটা। 'তুমি শুধু শুধু আমাদের সময় নষ্ট করছ, বড়ুয়া। সামনেরটায় নয়, ডান বা বামদিকের টানেলে ঢোকো।'

ক্যারলিন! লুকানো অ্যাড্রেস সিস্টেম থেকে ভেসে আসছে তার গলা।

নিজেকে অত্যন্ত অসহায় মনে হলেও আচরণে সেটা বুঝতে দিল না রানা, জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কোথায়, ক্যারলিন?'

আবার হাসির শব্দ। 'কোথায় আবার, যেখানে আমার থাকার কথা–লুকাস ইনে।'

'তোমার সঙ্গে আর কে আছে?'

'এখন হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন, বড়ুয়া? যেন মনে হচ্ছে তুমি আমাকে একা পেতে চাও? দুঃখিত, বড়ুয়া, সে সুযোগ তুমি হেলায় হারিয়েছ। কত করে বললাম, আমাকে ডেকো। কিন্তু তুমি আমাকে পাত্তা দিলে না, তার বদলে ফারাহর হাত ধরলে। কাজেই, বড়ুয়া, এখন সেই অপমানের বদলা নেয়ার সময় আমার। মি. জসুাইওর অসীম দয়া, তিনি তোমাকে নিয়ে খেলার একটা সুযোগ দিয়েছেন আমাকে।'

'তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছ না, ক্যারলিন,' বলল রানা।

‘আমি জানতে চাইছি তোমার সঙ্গে আর কে আছে?’

‘তোমার জন্যে একটা অভ্যর্থনা কমিটি গঠন করা হয়েছে, বড়ুয়া। আমাদের বস্ মি. জুসাইওর নেতৃত্বে আমরা সবাই এখানে আছি, এলেই দেখতে পাবে। ডান বা বাম দিকের টানেলটায় ঢুকে পড়ো–তোমার জন্যে আরও অনেক বিস্ময় অপেক্ষা করছে।’

কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। ক্যারলিনের নির্দেশ অমান্য করে করারও কিছু নেই। অগত্যা ডানদিকের টানেলে ঢুকে পড়ল ও।

কিছুদূর যাবার পর আবার একটা তিন মাথায় এসে দাঁড়াল রানা। আবার শোনা গেল ক্যারলিনের গলা। ‘সোজা এসো, বড়ু য়া।’

সোজা পঁচিশ-ত্রিশ গজ এগোবার পর রানা অনুভব করল টানেলের মেঝে ঢালু হয়ে গেছে। একটু পরই সামনে পানি দেখা গেল।

‘ইচ্ছা করলে জিভে নিয়ে পানিটা চেখে দেখতে পারো,’ গায়েবি আওয়াজের মত ভেসে এল ক্যারলিনের সকৌতুক কণ্ঠস্বর। ‘এফবিআই টীমের সদস্যরা চেখেছিল আর কি। নোনা পানি, বড়ুয়া। সাগরের পানি যেমন হয়।’

পানির কিনারায় দাঁড়িয়ে আছে রানা। ‘এটাই কি দ্বিতীয় আন্ডারগ্রাউন্ডে যাবার পথ?’

‘হ্যাঁ, এই পথই তোমাকে তোমার গন্তব্যে পৌঁছে দেবে। এই পথ ধরে এগোলে একে একে কারখানা, বিজ্ঞানীদের কোয়ার্টার, ল্যাবেরেটরি, লুকিয়ে রাখা ট্রিপলহেডার, আন্ডারগ্রাউন্ড লোডিং ফ্যাসিলিটি, মোট কথা সবই তুমি দেখতে পাবে।’

‘আন্ডারগ্রাউন্ড লোডিং ফ্যাসিলিটি?’

‘ট্রিপলহেডার তৈরি করার জন্যে বিপুল পরিমাণ র মেটেরিয়াল দরকার হয়। সে-সব প্রকাশ্যে আমদানি করাটা বোকামি নয়?

ন্যাটো তার স্যাটেলাইটের সাহায্যে লেটিসের ওপর নজর রাখছে, এ তো দিবালোকের মত পরিষ্কার, তাই না? সেজন্যেই বিশেষ ধরনের জাহাজ ব্যবহার করি আমরা। জাহাজে আসা র মেটেরিয়াল প্রকাশ্যে খালাস করা বোকামি। খোলের তলার ঢাকনি খুলে দিয়ে পানিতে ফেলে দেয়া হয়। ওই কার্গো তারপর আন্ডারগ্রাউন্ড প্লাটফর্মে সচল বেল্টে তোলা হয়, ওই বেল্টই টানেলের ভেতর বয়ে আনে সব।'

'বাহ্, সুন্দর ব্যবস্থা। বুদ্ধিটা যারই হোক, প্রশংসা করতে হয়।'

'এই একই পদ্ধতিতে ট্রিপলহেডার সাপ্লাই দেয়া হবে। পানির তলা থেকে জাহাজে তোলা হবে ওগুলো, পানির ওপর থেকে কেউ টেরও পাবে না।'

'আমাকে কি সারারাত এখানে দাঁড় করিয়ে রাখবে তোমরা?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'ধরো, আমি যদি তোমাকে গাইড না করতাম এখন তুমি কি করতে?' জিজ্ঞেস করল ক্যারলিন।

'অন্যান্য টানেল ধরে এগিয়ে দেখতাম কোনও পথ পাওয়া যায় কিনা।'

'সে-সব পথের শেষেও যদি এরকম পানি দেখো, তাহলে?'

'সেক্ষেত্রে পানিতে নেমেই ট্রিপলহেডারের সন্ধান পাবার চেষ্টা করতাম।'

'এফবিআইও তাই করেছিল, বড়ুয়া,' বলল ক্যারলিন। 'পানির নিচে সিঁড়ির ধাপ পায় তারা। ধাপগুলো দুই মানুষ সমান নিচে নেমে গেছে। তারপর একটা ল্যান্ডিং। ওই ল্যান্ডিং থেকে আরেক প্রস্থ সিঁড়ি ক্রমশ ওপর দিকে উঠে গেছে। দ্বিতীয়বার ওরা ডাইভার নিয়ে এসেছিল। পানিতে ডোবা ল্যান্ডিং, ধাপ, দু'পাশের দেয়াল তন্নতন্ন করে সার্চ করেছে। কিন্তু কিছুই পায়নি।'

‘ঠিক কি বোঝাতে চাইছ তুমি?’

‘বোঝাতে চাইছি, আমরা না চাইলে নিজের চেষ্টায় কারও পক্ষেই ট্রিপলহেডারের কাছে পৌঁছানো সম্ভব নয়। এ প্রসঙ্গ থাক। তুমি চলে এসো।’

ক্যারলিন থামতেই পানির ওপর পাথরের ছাদ ফাঁক হয়ে গেল কর্কশ ঘড়ঘড় শব্দে। সেই ফাঁক থেকে আট-দশটা অজগর নেমে এল নিচে। সাপ নয়, সাপের মত দেখতে মোটা রাবার পাইপ। বুঝতে অসুবিধে হলো না, টানেলের পানি পাম্পের সাহায্যে টেনে নেয়া হচ্ছে।

খুব অল্প সময় লাগল, মাত্র তিন মিনিটেই ল্যান্ডিংসহ দুই প্রস্থ সিঁড়ি উন্মুক্ত হয়ে পড়ল। ক্যারলিন কি বলে শোনার অপেক্ষায় না থেকে ধাপ বেয়ে নামতে শুরু করল রানা।

ইতিমধ্যে পাইপগুলো অদৃশ্য হয়ে গেছে, সিলিংটাও জোড়া লেগে গেছে আবার।

‘বস্ কোত্থেকে কি জানতে পেরেছেন বলতে পারব না,’ আবার মুখ খুলল ক্যারলিন, ‘তাঁর ধারণা, তুমি নাকি অসম্ভব বুদ্ধিমান। তো একটা পরীক্ষা হয়ে যাক, কি বলো? বলো দেখি, পানি সরে যাবার পর এখন কি ঘটবে? কিভাবে তোমাকে আমরা দ্বিতীয় আন্ডারগ্রাউন্ডে নিয়ে আসব?’

এক সেকেন্ড চিন্তা করল রানা, তারপর বলল, ‘আমার ধারণা পানি আসলে ধোঁকা দেয়ার একটা উপকরণ। যেহেতু পানি আছে, এফবিআই তাই পানিতেই গোপন পথ খুঁজেছে। ওদের জায়গায় আমি হলেও তাই খুঁজতাম। তবে পানিতে কিছু না পেয়ে ওরা যেমন হাল ছেড়ে দিয়েছে, আমি তা দিতাম না।’

‘ঠিক কি বলতে চাও?’

‘সবাই জানে আন্ডারগ্রাউন্ড মানেই নিচের দিক,’ বলল রানা।

‘তবে অনেকের মাথাতেই এটা ঢোকে না যে ওপর দিক হয়েও নিচের দিকে নামা যায়। আমি বলতে চাইছি, সিলিং বা ছাদ হয়েই ট্রিপলহেডারের কাছে যাওয়া যায়।’

জবাব দিতে এক মুহূর্ত দেরি করল ক্যারলিন। ‘উত্তর দিলে তুমি, আর সেই উত্তর শুনে বসের প্রতি আমার শ্রদ্ধা আরও কয়েকগুণ বেড়ে গেল।’ সে থামতেই আবার কর্কশ শব্দে দু’ফাঁক হলো ল্যান্ডিঙের ওপরকার পাথর, এবার সেখান থেকে ঝুলে পড়ল ঝকঝকে ইস্পাতের একটা মই।

মই বেয়ে উঠছে রানা। সুইমিং ট্রাঙ্ক-এর ওয়েস্টব্যান্ডে গোঁজা ওর পিস্তলটা মইয়ের ধাপের সঙ্গে একবার বাড়ি খেতে টং করে ধাতব শব্দ হলো। কোন মন্তব্য নয়, ক্যারলিনের মৃদু হাসির শব্দ শুনতে পেল রানা।

বাইশটা ধাপ বেয়ে একটা চেম্বারে উঠল রানা। মই নিজে থেকেই নেমে গেল। নিচ থেকে ভেসে এল ঘড়ঘড় আওয়াজ। উঁকি দিয়ে শ্যাফটের ভেতর পাথরের মেঝে ছাড়া আর কিছু দেখল না রানা।

চেম্বারটা আলোকিত। এক সেট সোফা আছে। একটাই দরজা, দরজার বাইরে বাদামী কার্পেট ফেলা চওড়া করিডর। চেম্বার থেকে বেরিয়ে হাঁটার সময় করিডরের মেঝেতে, দেয়াল ঘেঁষে, গ্রিল দিয়ে ঘেরা এয়ার ডাক্ট দেখতে পেল রানা, পাশ কাটানোর সময় ঠাণ্ডা বাতাস লাগল গায়ে। করিডরের তিন মাথায় এসে সরাসরি সামনে একটা দরজা দেখল রানা, তাতে সাদা প্লাস্টিক হরফে লেখা—‘ডেভিল’স রূম, ওয়ানওয়ানথ্রী’। করিডরের বাকি দু’দিকের দেয়ালেও পাশাপাশি এরকম আরও অনেক দরজা রয়েছে, প্লাস্টিক হরফে একই কথা লেখা, শুধু নম্বরগুলো আলাদা।

ওয়ানওয়ানথ্রী-র হাতল ধরে ঘোরাল রানা। ডেভিল’স রূম

অর্থাৎ শয়তানের কামরাটা বড় আকৃতির এলিভেটর বলে মনে হলো ওর। তবে দেয়ালে বোতাম-টোতাম কিছু নেই। ভেতরে ঢুকতেই দরজা বন্ধ হয়ে গেল। হাতল ধরে মোচড়াতেও সেটা আর ঘুরল না। একদিকের দেয়ালে কাঁচ মোড়া একটা শেলফ রয়েছে, ভেতরে এক সেট এয়ারফোন, পাশেই দেশলাই আকৃতির একটা রিমোট কন্ট্রোল যন্ত্র। কাঁচের দরজা খুলে এয়ারফোনটা পরল রানা। সঙ্গে সঙ্গে ক্যারলিনের হাসি শোনা গেল।

'হাসছ কেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'হাসছি এই জন্যে যে মি. লুকাস ডেভেনপোর্ট ট্রিপলহেডার তৈরি করার জন্যে কয়েক বিলিয়ন ডলার খরচ করেছেন, অথচ মিসাইলের যতটা কাছাকাছি তুমি আসতে পারলে এতটা কাছে আসার সৌভাগ্য তাঁর হয়নি।'

'সেজন্যে অবশ্যই জুসাইওর বিশ্বাসঘাতকতা দায়ী, তাই না?'

কয়েক সেকেন্ড নিশ্চুপ থাকার পর ক্যারলিন বলল, 'তোমার এই প্রশ্নের উত্তর দেবেন বস্ স্বয়ং। দেখা তো হচ্ছেই!'

কামরাটার চারদিকে চোখ বোলাল রানা। 'বলছ ট্রিপলহেডারের কাছে চলে এসেছি–কিন্তু কই, আমি তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।'

'কাছে মানে তোমার নাগালে, বড়ুয়া,' বলল ক্যারলিন। 'হাত বাড়ালেই ছুঁতে পারবে। মেঝের কার্পেট খানিকটা সরাও, দেখে বলো কি ওটা। ভাল কথা, তুমি এখন কোথায় রয়েছ জানো কি? ব্ল্যাকহোলে হোটেল কমপ্লেক্সের যে পিলারগুলো দেখে এসেছ, তারই একটার সরাসরি নিচে।'

কার্পেটের একটা কোণ ধরে টান দিল রানা। নিচে কাঁচের মেঝে, ভেতরে উজ্জ্বল আলো, সেই আলোয় গোল পিরিচ আকৃতির ইস্পাতের একটা কাঠামো দেখতে পেল ও। জিনিসটা প্রকাণ্ড,

কিনারায় পাশাপাশি অনেকগুলো খোপ বা গর্ত রয়েছে, একেকটা গর্তে একসঙ্গে দুজন মানুষ অনায়াসে ঢুকতে পারবে। রানা গুনল না, জানে মোট দশটা গর্ত আছে। পিরিচ বা সসারটা আসলে মিসাইল ক্যারিয়ার।

'ভিনগ্রহের সসার সম্পর্কে জানো তুমি। তবে সেটা শুধু গল্পই। আমরা গল্পটাকে বাস্তবে রূপ দিয়েছি। কৃতিত্বটা অবশ্য আমাদের বিজ্ঞানী সৈয়দ মনিরুল হকের। তিনিই এই সসারের ডিজাইন তৈরি করেছেন। এই সসার উড়তে পারে, বড়ুয়া। প্লেন থেকে ছেড়ে দিলে শাঁ-শাঁ করে এক লাখ ফুট ওপরে উঠে যাবে।'

'এটা তো শুধু ক্যারিয়ার,' বলল রানা। 'ট্রিপলহেডার কই?'

'ট্রিপলহেডার তোমার মাথার দিকে,' বলল ক্যারলিন। সে থামতেই সিলিংটা নিঃশব্দে ফাঁক হয়ে গেল। 'শেলফে একটা রিমোট কন্ট্রোল যন্ত্র আছে,' আবার বলল ক্যারলিন। 'একশো তেরো নম্বর বোতামে চাপ দিলে একটা মই নেমে আসবে। ওই মই বেয়ে সোজা উঠে যাও, বড়ুয়া। আশা করি আজ রাতে ব্ল্যাকহোলে দেখা কংক্রিট পিলারগুলোর কথা তুমি ভুলে যাওনি। এই মুহূর্তে ওই পিলারগুলোর একটার গোড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছ তুমি। ইচ্ছে করলে ওপরে এসে ভেতরে ঢুকে দেখে আসতে পারো ট্রিপলহেডার ক্ষেপণাস্ত্র ঠিক কি রকম দেখতে।'

'ধন্যবাদ,' বলল রানা। 'মিসাইল আমি আগেও দেখেছি, কাজেই আগ্রহ বোধ করছি না।' শেলফ থেকে রিমোট কন্ট্রোল যন্ত্রটা বের করে সুইমিং ট্রাঙ্ক-এর ওয়েস্টব্যান্ডে গুঁজে রাখল।

'সেক্ষেত্রে এয়ারফোন খুলে রেখে করিডরে বেরিয়ে এসো।'

এবার দরজার হাতল ঘুরল। করিডরে বেরিয়ে আসতে অ্যাড্রেস সিস্টেম থেকে ক্যারলিন পথ নির্দেশ দিল, তিনটে বাঁক ও চারটে দরজা পেরিয়ে বড়সড় একটা কামরায় হাজির হলো রানা।

একদিকের দেয়ালে পাশাপাশি অনেকগুলো টিভি দেখা যাচ্ছে, প্রতিটির সামনে বসে আছে একজন করে কোরিয়ান অপারেটর, তাদের সামনে একটা করে মিনি কমিউনিকেশন সিস্টেম। টিভির স্ক্রীনে ফুটে আছে আন্ডারগ্রাউন্ড স্থাপনার প্রতিটি ইঞ্চি। বুঝতে অসুবিধে হলো না, এই কন্ট্রোল রূম থেকেই টানেলের দরজা, রাবার পাইপ, মই ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করা হয়। ক্যারলিন যেখানেই থাকুক, রেডিও ফোনের মাধ্যমে সারাক্ষণ কন্ট্রোল রূমের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে সে। অপারেটরদের সবার কানেই ইয়ারফোন দেখল রানা।

করিডর হয়ে পাশের কামরায় ঢুকল ও। এই কামরায় ঢোকার পর কারখানায় না গেলেও চলে, কারণ পুরো কারখানাটাই ভাগ ভাগ হয়ে বিভিন্ন মনিটরে ধরা পড়ছে। কমপিউটার আর টিভি স্ক্রীনে ঠাসা জায়গাটা। মনিটরে দেখলেও কারখানার বিশালত্ব আন্দাজ করতে অসুবিধে হলো না। ক্যারলিন জানাল, একই ছাদের নিচে তিনশো সত্তরজন টেকনিশিয়ান একসঙ্গে কাজ করছে। রীতিমত বড় মাপের একটা মেশিনটুলস ফ্যাক্টরি বললেই হয়। মনিটরে দেখে ঠিক বোঝা গেল না লেবার আর টেকনিশিয়ানরা বন্দী কিনা। সংখ্যায় কোরিয়ানই বেশি, তবে দু'রঙের আমেরিকানও আছে–কালো ও সাদা। লেবাররা নীল ইউনিফর্ম পরা, টেকনিশিয়ানরা পরেছে সাদা ওভারঅল। সাদা সুট পরা কয়েকজন বিজ্ঞানীকেও ঘোরাফেরা করতে দেখা গেল মনিটরে। তাদের মধ্যে সৈয়দ মনিরুল হক যদি থাকেনও, রানা চিনতে পারছে না।

মনিটর রূম থেকে আবার করিডরে বেরিয়ে এল রানা। গ্রিল দেয়া এয়ার ডাক্ট এখানেও চোখে পড়ল।

ক্যারলিন বলল, 'তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ, বড়ুয়া, রাত

জেগে তোমাকে এত সব দেখানোর পেছনে মি. জুসাইওর একটা উদ্দেশ্য আছে?'

'পারছি বৈকি।'

'এখন তাহলে কি দেখতে চাও বলো। মি. জুসাইও চাইছেন আমাদের কিছুই যেন তোমার কাছে গোপন না থাকে।'

'বিজ্ঞানীদের কোয়ার্টারটা দেখতে চাই,' বলল রানা। 'যদি সম্ভব হয় তাঁদের সঙ্গে কথাও বলতে চাই–বিশেষ করে মি. ডেভেনপোর্টের বন্ধু এবং তাঁর প্রধান বিজ্ঞানী সৈয়দ মনিরুল হকের সঙ্গে।'

জবাব দিতে এক সেকেন্ড দেরি করল ক্যারলিন। 'দুঃখিত, বড়ুয়া। বিজ্ঞানীদের কোয়ার্টার তুমি দেখতে পাবে, কিন্তু ওঁদের কারও সঙ্গে কথা বলা এই মুহূর্তে সম্ভব নয়। তাঁরা প্রায় সবাই ঘুমাচ্ছেন। জুনিয়র বিজ্ঞানী দু'একজন যারা জেগে আছেন তাঁরা সবাই কারখানায় ব্যস্ত।'

'আমার দুর্ভাগ্য।'

'এখন তোমাকে মি. জুসাইওর সামনে হাজির করা হবে,' বলল ক্যারলিন। 'তবে তার আগে এখানে এসে কি দেখবে তুমি সে-সম্পর্কে একটা ধারণা দিতে চাই।'

রানা অপেক্ষা করছে।

'এখানে রেমো খেং রয়েছে। ব্ল্যাকহোল গার্ডদের লীডার সে। তোমার বিরুদ্ধে তার অভিযোগ অত্যন্ত গুরুতর। খেং বলছে, তুমি তার নয়জন গার্ডকে খুন করেছ। আহত হয়েছে আরও আটজন। সে তোমার বিরুদ্ধে মি. জুসাইওর কাছে বিচার দিয়েছে।

'আর আছে ফারাহ, তোমার দুর্বলতা। সে কসম খেয়ে বলছে তোমার পরিচয়, উদ্দেশ্য ইত্যাদি সম্পর্কে কিছুই সে জানত না। বলছে, আজই জানতে পেরেছে তুমি নাকি লুকাস ডেভেনপোর্টের

এজেন্ট। তার ধারণা সাগরে লাফ দিয়ে পালাতে চেষ্টা করো তুমি, এবং স্রোতের টানে ভেসে যাও। তার এ-সব কথার সত্যতা অবশ্যই যাচাই করা হবে।

'করিডর ধরে সামনে এগোও, বুড়য়া। দু'বার ডানদিকে বাঁক নেয়ার পর একটা এলিভেটর পাবে, ওই এলিভেটর তোমাকে লুকাস ইনে তুলে আনবে। এলিভেটর থেকে বেরুলে একটা রোব দেয়া হবে তোমাকে, ওটা গায়ে জড়িয়ে নিজেকে প্রেজেন্টেবল করে নিয়ো। তোমাকে সার্চ করার কোন প্রয়োজন দেখি না, তবে ওয়েস্টব্যান্ডে গোঁজা পিস্তলটা হাতছাড়া করতে হবে। ঠিক আছে?'

কথা না বলে রানা শুধু মাথা ঝাঁকাল।

নির্জন করিডর পার হয়ে এসে এলিভেটরে চড়ল রানা। নিজের সঙ্গে তর্ক চলছে ওর। উপসংহার দাঁড়াল, এভাবে ফাঁদে পা দেয়াটা বোকামি হয়ে গেছে কিনা তা বলার সময় এখনও আসেনি। তাছাড়া, এও একটা কৌশল বটে যে বিষাক্ত সাপকে ধরতে হলে অনেকসময় গর্তে হাত ঢোকাতে হয়। কাজেই ছোবল খেলেই কৌশলের দোষ দেয়া ঠিক নয়।

নিজেকে রানা প্রশ্ন করল, সেটআপটা কি বলে, এখান থেকে জান নিয়ে পালানো সম্ভব?

না।

মন্দের ভাল হিসেবে, নিজে না বাঁচতে পারলেও, শিরি আর মনিরুল হককে কি বাঁচানো যায়?

না।

তারমানে কি আমান মোহাম্মদ সহ বাকি ছয়জন সন্ত্রাসী লীডার নির্বিঘ্নে পালিয়ে যাবে?

হ্যাঁ।

আর লুকাস ডেভেনপোর্ট? তাঁকেও কি মরতে হবে?

হ্যাঁ।

ঠিক আছে, মরো তাহলে! তবে অন্তত একটা ভাল কাজ করে মরো। জুসাইওকেও সঙ্গে নিয়ে যাও!

ঠিক আছে। চেষ্টা করব।

এগারো

এক সময় থামল এলিভেটর। দরজা খুলে যাচ্ছে, সামনে বাদামী সুট পরা স্মার্ট দুই শ্বেতাঙ্গ তরুণকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল রানা। ওকে অবাক করে দিয়ে সসম্মানে মাথা নোয়াল তারা, দু'জনেই এক পা করে পিছিয়ে এলিভেটর থেকে বেরুবার জায়গা করে দিল। ওদের মধ্যে একজন মারটিন। সে-ই মার্জিত ভঙ্গিতে বলল, 'আপনার পিস্তলটা, প্লীজ!'

সুইমিং ট্রাঙ্কের ওয়েস্টব্যান্ড থেকে পিস্তলটা বের করে তার হাতে ধরিয়ে দিল রানা। বাক্স খুলে একজোড়া নতুন স্যান্ডেল রাখল মারটিন ওর পায়ের সামনে।

মারটিনের সঙ্গী মেরুন রঙের পাতলা মখমলের একটা রোব বাড়িয়ে দিয়ে সবিনয়ে বলল, 'প্লীজ, মি. বড়ুয়া!'

স্যান্ডেল পরে রোবটা নিয়ে গায়ে জড়াল রানা। ওয়াটারপ্রুফ রিস্টওয়াচে চোখ বোলাল। তিনটে বাজতে চলেছে। সারারাত জেগে প্রাণের দুশমনকে জামাই আদর করছে ওরা, লক্ষণ হিসেবে এটাকে ভাল বলে মেনে নিতে পারছে না ও। বলল, 'জুসাইওর কাছে নিয়ে চলো আমাকে।'

'আসুন, স্যার, এদিকে,' পথ দেখাল মারটিনের সঙ্গী।

করিডর ধরে এগোল ওরা। মারটিন রানার পিছনে থাকল। রানা আন্দাজ করল, ওরা লুকাস ইনে রয়েছে। করিডরে লাল

গালিচা পাতা। তবে দু'পাশের দরজায় কোন নম্বর নেই।

একটা বাঁক ঘোরার পর এক প্রস্থ সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে হলো। সিঁড়ির মাথায় আরও দু'জন বাদামী সুট পরা তরুণ দাঁড়িয়ে আছে। কোন কথা হলো না, শুধু মাথা ঝাঁকাল তারা, একপাশে সরে গিয়ে পথ করে দিল।

আবার একটা করিডর। গালিচার রঙ এখানে ঘিয়ে। দু'পাশে কোন দরজা নেই। নাক বরাবর সামনে একটাই দরজা। নকশা কাটা দামী কাঠের দরজা, দু'পাশে ফুলের টব। দরজার হাতল সোনালি।

হাতলটা ধরে নাড়ল মারটিন। 'মি. জুসাইওকে বলো উনি পৌঁছেছেন।'

ভেতর থেকে জবাব এল। 'এক মিনিট অপেক্ষা করতে হবে।'

উত্তরটা যেন প্রত্যাশিত নয়, মারটিন আর তার সঙ্গী নিঃশব্দে দৃষ্টি বিনিময় করল।

এক মিনিট পর ভেতর থেকে বলা হলো, 'দরজার সামনে থেকে সরে দাঁড়ান।'

দুই তরুণকে হতভম্ব দেখাল। তবে রানাকে নিয়ে দ্রুত এক পাশে সরে এল তারা।

দরজা খুলে গেল। রানাকে অবাক করে দিয়ে ভেতর থেকে বেরিয়ে এল শিরি। তার চঞ্চল দৃষ্টি মুহূর্তেই খুঁজে নিল রানাকে। তার সেই দৃষ্টিতে কাতর অনুনয় আছে, আরও আছে কি যেন একটা ইঙ্গিত—মখমলের রোব ভেদ করে শিরি যেন দেখে নিতে চাইল সুইমিং ট্রাঙ্কটা এখনও রানা পরে আছে কিনা। কোন কথা হলো না। করিডর ধরে একাই চলে গেল সে।

ইতিমধ্যে দরজা আবার বন্ধ হয়ে গেছে। রানাকে নিয়ে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছে মারটিন আর তার সঙ্গী। আরও প্রায়

একমিনিট পর দরজা খুলে বেরিয়ে এল লী সুং, তার পিছু নিয়ে বেরুল রেমো খেং আর তার দুই সঙ্গী। রানাকে চিনতে পেরে খেং-এর চোখ দুটো যেন দপ করে জ্বলে উঠল। থামতে গিয়েও কি মনে করে থামল না, সুং-এর পিছু নিয়ে চলে গেল।

বন্ধ দরজা আবার খুলল। ভেতরে একজন সশস্ত্র গার্ডকে দেখা গেল। বাইরে মুখ বের করে সে বলল, 'আসুন, স্যার। মি. জুসাইও আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন।'

কেউ সঙ্গী হলো না, চৌকাঠ পেরিয়ে একটা অ্যান্টিরূমে ঢুকল রানা। সামনে আরেকটা দরজা, সেটা খুলে একপাশে সরে দাঁড়াল গার্ড।

অ্যান্টিরূম থেকে বেরিয়ে হকচকিয়ে গেল রানা। এরকম একটা প্রকাণ্ড হলরূম দেখতে পাবে বলে আশা করেনি ও। প্রথমেই নজর কাড়ল উঁচু মঞ্চটা। আকারে সেটা এত বড়, একশোজনের একটা দল অনায়াসে একসঙ্গে কনসার্ট বাজাতে বা বলড্যান্স করতে পারবে। গোটা মঞ্চ এবং পিছনের পর্দা গেরুয়া রঙের কাপড়ে মোড়া। ফার্নিচার বলতে মঞ্চের মাঝখানে একটা সিংহাসন, সিংহাসনের সামনে নীল গদি মোড়া এক সেট সোফা। সোফাগুলো খালি। সিংহাসনটা সোনালি, হয়তো সোনা দিয়েই তৈরি করা হয়েছে। ওটার পিছনে এবং একপাশে বসে বা দাঁড়িয়ে রয়েছে ক্যারলিন, কানে ইয়ারফোন।

জায়গাটা থিয়েটার হলের মত দেখতে, তবে মঞ্চের নিচে দর্শকদের বসার কোন আয়োজন নেই। মেঝেটা মোজাইক করা, এত চকচকে যে পায়ে নতুন স্যান্ডেল থাকায় রানার ভয় হলো হড়কে না যায়।

হঠাৎ করেই চোখে পড়ল সিংহাসনে কেউ বসে আছে। লোকটার গলায় ও কাঁধে জ্যান্ত কি যেন একটা নড়াচড়া করছে।

মঞ্চ থেকে কয়েকটা ধাপ নেমে এসেছে মেঝেতে। সেদিকে এগোচ্ছে রানা, সিংহাসন ত্যাগ করে এগিয়ে এল জুসাইও–সাদর অভ্যর্থনার ভঙ্গিতে একটা হাত সামনে বাড়িয়ে দিয়েছে, অপর হাতটা ব্যস্ত গলা পেঁচিয়ে থাকা একটা কালো সাপকে সামলাতে। কাছ থেকে দেখে রানা উপলব্ধি করল, এ কোন সাধারণ লোক নয়। বিশ্বাস করতে কষ্ট হলো, লোকটা এক সময় লুকাস ডেভেনপোর্টের ম্যানেজার ছিল। ঝাড়া ছ'ফুট লম্বা, সুঠাম স্বাস্থ্য, চেহারায় সন্ন্যাসীসুলভ কমনীয়তা। চলাফেরা ও অঙ্গচালনায় উপচে পড়া বিনয় আর কৃপা ভিক্ষার ভাব। পরনে এক খণ্ড গেরুয়া বসন, আলখেল্লার ঢঙে গায়ে জড়ানো। কোন অলংকার ব্যবহার করেনি, এমনকি ঘড়ি বা আঙটিও নেই। আলখেল্লার ভেতর কোন অস্ত্র আছে বলেও মনে হলো না। ভরাট কণ্ঠস্বর, মার্জিত বাচনভঙ্গি, বিশুদ্ধ ইংরেজি। 'আমার পরম সৌভাগ্য আপনার সঙ্গে মিলিত হবার সুযোগ পেলাম, মি. মাসুদ রানা।' করমর্দনের জন্যে ডান হাতটা আরও একটু বাড়িয়ে দিল সে।

নিজের নামটা ঘুসির মত আঘাত করল রানাকে। তবে এ আঘাত না পেলেও জুসাইওর বাড়ানো হাতটা এড়িয়ে যাওয়া কঠিন হত, কারণ তার চোখ দুটো প্রায় সম্মোহিত করে ফেলেছে ওকে।

হ্যান্ডশেইক শেষ করে রানার কাঁধে হাত রাখল জুসাইও, পথ দেখিয়ে একটা সোফায় বসতে অনুরোধ করল। রানা বসার পর ফিরে এসে নিজের সিংহাসনে বসল সে। গলা পেঁচিয়ে থাকা সাপ মাঝে মধ্যেই গেরুয়া বসনের ভাঁজে মুখ ঢুকিয়ে দিচ্ছে, নরম হাতে বারবার সেটাকে বের করে আনতে হলো, চোখে-মুখে বিরক্তির লেশমাত্র নেই। রানার দিকে তাকিয়ে সবিনয়ে হাসল সে, বলল, 'জানি, আপনার মনে অনেক প্রশ্ন। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন মাত্র দুটো। কিভাবে আপনার পরিচয় জানলাম, আর আপনাকে

এত সম্মান দেখাচ্ছি কেন। ভাল কথা—অসময়ে মদ্যপান তো করেন না, কফি বা ঠাণ্ডা কিছু চলবে?'

মাথা নাড়ল, না।

'তাহলে সরাসরি প্রসঙ্গেই চলে আসি, মি. রানা,' বলল জুসাইও। 'আপনিও জানেন, এসপিওনাজ জগৎ এখন অনেক বিস্তৃত হয়ে পড়েছে। ক্রাইম ও পলিটিকাল এসপিওনাজে মাসুদ রানা নামটা কিংবদন্তীর পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। আমি আপনার মত অত নাম করতে না পারলেও, ইন্ডাসট্রিয়াল এসপিওনাজে আমার অর্জনও কম নয়। গার্ডস করপরেশনে আমাকে ঢোকানো হয়েছিল স্যাবটাজ করানোর জন্যে, কিন্তু তা আমি করিনি, তার বদলে করপরেশনের সমস্ত কৃতিত্ব আমি আত্মসাৎ করেছি। আমাকে ভুল বুঝবেন না, মি. রানা। আত্মসাৎ ও চুরি সমার্থক হলেও, আমার ক্ষেত্রে তা নয়। আমার একটা আদর্শ আছে, আছে মহৎ একটা লক্ষ্য। বিশ্বাস করুন, আমি মানবজাতির কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করেছি। এবং নির্ভেজাল সত্যি কথা হলো, এই কাজে আপনি, মাসুদ রানা, আমাকে অনুপ্রাণিত করেছেন।

'এসপিওনাজ জগতে আছি বলেই, এ-জগতের নায়করা কে কোথায় কি করছে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানতে চেষ্টা করি। এ আমার অনেকদিনের পুরানো একটা অভ্যাস। তথ্যের জন্যে যেখানে হাত বাড়াই, বারবার শুধু আপনার প্রসঙ্গই উঠতে দেখি। ক্রিমিনালদের বিরুদ্ধে লড়াই করছেন, অথচ লোকে বলে আপনার মনটা বড় কোমল। বিপদগ্রস্ত মানুষ সাহায্য চেয়ে পায়নি, আপনার ক্ষেত্রে এরকম ঘটনা কখনও ঘটেনি। দরিদ্র বহু মানুষকে আপনি গোপনে আর্থিক সাহায্য করেন। নিজের পরিচয় প্রকাশ না করে অসংখ্য দাতব্য প্রতিষ্ঠানে আপনি মোটা অঙ্কের চাঁদা দেন। শুধু কি তাই? ক্ষমতার ভারসাম্য যতটা সম্ভব বজায় রাখার জন্যে আপনি কখনও

রাশিয়াকে এক হাত দেখিয়ে দেন, আবার আমেরিকার গালে চড় মারতেও ছাড়েন না। সংক্ষেপে, এ-সব শুনে কখন বলতে পারব না আমি আপনার একজন অন্ধ ভক্ত হয়ে পড়লাম। সেই থেকে আপনার দ্বারা আমি অনুপ্রাণিত হচ্ছি।

'আপনি আমার গুরু হলেও, শিষ্য হিসেবে আপনাকে ছাড়িয়ে যাবার একটা গোপন আকাঙ্ক্ষা আমার ভেতর প্রথম থেকেই ছিল। গার্ডস করপরেশনের বিজ্ঞানীরা ট্রিপলহেডার তৈরির ক্ষেত্রে ব্রেকথ্রু করার পরই সুযোগটা দেখতে পাই আমি। মনে মনে প্ল্যান করতে থাকি, গার্ডস করপরেশনের অর্জন কিভাবে আত্মসাৎ করা যায়। যারা স্যাবটাজ করানোর জন্যে আমাকে গার্ডস করপরেশনে ঢুকিয়েছিল, তাদের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করি আমি। কারণ, ট্রিপলহেডার হাতে পেলে নিজেদের অসৎ উদ্দেশ্য পূরণের কাজে ব্যবহার করবে তারা। কিন্তু আমি চাই ক্ষমতার ভারসাম্য এনে দুনিয়ার বুকে স্বাধীনতা আর শান্তির সুবাতাস বইয়ে দিক এই ট্রিপলহেডার।

'লুকাস ডেভেনপোর্ট চেয়েছেন, ট্রিপলহেডার তিনি যুক্তরাষ্ট্রের কাছে বিক্রি করবেন। আপনিই বলুন, তেলা মাথায় তেল দেয়ার কোন মানে হয়? আমেরিকার যে নিউক্লিয়ার ফায়ার পাওয়ার, আমাদের এই গ্রহটাকে অন্তত পাঁচশো বার ধ্বংস করতে পারবে। ট্রিপলহেডার হাতে পেলে আরও অনেক কম খরচে কাজটা করতে পারবে ওরা। এ-কথা রাশিয়া ও চীন, ব্রিটেন ও ফ্রান্স সম্পর্কেও কমবেশি সত্যি। তাই সিদ্ধান্ত নিলাম, ট্রিপলহেডার আসলে কোন রাষ্ট্রকেই আমি দেব না।

'মি. রানা, আপনি একজন মুক্তিযোদ্ধা। বাঙালীরা ভাগ্যবান, কারণ তারা মাত্র নয় মাসেই স্বাধীনতা পেয়ে গেছে। কিন্তু কাশ্মীরীদের কথা ভাবুন, ভাবুন মধ্যপ্রাচ্যের ফিলিস্তিনী, শ্রীলংকার

তামিল, আসামের উলফা, আরাকানের রোহিঙ্গা, ফিলিপাইনের সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলমান, আমেরিকার নিগ্রো সম্প্রদায়, বলকানের আলবেনিয়ানদের কথা। ওরা স্বাধীনতার জন্যে লড়ছে, মি. রানা। আমার আপনার সবার উচিত ওদেরকে সাহায্য করা।

'এটাই আমার আদর্শ। মুক্তিকামী মানুষকে সাহায্য করা। দুই কোরিয়াকে এক করার স্বপ্নও আমি দেখি, মি. রানা। আমি চাই তাইওয়ানকে যেন বেজিং কোনভাবেই গিলে না ফেলতে পারে। এখন আপনিই বলুন, ট্রিপলহেডার থেকে আমেরিকাকে বঞ্চিত করাটা কি আমার অন্যায় হয়ে গেছে?'

'আমার মতামতের কি কোন গুরুত্ব আছে?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'যদি বলি যার জিনিস তাঁকে সব বুঝিয়ে দিয়ে পালিয়ে যান, আপনি কি পালাবেন?'

'বেশ বুঝতে পারছি, আপনি আমার সঙ্গে কৌতুক করছেন,' বলে হেসে উঠল জুসাইও। 'শিষ্যের সঙ্গে রসিকতা করা আপনার মত গুরুকেই মানায়। পালাবার কথা যখন উঠলই, তাহলে এ প্রসঙ্গে দু'একটা কথা বলি। বিশ্বাস করুন, আমি কোন বিপদের মধ্যে নেই, ভবিষ্যতেও কোন বিপদে পড়ব না, তাই পালাবার প্রশ্ন কখনও উঠবে না। মার্কিনীদের ঘরের পাশে বসে তাদেরকে বুড়ো আঙুল দেখাচ্ছি, বলুন তো কোন জাদুবলে? সিআইএ আর এফবিআই কি যা-তা ব্যাপার? অথচ তারা ধরতেই পারছে না কোথায় আমি ট্রিপলহেডার তৈরি করছি, কাদের কাছে বিক্রি করছি। সত্যি কি তাই? কিছুই ওরা জানে না?'

রানা অপেক্ষা করছে।

'কাকে কিভাবে তুষ্ট করতে হয় আমি তা জানি, মি. রানা, স্যার। আগেই আপনাকে বলেছি, এসপিওনাজ জগতের নায়কদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা আমার একটা পুরানো হবি। এই শখ

মেটাবার সূত্র ধরে তাদের অনেকের সঙ্গে পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা জন্মেছে। তাতে লাভ হয়েছে এই যে অনেকেরই দুর্বলতা সম্পর্কে আমরা জানি। ফলে তারা ঘুষ খেয়ে আমার সঙ্গে সহযোগিতা করতে উৎসাহ বোধ করে। লেটিসে বারবার তল্লাশী চালিয়েও কিছু না পাওয়ার এই হলো রহস্য।'

'বুঝলাম। এবার তাহলে ব্যাখ্যা করুন, আমাকে এত খাতির করার কি কারণ? বিশেষ করে আমার হাতে এতগুলো লোক বোকার মত মারা যাওয়ার পরও?'

'বৃহত্তর স্বার্থে ক্ষুদ্রতর স্বার্থ বিসর্জন দিতে হয়, স্যার!' হাসিমুখেই বলল জুসাইও। 'তখনও আমি জানি না যে আপনিই আমার গুরু মাসুদ রানা, তাই মিস ফারাহকে দায়িত্ব দিলাম আপনার কাছ থেকে কথা বের করার। আপনি ফারাহকে নিয়ে ব্ল্যাকহোলে গেলেন, গিয়ে এমন তেলেসমাতি কাণ্ড ঘটিয়ে বসলেন, একাই যেন একশো! রিপোর্ট পেয়ে আমার সন্দেহ হলো। অফিসে বসে দুনিয়ার চারদিকে খোঁজ নিলাম। এর আগে আপনার সম্পর্কে খবর নিয়েছে সিজার, আমার ইন্টেলিজেন্স চীফ। তার ধারণা আপনি নরেশ বড়ুয়াই। সে যে-সব সূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছে সেগুলো এড়িয়ে গেলাম আমি। যোগাযোগ করলাম কেজিবি, সিআইএ, জার্মান ইন্টেলিজেন্স, ফ্রেঞ্চ ইন্টেলিজেন্স আর ভারতীয় র-র সঙ্গে। খবর এল, নরেশ বড়ুয়া বাস্তব চরিত্র, তবে আসামে তাকে সম্প্রতি অনেকেই দেখেছে। তারপর খবর এল, কেউ বলতে পারছে না আমার গুরু মাসুদ রানা কোথায়। সিআইএ-এর একজন এজেন্ট জানাল, একহপ্তা আগে মায়ামী সৈকতে দেখা গেছে আপনাকে, এক বাচ্চা ছেলেকে ঘুড়ি কিনে দিচ্ছিলেন। দুইয়ে দুইয়ে চার মিলে যেতে পরম করুণাময়ের প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করলাম, বুঝলাম ঈশ্বর চাইছেন মানব জাতির

কল্যাণে গুরু ও শিষ্য একসঙ্গে কাজ করি।’

‘অর্থাৎ আমাকে একটা প্রস্তাব দেবেন আপনি। আমাকে আপনার হয়ে কাজ করতে হবে, বিনিময়ে মোটা টাকা পাব।’

‘স্যার! মি. রানা! আমি কি এতই ছোটলোক যে আপনাকে টাকা সাধব? ঘুরেফিরে সবই দেখেছেন আপনি, তাই না? এ-সবই আপনার। জ্বী-হ্যাঁ, আমার সবকিছু আমি আপনার হাতে তুলে দিতে চাই। আপনি মহান ব্যক্তি, আপনার অধস্তন হয়ে মুক্তিপাগল স্বাধীনতাকামী জনগণের সেবা করতে চাই আমি। আপনি পথ দেখাবেন, আমরা সেই পথ অনুসরণ করব। আমি জানি, দায়িত্ব গ্রহণের পরই আপনি বলবেন, ক্ষমতার ভারসাম্য ফিরিয়ে আনতে ট্রিপলহেডার যথেষ্ট নয়, আমাদের হাতে থাকা চাই অ্যাটম বোমা। কিভাবে তা অর্জন বা চুরি করা যায় আপনি তাও বলে দেবেন, সঙ্গে সঙ্গে আমরা সেই কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ব। তারপর আপনি বলবেন, মানুষের উপকার করতে হলে প্রচুর টাকা দরকার–বিনা পয়সায় কোন মহৎ কাজ হয় না। আমরা আপনাকে সমর্থন করব। টাকা কামাবার নতুন নতুন উপায় আবিষ্কার করবেন আপনি, আপনার উদ্ভাবনী শক্তি দেখে উচ্ছ্বাসে উল্লাসে…’

‘আমি রাজি,’ বলল রানা, ‘এ-কথা শুধু মুখে বললে হবে না, আমি যে সত্যি রাজি তা প্রমাণ করে দেখাতে হবে, তাই না?’

‘গুরু, সত্যি আপনি বুদ্ধিমান! তবে আপনাকে পরীক্ষা করার ধৃষ্টতা কোনদিনই আমি দেখাব না। আপনাকে আন্তরিকতা প্রমাণ করার আহ্বান জানাবার কোন দরকারই হবে না। আপনি নিজেই আমাকে বলবেন, বিজ্ঞানী মনিরুল হকের প্রয়োজন যেহেতু ফুরিয়েছে, তাকে আপনি নিজ হাতে হত্যা করতে চান। আপনার ইচ্ছার প্রতি সম্মান জানিয়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাতে আমাকে সায় দিতে হবে। মনিরুল হকের পরই ডেভেনপোর্টের পালা। তাকেও

আপনি বোমা ফাটিয়ে খুন করতে চাইবেন। গুরুর মর্জি বলে কথা, বাধ্য হয়ে এতেও আমাকে সায় দিতে হবে।'

রানার বলতে ইচ্ছে করল, তুমি শালা ফোরটোয়েনটি, ভণ্ড, প্রতারক! অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে রাখল ও, জানতে চাইল, 'আর আমি যদি তোমার প্রস্তাবে রাজি না হই?'

'স্যার, আপনি আমার আদর্শ পুরুষ। আপনার দ্বারা আমি অনুপ্রাণিত। লেটিসে যা কিছু গড়ে তুলেছি সব আমি আপনার হাতে তুলে দিতে চাই। আমার এই উপহার আপনি যদি গ্রহণ না করেন...কি আর বলব, সে আমার মন্দ কপাল। মেনে নেব, স্যার। হাজার হোক আপনি আমার গুরু, মনের আশা পূরণ না করার অপরাধে আপনাকে তো আর আমি শাস্তি দিতে পারি না।'

'তাহলে আমি এখন যেতে পারি?' জিজ্ঞেস করল রানা। হলরূমে কোন গার্ড নেই, ভাবছে ও, সুইমিং ট্রাঙ্কে খুদে দু'একটা অস্ত্র আছে, তা দিয়ে এখন যদি জুসাইওকে জিম্মি করি, কে আমাকে বাধা দেবে? কিন্তু এ কি বিশ্বাসযোগ্য যে জুসাইও সম্পূর্ণ অরক্ষিত?

'হ্যাঁ, অবশ্যই,' সিংহাসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল জুসাইও। 'এটাই আমাদের প্রথম ও শেষ দেখা, স্যার। আসুন, আরেকবার হ্যান্ডশেইক করি।' হেসে উঠল সে। 'ছি, স্যার, আপনার মত বুদ্ধিমান মানুষ কেন ভাববে আমাকে জিম্মি করা সম্ভব? না-না, অস্বীকার করবেন না, আপনার মনের কথা আমি পড়তে পারছি।' ডান হাতটা বাড়িয়ে দিল সে। 'গলায় এটা জাত সাপ, স্যার। না-না, বিষ দাঁত তুলে ফেলা হয়নি। বলতে পারেন প্রায় নিয়মিতই এই সাপের বিষ গ্রহণ করতে হয় আমাকে। বললে হয়তো বিশ্বাস করবেন না, সাপটাকে আমি ট্রেনিং দিয়েছি, মানে আমার নির্দেশ বুঝতে পারে ও। এখন যদি আপনাকে কামড় দিতে বলি, দৌড়েও

কোন লাভ হবে না, ধাওয়া করে ঠিকই আপনাকে ছোবল দেবে। দেখতে চান আমি সত্যি কথা বলছি কিনা?'

রানা চুপ করে আছে দেখে হাসল জুসাইও। 'ভয় নেই, স্যার। আমি জানি গুরুহত্যা মহাপাপ। কাজেই কোন ক্ষতি না করেই আপনাকে আমি চলে যেতে দেব। তবে এই হলরুমের বাইরে যদি কিছু ঘটে, সেজন্যে আপনি আমাকে দায়ী করতে পারবেন না।'

রানা অন্য হিসাব করছে। সাপটাই যদি জুসাইওর রক্ষাকবচ হয়, ওটাকে মারা ওর জন্যে কোন সমস্যা নয়। জুসাইওর বাড়ানো হাতটা ধরার জন্যে সোফা ছেড়ে এগোল ও, কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে হিসাবটা বদলে গেল। তিনদিকের পর্দা সরিয়ে খাকি ইউনিফর্ম পরা তিন দল কোরিয়ান গার্ড ঢুকল মঞ্চে, হাতের অস্ত্র রানার দিকে তাক করা।

'ওদেরকে ভুল বুঝবেন না, প্লীজ, স্যার!' বিনয়ের অবতার সেজে বলল জুসাইও। 'ওরা আসলে আমার হয়ে আপনাকে মিনতি করছে, দয়া করে আমার উপহার আপনি প্রত্যাখ্যান করবেন না।'

ভণ্ডামি আর নাটুকেপনা আর কত সহ্য করা যায়, এবার নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বসল রানা। মনের সমস্ত ঘৃণা আর রাগ হড়হড় করে বেরিয়ে এল। 'তুমি শালা একটা ভণ্ড! পরের ধন মেরে দিয়ে পোদ্দারি করছ, অথচ দাবি করছ বিশ্বাসঘাতক নও। তোমার অ্যাটম বোমা সংগ্রহের স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যাবে, জুসাইও। আমি কেন, কেউ তোমাকে সাহায্য করবে না...'

ঝট্ করে রানার দিকে পিছন ফিরল জুসাইও। ভারী গলায় বলল, 'ওঁর সময় শেষ হয়ে গেছে। ওঁকে তোমরা যেতে দাও।'

'থ্যাঙ্কস ফর নাথিং,' হিসহিস করে বলল রানা। 'জানি আমাকে মারার সব আয়োজন করে রেখেছ তুমি। তবে যদি বেঁচে থাকি, আবার আমি ফিরে আসব, জুসাইও।'

রানার দিকে ফিরল না জুসাইও। ‘ক্যারলিন, ওঁকে বলো গুরুহত্যার মত মহাপাপ করতে বাধ্য হওয়ায় যদি পারেন তো উনি যেন আমাকে ক্ষমা করে দেন।’

তার কথা শোনার জন্যে দাঁড়িয়ে নেই রানা, এরইমধ্যে মঞ্চ থেকে নেমে এসেছে। গার্ডরা সবাই মঞ্চেই থাকল, ওর পিছু নিয়ে কেউ আসছে না।

রানা জানে, হলরুমের বাইরে বেরুলেই খুন হয়ে যাবে ও।

বারো

অ্যান্টিরূমের গার্ড সবিনয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে দরজা খুলে দিল, ফাঁকা করিডরে বেরিয়ে এসে এলিভেটরের দিকে হাঁটা ধরল রানা।

ওরা এলিভেটরেই অপেক্ষা করছিল। রেমো খেং আর তার দুই সঙ্গীর সঙ্গে মারটিনও রয়েছে। রানা এলিভেটরে ঢুকতে হাতের রেডিওফোন পকেটে ভরল মারটিন। দরজা বন্ধ হয়ে গেল, এলিভেটর নিচে নামছে।

'তুমি আমার ন'জন লোককে খুন করেছ,' বলল খেং, হাতে বেরিয়ে এল খানিকটা নাইলনকর্ড। 'লিমকে সহ আহত করেছ আটজনকে,' পাশে দাঁড়ানো একজন সঙ্গীকে দেখাল। 'বাকি সাতজন বাঁচে কিনা সন্দেহ। বাধা দিয়ো না, তোমাকে আমি বাঁধছি।'

লিম আর তার সঙ্গীর হাতে একটা করে রিভলভার দেখল রানা। ওদের বোকামি লক্ষ করে মনে মনে হাসল ও। এলিভেটরের মত ছোট্ট আর বদ্ধ একটা জায়গায় গুলি করার ঝুঁকি কেউ নেয় না, করলে কেউ বলতে পারে না কাকে গুলি লাগবে। জানে হাত দুটো পিছমোড়া করে বাঁধতে চাইবে খেং, তবু ইচ্ছে করেই সামনে বাড়িয়ে ধরল।

খেং হাতে রশি জড়াতে যাচ্ছে, এই সময় রানার শরীরে বিদ্যুৎ খেলে গেল। লিমের ঊরুসন্ধিতে গুঁতো মারল হাঁটু দিয়ে, ছোঁ দিয়ে

কেড়ে নিল তার সঙ্গীর হাতের অস্ত্র, কনুই গাঁথল খেঙের পাঁজরে–কোন বিরতি ছাড়াই। তবু শেষরক্ষা হলো না। ভুল করেই মারটিনের দিকে পিছন ফিরেছিল, ফলে খেসারত দিতে হলো। উল্টো করে ধরা রিভলভার দিয়ে ওর মাথায় মারল মারটিন।

ভাগ্য ভাল যে শুধু বন্দী হলো, জ্ঞান হারায়নি। বেহুঁশ কোন লোককে লেগুনের পানিতে ফেলে দিলে তার আর বাঁচার কোন উপায় থাকে না।

লিম আর তার সঙ্গী ইয়াম ধরে রাখল ওকে, পিছমোড়া করে কনুইয়ের ওপর রানার হাত দুটো বাঁধল খেং। নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে থাকল মারটিন, হাতের রিভলভার রানার দিকে তাক করা। লুকাস ইনের গ্রাউন্ড ফ্লোর থেকে বের করে লেগুনের ধারে নিয়ে আসা হলো ওকে। পানির কিনারায় তিনটে মাঝারি আকৃতির বোট দেখা যাচ্ছে। রানাকে নিয়ে ওগুলোর একটায় চড়ল খেং আর ইয়াম। মারটিন লুকাস ইনে ফিরে গেল, আর আহত লিমকে সঙ্গে নিতে রাজি হলো না খেং।

বুদ্ধিটা মারটিনের, পিছমোড়া করে রানার বাইসেপ নাইলন কর্ড দিয়ে নয়, বাঁধা হয়েছে তার দিয়ে। কয়েক প্রস্থ পেঁচিয়ে এক করা তার, নগ্ন, গায়ে কোন আবরণ নেই; ফলে হাতে টান পড়লেই ব্যথায় চোখে অন্ধকার দেখছে রানা। কনুইয়ের কাছে মাংস কেটে এরইমধ্যে রক্ত গড়াতে শুরু করেছে। সেজন্যে অবশ্য ও নিজেই দায়ী।

ওর পরনের সুইমিং ট্রাঙ্কটা বিভিন্ন রঙের কয়েকপ্রস্থ কাপড় দিয়ে তৈরি, ফলে দেখে মনে হয় ডোরাকাটা। লেগুন থেকে এখনও খোলা সাগরে বেরিয়ে আসেনি বোট, সুইমিং ট্রাঙ্কের পিছন দিকের এক ফালি কাপড়ের নাগাল পাওয়ার চেষ্টা করছে ও। কিন্তু আঙুলগুলো সেখানে পৌঁছাচ্ছে না।

ককপিটে রয়েছে খেং, এক হাতে হুইল, অপর হাতে রিমোট কন্ট্রোল। লেগুন থেকে সাগরে বেরুতে হলে একটা টানেলের ভেতর দিয়ে যেতে হবে। টানেলের ভেতর গ্রিল আছে, সরাতে হলে রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্য দরকার।

গ্রিল ওপর দিকে উঠে যাচ্ছে, নিচ দিয়ে সাগরে বেরিয়ে এল বোট। শক্তিশালী ইনবোর্ড এঞ্জিন, তীরবেগে হাইড্রোফয়েল ছোটাল খেং।

রানার কাছাকাছি, তবে ককপিটের ভেতর রয়েছে ইয়াম; বাহাদুরি দেখাবার জন্যে কিছু না ধরে দাঁড়িয়ে থাকার চেষ্টা করছে। রানার দিকে মাঝেমধ্যে তাকাচ্ছে সে, চোখে ঘৃণা। এক সময় বলল, 'বস্ বলেছেন, প্রয়োজন ফুরালে নাচুনে মেয়েটাকেও তোমার কাছে পাঠিয়ে দেয়া হবে।'

'সেটা যেন কোথায়?' রেইলিঙে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে রানা, পিঠ বাঁকা করে হাত দুটো খানিকটা নিচে নামাতে পেরেছে। ওয়েস্টব্যান্ডের নাগাল পেয়েছে, আঙুলগুলো এখন কনট্যাক্ট যিপার নিয়ে ব্যস্ত। ওই যিপার শিরদাঁড়ার গোড়ার কাছে ছোট্ট তেকোনা একটা ফাঁক তৈরি করবে।

'যেখানে আমরা তোমাকে ফেলতে যাচ্ছি,' কুৎসিত হেসে বলল ইয়াম। 'সাগরের তলায়।'

এঞ্জিনের গতি কমে গেল, চাপা গর্জন ছাড়ছে। তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে আরও দেরি করে ফেলছে রানা, অথচ জানে হাতে আর সময় নেই। আঙুলগুলো আড়ষ্ট, ট্রাঙ্কের পিছনের ফাঁকে ঢুকে এটা-সেটা হাতড়াচ্ছে, কিন্তু যেটা খুঁজছে সেটা পাচ্ছে না।

ঢেউয়ের দোলায় খুব বেশি দুলছে বোট। ইন্সট্রুমেন্ট প্যানেলের দিকে তাকিয়ে রয়েছে খেং, একটা আলোকিত কাঁটা থেকে চোখ তুলে বলল, 'এই জায়গাটা যথেষ্ট গভীর।' হুইলের দিকে পিছন

ফিরল সে।

'কিভাবে ফেলব?' জিজ্ঞেস করল ইয়াম। 'জ্যান্ত, না লাশ?'

'আমাদের কাছে ডিজইনটিগ্রেটিং লাইন আছে,' বলে হাতে ধরা ওয়ায়্যার-কাটারটা ইয়ামকে দেখাল খেং। রানার দিকে তাকিয়ে হাসল, 'এর মানে তুমি বোঝো?'

মাথা নাড়ল রানা, না বোঝে না—যদিও ভালই বোঝে।

'জিনিসটা সিনথেটিক, ইস্পাতের মত শক্ত। তবে পানিতে দুই কি তিন দিন পর্যন্ত এরকম শক্ত থাকে, তারপর গলে যায়। ওই লাইন একখণ্ড কোরাল-এর সঙ্গে বেঁধে রাখবে তোমাকে। তিনদিন পর লাইনের কোন অস্তিত্ব থাকবে না, তুমি মাসুদ রানা সনাক্ত হবে ডুবে মরা আরও একটা লাশ হিসেবে, অবশ্য মাছেদের কাজ শেষ হবার পর সনাক্ত করার মত যদি কিছু থাকে আর কি।'

'ডুবে মরা লোকের হাত তার দিয়ে বাঁধা থাকে?'

'আরে না, বোট থেকে ফেলার সময় আমরা তোমার হাতের তার কেটে দেব। ভেবেছ নিজেদের কাজ আমরা বুঝি না?'

কথা না বলে সশব্দে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। শিরদাঁড়ার গোড়া থেকে ছোট একটা প্যাকেট বেরিয়ে এসেছে, আঙুলে নিয়ে সাবধানে নাড়াচাড়া করছে।

বোট এক সময় থামল, ঢেউয়ের সঙ্গে ওঠানামা করছে। ছোট্ট কেবিনের পাটাতন সরিয়ে নিচে নেমে গেল খেং, ফিরে এল বুকের সঙ্গে জাপটে ধরা বড়সড়, ভারী একটা প্রবালখণ্ড নিয়ে। লালচে-বেগুনি প্রবালে লাইনটা পেঁচিয়ে বাঁধল ইয়াম, তারপর অপরপ্রান্ত রানার গোড়ালির সঙ্গে বাঁধার জন্যে নিচু হতে শুরু করল।

এখনই সময়। শিরদাঁড়ার গোড়ায় ধরা ছোট্ট প্যাকেজটা আড়ষ্ট আঙুল দিয়ে ছিঁড়ে ফেলেছে রানা। লাফ দিয়ে বেরিয়ে এসে রানার পিঠ আর হাত পুড়িয়ে দিচ্ছে উত্তপ্ত আগুনের শিখা। দাঁতে

দাঁত চেপে প্যাকেজটা কব্জিতে ঠেকিয়ে রেখেছে। বিসিআই-এর স্পেশাল এফেক্ট এক্সপার্টের বক্তব্য অনুসারে ছোট্ট ম্যাগনেযিয়াম টর্চটা তিন সেকেন্ডের মধ্যে সিকি ইঞ্চি মেটাল গলিয়ে ফেলবে, কিন্তু রানার মনে হলো তিন বছর পার হয়ে যাচ্ছে। চামড়া ও মাংসে তীব্র জ্বলুনি অনুভব করতে পারছে ও। হাতের পেশীতে টান পড়াতেই সম্ভবত তারের বাঁধন এত ব্যথা দিচ্ছে, মনে হলো জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে।

এই ব্যথাই প্রচণ্ড শক্তি এনে দিল শরীরে। ঝেড়ে একটা লাথি মারল ও। চিবুকের নিচে লাথিটা লাগতেই ছিটকে গিয়ে রেইলিঙের ওপর পড়ল ইয়াম। ঠিক সেই মুহূর্তে বোটটা দুলে ওঠায় ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে গেল রানা ডেকের ওপর। খেঙের হাতে কোরাল, প্রথমে একটু হকচকিয়ে গেলেও সামলে নিল দ্রুত। দু'পা এগিয়ে এসে রানার মাথাটা গুঁড়িয়ে দেয়ার জন্যে প্রবালখণ্ডটা তুলতে শুরু করেছে, ঠিক এমনি সময়ে রানার জোড়া পায়ের লাথি লাগল তার তলপেটে। যেন ডানা গজাল, উড়ে রেইলিং টপকে নেমে গেল খেং সাগরে। ঝপাৎ করে পানিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কেঁদে উঠল লোকটা, 'আমি সাঁতার জানিনা! বাঁচাও!' উঠে দাঁড়াল রানা, দেখল আতঙ্কে নীল খেং-এর মুখটা বীভৎস দেখাচ্ছে। এখনও দু'হাতে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে আছে পাথরটা। পরমুহূর্তে তলিয়ে গেল পানির নিচে।

কল্পনার চোখে স্পষ্ট দেখতে পেল রানা, ভারী কোরালটা বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে সাঁই-সাঁই করে নেমে যাচ্ছে লোকটা সাগরের নিচে।

কনুইয়ে চাপ দিতেই খুলে গেল বাঁধন। এবার প্রচণ্ড এক ঘুসি ঝাড়ল ও ইয়ামের নাক বরাবর। আবার রেইলিঙে ধাক্কা খেলো সে, ইতিমধ্যে পকেট থেকে বেরিয়ে এসেছে অস্ত্র সহ ডান হাত। এবার

মরণ আঘাত হানল রানা, প্রচণ্ড এক কারাতির কোপ পড়ল ইয়ামের গলায়। ধ্বংস হয়ে গেল ল্যারিঙ্কস। কাতরধ্বনি আর রক্ত বেরিয়ে এলো একই সঙ্গে, রানার নগ্ন বুক রঞ্জিত করে দিয়ে মারা গেল সে।

ইয়ামের লাশটা পানিতে ফেলে ডাইভ দিয়ে সাগরে পড়ে নিজেকে ধুয়ে নিল রানা। এদিক-ওদিক ডুবসাঁতার কেটে খুঁজল খেংকে। তারপর বোটে ফিরে এসে এঞ্জিন চালু করল।

বোট ঘুরিয়ে নিয়ে ভার্জিনের বোট বেসিনের দিকে রওনা হলো রানা। সিজারের বোটে শিরির রেখে যাওয়া পলিথিন ব্যাগে ছদ্মবেশ ধারণের কিছু উপকরণ আছে, নিরাপদে হোটেলে ফিরে যতক্ষণ পারা যায় ক্যারলিনের স্যুইটে ঘুমাতে চায় ও।

তেরো

রানা যেন সৌদি ট্যুরিস্ট, আকাশটা পুবদিকে ফর্সা হতে শুরু করলেও সুইমিং পুলের পাশ ঘেঁষে অলস পায়ে হাঁটছে। সাদা আলখেল্লা বাতাসে উড়ছে, মুখ তুলে হোটেলের পাঁচতলায় তাকাতেই শিরির স্যুইটের একটা জানালায় এক সেকেন্ডের জন্যে আলো দেখল ও, তারপরই আবার অন্ধকার হয়ে গেল। ফ্লাডলাইটের আলোয় ওকে দেখে চিনতে পেরেছে শিরি, ঘরের আলো জ্বেলে যেন বোঝাতে চাইল, ও বেঁচে থাকবে এই আশায় কি সারারাত জেগে আছে সে।

হোটেলের পিছন দিকে এসে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠল রানা। বোর্ডার ও স্টাফ, সবাই ঘুমাচ্ছে; কারও সঙ্গে দেখা হলো না।

চাবি দিয়ে ক্যারলিনের স্যুইটের দরজা খুলল রানা। ভেতরটা অন্ধকার। দরজা বন্ধ করে আলো জ্বালতে গিয়েও জ্বালল না; শুনতে পেল কাছেই কেউ ফোঁপাচ্ছে।

'শিরি?' ফিসফিস করল রানা।

ডুকরে কেঁদে ওঠার শব্দ হলো। পরমুহূর্তে রানার গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল মেয়েটা। অর্গলমুক্ত আবেগ ভাসিয়ে দিল দু'জনকে, তারপর অদ্ভুত এক ধরনের প্রতিযোগিতায় মেতে উঠল ওরা। রানাকে ফিরে পেয়ে শিরি তার সমস্ত আদর একসঙ্গে ঢেলে দিচ্ছে, তার অদম্য কান্না আসলে আনন্দেরই প্রকাশ। কান্নার সঙ্গে চলছে মুখে হাত বোলানো, গালে গাল ঘষা, বুকে টেনে নিয়ে রানাকে

পিষে ফেলা। রানাও ব্যস্ত, শিরির পিঠে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা ও অভয় দিচ্ছে, কপাল থেকে চুল সরিয়ে মুছে দিচ্ছে চোখের পানি। তারপর ধীরে ধীরে অন্যরকম একটা ব্যস্ততা পেয়ে বসল ওদেরকে। নিজেরাও বলতে পারবে না প্যাসেজ হয়ে কখন ক্যারলিনের বেডরূমে ঢুকে পড়েছে। এখনও ওরা মেঝেতে দাঁড়িয়ে, কেউ কাউকে ছাড়েনি, নিয়ন্ত্রণহীন দু'জোড়া হাত আদর করছে পরস্পরকে।

সকাল দশটায় রানার ঘুম ভাঙাল শিরি। হোটেলের কিচেন থেকে সেদ্ধ ডিম, মাখন আর রুটি চুরি করে এনেছে, নিজের হাতে রানাকে খাইয়ে পাশের স্যুইটের কিচেন থেকে দু'কাপ কফিও বানিয়ে আনল। 'হাইড্রোফয়েলটা পাওয়া গেছে খোলা সাগরে, ফুয়েল ফুরিয়ে যাওয়ায় এঞ্জিন বন্ধ ছিল। বোটে খেং, ইয়াম বা তোমাকে পাওয়া যায়নি,' রানাকে রিপোর্ট করল সে।

'একশো গজ সাঁতরে বোট বেসিনে পৌঁছাই আমি,' বলল রানা। 'তার আগে বোটটাকে খোলা সাগরের দিকে ঘুরিয়ে ছেড়ে দিই।'

'মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা কিম উন খানিক আগে একদল লোক নিয়ে লাশ খুঁজতে গেল আবার। সকাল ছ'টা থেকে দুটো হেলিকপ্টারও ওই একই কাজে ব্যস্ত। সবাই খুব উত্তেজিত, তবে কেউ মুখ খুলতে চাইছে না। কারণও আছে–আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যে লুকাস আংকেলের প্লেন ল্যান্ড করবে লেটিসে। সব ব্যাপারেই তাঁকে অন্ধকারে রাখা হয়েছে, কাল রাতের ঘটনাও...'

'সিজারের বোটে তুমি সাদা আলখেল্লা রেখে এসেছিলে কি মনে করে?' জানতে চাইল রানা।

'সৌদি আরব থেকে কাল কয়েকজন ট্যুরিস্ট এসেছে

হোটেলে,’ বলল শিরি। ‘তাদেরই একজনের দরজা খোলা দেখে ওয়ার্ড্রোব থেকে ড্রেসটা চুরি করি। ভাবলাম ওটা পরলে চেহারা গোপন করা তোমার জন্যে সহজ হবে। এ-সব থাক, জুসাইওর সঙ্গে তোমার কি কথা হলো তাই বলো।’

‘ও-সবের কোন গুরুত্ব নেই, শিরি,’ বলল রানা। তবে বিজ্ঞানীদের কোয়ার্টারে পৌছাবার একটা উপায় দেখে এসেছি। দ্বিতীয় আন্ডারগ্রাউন্ডে অক্সিজেন সাপ্লাই দেয়া হচ্ছে মেশিনের সাহায্যে। মেশিনগুলো কোথায় বসানো হয়েছে জানি না, সম্ভবত জেনারেটরের কাছাকাছি কোথাও হবে, তবে যে এয়ার ডাক্ট দিয়ে অক্সিজেন সাপ্লাই দেয়া হয় সেটা দেখে এসেছি।’

‘তারমানে আবার তুমি ওখানে যাবে? নির্ঘাত মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে আসার পরও?’

‘আমি না গেলে তোমার বাবাকে সাবধান করবে কে?’

‘কি ব্যাপারে সাবধান করতে চাও?’

‘অসুখের ভাণ করতে হবে ওঁকে। এবার ডেভেনপোর্ট এলে তাঁর সঙ্গে দেখা করা চলবে না।’

‘কেন?’

‘এখনও পুরো প্ল্যানটা স্পষ্ট হয়নি মনের মধ্যে, তাই বলতে পারছি না। শুধু এটুকু বলতে পারি, বিপদ এড়াতে হলে অসুস্থতার ভাণ করতে হবে তোমার বাবাকে।’

‘এজন্যে তোমার ওখানে যাওয়ার কি দরকার? আমিই তো জানিয়ে দিতে পারি।’

‘কিভাবে?’

‘টেলিফোনে। একদিন পর একদিন টেলিফোনে যোগাযোগ করার অনুমতি আছে আমাদের। যদিও অপারেটর শুনবে আমাদের কথা, আমি বাংলায় বললে বুঝবে না কিছুই।’

‘বাহ্, চমৎকার! ঠিক আছে এই দায়িত্বটা তাহলে তোমাকেই দেয়া গেল। কিন্তু তারপরেও আমার যেতে হবে ওখানে কিছু জিনিস সংগ্রহ করার জন্যে।’

‘আমরা কোনভাবে এফবিআই বা সিআইএ-র সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারি না?’

‘ওদের প্রভাবশালী কিছু অফিসারকে পচিয়ে ফেলেছে জুসাইও, কাজেই সাহায্য চাওয়াটা উল্টে বিপদ ডেকে আনতে পারে। তবে, এ নিয়ে তুমি চিন্তা কোরো না। প্ল্যান করার জন্যে হাতে প্রচুর সময় পাব। আরও একটা দিক সামলাতে হবে।’

‘আরেকটা দিক মানে?’

‘এরই মধ্যে ভুলে গেলে? তুমিই না বললে, টেকঅফ করার সময় রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে তোমার লুকাস আংকেলের প্লেনটা উড়িয়ে দেবে সিজার।’

‘ও, হ্যাঁ! রানা, কিছু একটা করবে না তুমি?’

‘করব তো বটেই,’ বলল রানা। ‘কিন্তু কিভাবে কি করব এখনও জানি না।’

‘ভাল কথা,’ বলল শিরি, ‘আজ রাতে কিন্তু এখানে, মানে ক্যারলিনের স্যুইটে তোমার থাকা চলবে না।’

‘কেন? ক্যাথরিন এসে দখল করে নেবে আমাকে?’

‘না, ঠাট্টা নয়। কি বলেছিলাম ভুলে গেছ? কাল আরও একটা প্লেন টেকঅফ করবে লেটিস থেকে। সাতজন ক্রেতাকে মায়ামিতে পৌঁছে দিতে যাবে সিজার।’

‘তো?’

‘সিজার লীয়ার জেটের নিয়মিত পাইলট নয়, বিশেষ উপলক্ষে মাঝে মধ্যে চালায়। যেদিন প্লেন নিয়ে রওনা হয় তার আগের রাতটা এখানে কাটায় ক্যারলিন, সিজারকে নিয়ে।’

নতুন তথ্যটা নিয়ে গভীর চিন্তায় ডুবে গেল রানা। একসময় বলল, 'ক্যারলিনের এই স্যুইটে লুকিয়ে থাকার কোন উপায় নেই?'

'কেন, এখানে থাকতে চাইছ কেন?'

'আছে কিনা?'

একটু চিন্তা করল শিরি। 'প্যাসেজের ওপর একটা মাচা আছে, টুকিটাকি জিনিসে ঠাসা। কিন্তু ওখানে সারাটা রাত তুমি কাটাবে কিভাবে?'

'আমার মাথায় একটা প্ল্যান এসেছে, পরে সব খুলে বলব, কেমন? তবে ওই মাচাতেই আমাকে রাত কাটাতে হবে, শিরি। ভাল কথা, তোমার ব্রিফকেসটা খালি করে রেখো, আমার দরকার হবে।'

অভিমানে ঠোঁট ফোলাল শিরি। 'সারা রাত আমি একা...' হঠাৎ খেয়াল হলো লজ্জার মাথা খেয়ে কি বলে ফেলতে যাচ্ছিল, শোধরানোর ব্যর্থ চেষ্টায় মুখ ঢাকল দু'হাতে।

দ্বিতীয় আন্ডারগ্রাউন্ড থেকে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে ফিরে এসেছে রানা। শিরির স্যুইটে সারাদিন অপেক্ষা করল ও, কিন্তু লুকাস ডেভেনপোর্ট লেটিসে এলেন না। তিনি যদি নাই আসেন, ক্যারলিনের স্যুইটের মাচায় রাত কাটাবার কোন প্রয়োজন নেই রানার–অন্তত শিরির তাই ধারণা। কিন্তু রানার প্ল্যান রানাই জানে, ডেভেনপোর্ট না পৌঁছলেও মাচায় উঠবে ও।

'আজ আমার শো আছে, কাজেই আমি গেলাম,' সন্ধ্যার দিকে বলল শিরি। 'উপায় নেই, রাতটা তোমাকে না খেয়েই থাকতে হবে।'

'চুরিতে তো ভালই হাত পাকিয়েছ,' বলল রানা। 'ফেরার সময় যদি পারো কিছু নিয়ে এসো, আর দুই স্যুইটের মাঝখানের দরজাটা খুলে রেখো। যদি সুযোগ পাই দেখা করে যাব তোমার

সঙ্গে।'

আর কিছু না বলে চলে গেল শিরি। একটু পরই পাশের স্যুইটে যাবার প্রস্তুতি নিল রানা। পিস্তল সঙ্গেই আছে, শিরির ব্রিফকেসটা তুলে নিল বিছানার ওপর থেকে। ওটায় আগেই ভরে রেখেছে একটা পেন্সিল টর্চ, কিছু তার, একটা প্লায়ার্স, স্ক্রু-ড্রাইভার, টেপ আর দ্বিতীয় আন্ডারগ্রাউন্ডের ট্রিপলহেডার শ্যাফট থেকে চুরি করা রিমোট কন্ট্রোল যন্ত্রটা। রানা আশা করছে, সিজার টাইম বোমা ব্যবহার না করে রেডিও সিগন্যালের মাধ্যমে অ্যাকটিভেট করবে ব্রিফকেসের বোমাটা।

মাঝখানের দরজা খুলতে যাবে রানা, শিরির বেডরুমে ঝন ঝন শব্দে বেজে উঠল টেলিফোনটা। স্থির হয়ে গেল ও। তারপর ধীরে ধীরে বেডরুমে এসে ঢুকল। টেলিফোনের পাশে দাঁড়িয়ে চিন্তা করছে। কে করতে পারে ফোনটা? শিরি ওকে ফোন করার ঝুঁকি নেবে না। হয়তো ক্যারলিন করেছে, কৌশলে জানতে চাইছে শিরির স্যুইটে কেউ আছে কিনা। কিন্তু ক্যারলিন যদি সন্দেহ করে রানা শিরির স্যুইটে লুকিয়ে আছে, তার তো বোঝা উচিত যে ফোন এলেও রিসিভ করবে না ও। ফোন না করে সন্দেহ নিরসনের অন্য কোন উপায় বেছে নেবে সে। তাহলে? এমন কি হতে পারে, শিরি জরুরী কোন খবর দিতে চাইছে ওকে?

এবার নিয়ে সাতবার রিঙ হচ্ছে। দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে রিসিভার তুলে কানে ঠেকাল রানা।

'দশ মিনিট হলো পৌঁছেছেন উনি,' শিরির গলা। আর কিছু না বলে যোগাযোগ কেটে দিল সে।

অন্ধকার কামরায় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল রানা। সন্দেহ নেই উনি বলতে লুকাস ডেভেনপোর্টকেই বোঝাতে চেয়েছে শিরি। যাক, শেষ পর্যন্ত ভদ্রলোক পৌঁছেছেন। প্রশ্ন হলো, কালই তিনি

ফিরে যাবেন কিনা, এবং গেলে দিনের ঠিক কখন? আরও একটু চিন্তা করতে রানা উপলব্ধি করল, এটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নয়। কারণ যখনই তিনি বিদায় নেন, তাঁর বিদায় নেয়ার আগে সাত ক্রেতাকে নিয়ে সিজার টেক-অফ করবে না।

ক্যারলিন যদি সিজারের সঙ্গে রাত কাটাতে আসে, সন্ধে থেকে নিয়ে গভীর রাত পর্যন্ত যে-কোন সময় আসতে পারে সে। কাজেই তার স্যুইটে এখনই ঢুকে পড়া দরকার ওর।

ক্যারলিনই সম্ভবত আগে আসবে, তারপর সিজার। দু'জন একসঙ্গেও আসতে পারে। মাচায় বসার সুবিধে হলো, স্যুইটে ঢোকার সময় সিজারকে রানা দেখতে পাবে। দেখতে পাবে তার হাত খালি, নাকি ব্রিফকেস আছে। অবশ্য শুধু ব্রিফকেস দেখে কোন লাভ নেই, নিশ্চিতভাবে জানতে হবে ওই ব্রিফকেসে টাইম বোমাটা আছে কিনা।

সন্ধের পর, সাড়ে ছ'টার দিকে মাচায় উঠল রানা। কয়েকটা কার্ডবোর্ড বাক্সের আড়ালে দেড় ঘণ্টা বসে থাকার পর টের পেল পাশের স্যুইটে ফিরে এল শিরি। দশ মিনিটও পার হয়নি, স্যুইটের দরজায় শব্দ হলো, কী হোলে চাবি ঢোকাচ্ছে কেউ।

মাচার কিনারা থেকে একটু পিছিয়ে এল রানা। অন্ধকারে কিছু দেখা যাচ্ছে না, তবে দরজা খোলার আওয়াজ ঢুকল কানে, তারপরই শোনা গেল একাধিক মানুষের হাঁপানোর শব্দ। মনে হলো কে বা কারা যেন গোঙাচ্ছে।

সুইচ টেপার আওয়াজ, তারই সঙ্গে প্যাসেজের একটা টিউবলাইট জ্বলল। সাদা আলোয় ক্যারলিন আর সিজারকে দেখতে পেল রানা, দরজার কাছে দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যে যেন ধস্তাধস্তি বা মারামারি করছে। মেঝেতে, সিজারের পায়ের কাছে একটা ব্রিফকেস।

হঠাৎ সিজারকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল ক্যারলিন।

সিজারকে অবাক হতে দেখল রানা। 'কি হলো?'

'ওটা তুমি কোন আক্কেলে এখানে নিয়ে এলে?' ইঙ্গিতে ব্রিফকেসটা দেখাল ক্যারলিন। 'প্রেম করব কি, ওটার কথা ভাবলেই হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে আমার।'

'দূর বোকা!' হাসল সিজার, কালো মুখে সাদা দাঁত ঝিক করে উঠল। 'রিমোট কন্ট্রোলে চাপ না দিলে কোনদিনই ওটা ফাটবে না।'

'কোথায় সেটা?' আঁতকে উঠে জানতে চাইল ক্যারলিন। 'হঠাৎ যদি চাপ লেগে যায়?'

পকেটে হাত ভরে স্বচ্ছ প্লাস্টিকের একটা বাক্স বের করে ক্যারলিনকে দেখাল সিজার। 'বাক্সের ভেতর আছে, কিভাবে চাপ লাগবে?'

'জানতাম তুমি বিপদে পড়তে ভালবাস, কিন্তু এতটা বেপরোয়া জানা ছিল না। কাজটা তুমি ভাল করোনি, সিজার।'

'কি আশ্চর্য, এত ভয় পাচ্ছ কেন!' অসহায় দেখাল সিজারকে। 'এত ভয় পেলে কাল সকালে তুমি বোমাটা ফাটাবে কিভাবে?'

'কে বলল আমি ফাটাব?' হঠাৎ হাসল ক্যারলিন, গলাটা নিচু করল।

'কে বলল মানে? বস্ নিজে না তোমাকে দায়িত্ব দিলেন?'

মটমট করে আঙুল মটকাল ক্যারলিন। 'বসের কাছ থেকে আরও একটা দায়িত্ব চেয়ে নিয়েছি আমি, তা জানো? তোমরা চলে গেলে কাল দুপুরে ফারাহকে আমি সাপের কামড় খাওয়াব।'

'হোয়াট!'

'আমার একটা দুর্বলতার কথা তুমি তো জানোই,' ফিসফিস করে বলল ক্যারলিন। 'একঘেয়েমি কাটাবার জন্যে মাঝেমধ্যে

মেয়ের সান্নিধ্য পেতে চাই। ফারাহকে ভাল লাগায় তাকে আমি প্রস্তাব দিই। জবাবে সে আমার গালে চড় মেরেছে। কাজেই বস্ যখন বললেন যে ফারাহকে তাঁর আর কোন প্রয়োজন নেই, সঙ্গে সঙ্গে ওর ব্যবস্থা করার দায়িত্বটা চেয়ে নিলাম আমি।'

'কিন্তু তার সঙ্গে বোমা ফাটাবার কি সম্পর্ক?'

'শুধু শুধু কাউকে মারা যায়? একটা অজুহাত দরকার না?' মুখে হাত চাপা দিয়ে হাসল ক্যারলিন। 'এয়ারস্ট্রিপের পাশে সবাই যখন থাকব, মি. ডেভেনপোর্ট বিদায় নেয়ার সময়, ওর হাতে রিমোট কন্ট্রোলটা ধরিয়ে দেব আমি। মি. ডেভেনপোর্টের প্লেন টেক-অফ করার পর বোতামে চাপ দিতে বলব ওকে। ও তো আর জানবে না চাপ দিলে কি ঘটবে। জানলেই বা কি, মি. জুসাইওর সামনে আমার নির্দেশ অমান্য করার সাহস হবে না ওর। বোতামে চাপ দিলেই তো বুম, সাগরের ওপর বিস্ফোরিত হবে প্লেনটা। এই ঘটনার জন্যে ফারাহকে দায়ী করব আমি। বসকে বলব, তিনি যেন তার পোষা সাপটা ওর গলায় জড়িয়ে দেন।' হেসে উঠল আবার। 'আইডিয়াটা কেমন, টিম?'

'এতে আমার সায় নেই,' বলল সিজার। 'ব্যাপারটা অত্যন্ত রিস্কি। ফারাহ যদি রিমোট কন্ট্রোল ছুঁড়ে ফেলে দেয়? ওটা ভেঙে গেলে বোমা ফাটবে?'

ক্যারলিন রেগে গেল। 'এ নিয়ে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না। তুমি এখন বলো বোমা আর বাক্সটা নিয়ে কি করবে।'

'তুমি যদি চাও বোমাটা আমার কামরায় থাকবে, তাহলে ওটার সঙ্গে আমাকেও ওখানে থাকতে হবে।'

'ঠিক আছে, এখানেই কোথাও রাখো তাহলে, কিন্তু বেডরূমে নয়।'

'বেডরূমে নয়?' বলে চোখ তুলে মাচার দিকে তাকাল সিজার।

'দাঁড়াও, ভাল জায়গা পেয়েছি।' ব্রিফকেসটা মেঝে থেকে তুলল সে, এগিয়ে এসে পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে যতটা সম্ভব উঁচু হলো। ব্যাপারটা হঠাৎ ঘটছে, তাই শব্দ না করে পিছিয়ে আসার সময়ই রানা পেল না, ব্রিফকেসটা সরাসরি ওর কোলেই তুলে দিল সিজার। প্লাস্টিকের বাক্সটা রাখল ব্রিফকেসের ওপর।

প্যাসেজ থেকে সিটিংরুমে, সেখান থেকে বেডরুমে চলে গেল ওরা। পেন্সিল টর্চ জ্বেলে সঙ্গে সঙ্গে কাজ শুরু করল রানা। কমবিনেশন লক, নির্দিষ্ট সংখ্যাগুলো জানা না থাকলে খোলা সম্ভব নয়। ভাবল, ব্রিফকেস ছুরি দিয়ে কেটে ফেললে ক্ষতি কি?

পেন্সিল টর্চের আলোয় বোমাটা পরীক্ষা করল রানা। অত্যন্ত শক্তিশালী বোমা, ফাটলে টুকরো নয়, লুকাস ডেভেনপোর্টের প্লেন স্রেফ ধুলো হয়ে যাবে। বোমার সঙ্গে ফিট করা সিগনাল রিসিভিং মেকানিজম আলাদা করার কাজটায় হাত দিতে গিয়েও দিল না ও। সময়সাপেক্ষ কাজ, শেষ হবার আগেই যদি সিজার ব্রিফকেসটা নিতে চলে আসে?

শিরির ব্রিফকেসটা খালি করল রানা। বোমা সহ সিজারের কেসটার ওজন হবে চার কেজির মত। মাচায় একটা টুলবক্স পাওয়া গেল। ভেতরে হাতুড়ি, রেঞ্চ, কয়েক বাক্স পেরেক ইত্যাদি রয়েছে। অক্ষত কেসে আন্দাজ মত ওগুলো ভরে ডায়াল ঘোরাতেই বন্ধ হয়ে গেল তালা। কোন কারণে সিজার যদি কেসটা খুলতে চায়, বুঝে ফেলবে কেউ নিশ্চয়ই কারিগরি ফলিয়েছে। হয়তো তখন কেসটা কাটবে সে, দেখতে পাবে ভেতরে বোমা নেই। তবে খুলে বোমাটা দেখার ইচ্ছা তার হবে বলে মনে হয় না।

ভাগ্যের সহায়তা পেল রানা অন্য দিক থেকে। দুটো রিমোট কন্ট্রোল একই রকম দেখতে। তবে রানার রিমোট কন্ট্রোল দিয়ে

নিশ্চয়ই বোমাটা ফাটানো যাবে না। যাবে না, এটা বোঝার জন্যে একটা পরীক্ষা করতে হবে ওকে।

বোমা থেকে সিগনাল রিসিভিং মেকানিজম আলাদা করতে হলো। মেকানিজম সাড়া দিলেও বোমাটা এখন ফাটবে না। সিজারের রিমোট কন্ট্রোল থেকে প্রত্যাশিত অ্যাকশন পাওয়া গেল। এরপর নিজের রিমোট কন্ট্রোলে চাপ দিল রানা। জানত কোন সাড়া পাবে না, পেলও না।

প্লাস্টিকের বাক্সে নিজের রিমোট কন্ট্রোল ভরে শিরির ব্রিফকেসের ওপর রাখল রানা। তারপর বোমা ও সিজারের রিমোট কন্ট্রোল সহ নিজের সমস্ত জিনিস নিয়ে সাবধানে নেমে গেল মাচা থেকে। সব যদি ঠিকঠাক মত ঘটে, টুলস ভরা ব্রিফকেসটা ডেভেনপোর্টের প্লেনে তুলে দেবে ক্যারলিন। প্লেন টেক-অফ করার সময় রিমোট কন্ট্রোলে সে বা শিরি যে-ই চাপ দিক, প্লেনটার কোন ক্ষতি তো হবেই না, যেখানেই থাকুক বোমাটাও বিস্ফোরিত হবে না।

তবে রানার কাজের অর্ধেকটা এখনও বাকি। সেটা প্রথম অর্ধেকের চেয়ে অনেক বেশি কঠিন। নতুন একটা ব্রিফকেসে ভরে বোমাটা সিজারের লীয়ার জেটে রেখে আসতে হবে। কঠিন বললে কিছুই বলা হয় না, এ প্রায় অসম্ভব একটা কাজ। এয়ারস্ট্রিপে কড়া পাহারা আছে, প্লেনের কাছে ঘেঁষাই যাবে না। সিজার আর ক্যারলিনের কথা শোনার পর আরেকটা বুদ্ধি খেলছে রানার মাথায়, কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে শিরি। শিরি যদি জুসাইওর পাশে থাকে, জুসাইওকে কিভাবে উড়িয়ে দেবে ও?

বাইরে থেকে সাহায্য পাবার একটা উপায় হয়তো আছে, অন্তত চেষ্টা করে দেখবে রানা। সেজন্যে ল্যাপটপটা দরকার হবে। সেটা কি ওর স্যুইটে আছে এখনও?

চোদ্দ

মাচা থেকে নেমে কিচেনে ঢুকল রানা, করিডর ফাঁকা দেখে বেরুল, তালা খোলা দরজার কবাট ঠেলে ঢুকে পড়ল পাশের স্যুইটে। অন্ধকারে দরজার ভেতরই দাঁড়িয়ে ছিল শিরি, ধাক্কা খেয়ে ফিসফিস করল, 'রানা?'

দরজা বন্ধ করল রানা। শিরির হাত ধরে টেনে আনল বেডরুমে। 'তুমি আজ নাচোনি।' হাতের জিনিসগুলো বিছানার ওপর রাখল।

'না। কিম উন বলল আজকের শো দশটায় শুরু হবে।'

অন্ধকারে ভুরু কোঁচকাল রানা। 'কেন?'

'কাল খুব সকালে আমান মোহাম্মদরা চলে যাবে, রাতটা ওরা আমার নাচ দেখে কাটাতে চায়।'

শিরির নিরাপত্তা নিয়ে যতই ভাবছে রানা ততই উদ্বেগের মাত্রা বাড়ছে। 'খুব সকালে কত সকালে?'

'আটটায়।'

'তারমানে কি মি. ডেভেনপোর্ট সাতটায় চলে যাবেন? কিংবা তারও আগে?'

'তা আমি জানি না।' রানাকে জড়িয়ে ধরে আছে শিরি। 'তুমি চলে এলে যে?'

'ওখানে আমার আর কোন কাজ নেই,' বলল রানা। 'তোমার আব্বাকে মেসেজটা দিতে পেরেছ?'

'হ্যাঁ।'

'ভেরি গুড! এইদিকটা তাহলে নিশ্চিন্ত থাকা যাচ্ছে। এবার বলো কিম উন আর কিছু বলল? নতুন কিছু জানতে পেরেছ?'

'না।'

'একটা কথা তুমি আমাকে বলতে ভুলে গেছ, শিরি,' বলল রানা। 'তোমার লুকাস আংকেল লেটিস থেকে চলে যাবার সময় ঠিক কি কি ঘটে।'

'কি ঘটে?'

'তুমিই বলো।'

এক মুহূর্ত চিন্তা করল শিরি। 'ও, বুঝতে পেরেছি। হ্যাঁ, জুসাইও সহ প্রথমসারির প্রায় সব স্টাফই লুকাস আংকেলকে বিদায় জানাতে এয়ারস্ট্রিপে জড়ো হয়। তবে এবার জুসাইও আসবে কিনা জানি না। ক্যারলিন প্লেনটা উড়িয়ে দেয়ার সময় ওখানে নাও থাকতে পারে সে।'

'থাকবে, শিরি। বিশেষ করে ওটা দেখার জন্যেই থাকবে।' বড় করে শ্বাস নিল রানা। 'শোনো, শিরি। যা বলব মন দিয়ে শোনো, উত্তেজিত হয়ো না বা ভয় পেয়ো না।' অন্ধকারেও শিরির ঢোক গেলার শব্দ পেল রানা।

'ঠিক আছে,' ফিসফিস করল শিরি। 'বলো।'

'কাল সকালে ডেভেনপোর্টের প্লেনে যে ব্রিফকেসটা ক্যারলিন তুলে দেবে তাতে বোমা থাকবে না,' ধীরে ধীরে বলল রানা। 'কিন্তু সে-কথা আমি আর তুমি ছাড়া আর কেউ জানে না...'

'বোমাটা তাহলে কোথায়?'

'তোমার বিছানায়। ভয় পেয়ো না, আমি না ফাটালে ওটা

ফাটবে না। যে-কথা বলছিলাম। ক্যারলিনকে বলতে শুনলাম, তুমি ওর কি একটা নোংরা প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় ও তোমার ওপর সাংঘাতিক খেপে আছে। তাই বদলা নেয়ার জন্যে রিমোট কন্ট্রোলটা তোমাকে দিয়ে অপারেট করাবে, তারপর বিস্ফোরণটার জন্যে তোমাকে দায়ী করে জুসাইওকে বলবে তার সাপটা তোমার গায়ে ছুঁড়ে দিতে।'

শিরি শিউরে উঠতে রানা তাকে বুকে টেনে নিল।

'এতক্ষণ যা বললাম, তার তাৎপর্য বুঝতে পারছ? বুঝে থাকলে বলো আমাকে।'

'আমি রিমোট কন্ট্রোল অপারেট করলেও প্লেনের কোন ক্ষতি হবে না।'

'গুড। হ্যাঁ। আর বোমা না ফাটলে ওরা সবাই এমন হকচকিয়ে যাবে যে তোমার কথা কারও মনেই থাকবে না।'

'হ্যাঁ, সম্ভবত।'

'ঠিক ওই সময়, সবাই যখন হতভম্ব বা নিজেদের মধ্যে তর্ক করছে, তুমি তখন কি করবে? তুমি তখন শান্তভাবে সরে আসবে। যেদিক খুশি, যত দূরে পারো...'

'কিন্তু কেন? তুমি কি ঠিক ওই সময় বোমাটা ফাটিয়ে জুসাইওকে উড়িয়ে দিতে চাও?'

'শুধু জুসাইওকে বলছ কেন, তার শিষ্যরা প্রায় সবাই ওখানে থাকবে। আমি আমার বন্ধুদের সাহায্য চাইব। যদি ওরা সময়মত এসে যায়, তাহলে ধরা পড়বে জুসাইও। আর যদি ওরা পৌঁছতে না পারে, তাহলে মরতে হবে ওদের।'

'এই প্ল্যান তোমাকে বদলাতে হতে পারে, রানা,' রুদ্ধশ্বাসে বলল শিরি। 'কারণ লুকাস আংকেল বিদায় নেয়ার সময় বাবাকে ওরা টেনেহিঁচড়ে এয়ারস্ট্রিপে নিয়ে আসতে পারে। অন্তত এর

আগেরবার এনেছিল। তখন সত্যিই অসুস্থ ছিল বাবা।’

‘এ-কথা আগে তো বলোনি তুমি!’ রানা হতাশ।

‘প্রসঙ্গটা আগে ওঠেনি, তাই বলিনি।’

‘সেক্ষেত্রে নতুন করে ভাবতে হবে আমাকে,’ বলল রানা।

‘এয়ারস্ট্রিপে তুমি কিভাবে বোমা ফাটাতে চাও?’ জিজ্ঞেস করল শিরি। ‘রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে? বোমাটা ওখানে নিয়ে যাবে কে?’

‘আমি।’

‘তুমি নিয়ে যাবে?’ আঁতকে উঠল শিরি। ‘তুমি নিয়ে গেলে ফাটাবে কে?’

‘আমি নিয়ে যাব, আমিই ফাটাব,’ বলল রানা। ‘এর বেশি কিছু জানতে চেয়ো না। এমনিতেই অনেক বেশি বলা হয়ে গেছে তোমাকে।’

‘রানা, তুমি কি আত্মহত্যা করার কথা ভাবছ?’

‘দূর পাগল! আত্মহত্যা করলে তোমার সঙ্গে প্রেম করবে কে! এ প্রসঙ্গে আর কোন প্রশ্ন নয়, প্লীজ। আচ্ছা, কোনও কৌশলে তোমার এয়ারস্ট্রিপে যাওয়াটা বন্ধ করা যায় না?’

‘কি জানি, মনে হয় না। আমিও অসুস্থ হয়ে পড়েছি সেটা জুসাইও বিশ্বাস করবে না। তবু, ঠিক আছে, চেষ্টা করব,’ বলল শিরি। ‘কিন্তু যদি সফল না হই? তখন কি হবে? ধরো এয়ারস্ট্রিপে যেতে বাধ্য হলাম আমরা, কিন্তু এক সুযোগে আমি সরে আসতে পারলাম, কিন্তু বাবা রয়ে গেল, তখন তুমি কি করবে?’

‘সেটা তুমি আমার ওপর ছেড়ে দাও,’ বলল রানা। ‘যা করার বুঝে শুনেই করব আমি। যদি দেখি তোমার বাবা ওদের সঙ্গে আছেন, বোমাটা আমি ফাটাব না। ভাল কথা, আমার একটা তথ্য দরকার।’

‘কি তথ্য?’

‘তুমি বলেছ সিজার লীয়ার জেটের নিয়মিত পাইলট নয়,’ বলল রানা। ‘সে ছাড়া আর কে চালায়?’

‘কখনও কিম উন, কখনও লী সুং। কেন?’

‘ওরা কি হেলিকপ্টারও চালাতে জানে? চালাতে কখনও দেখেছ?’

‘কিম উনই তো জুসাইওর প্রাইভেট হেলিকপ্টারটা চালায়। তবে সুং-এর কথা বলতে পারব না।’

‘ধন্যবাদ, শিরি।’ রিস্টওয়াচের ফস্‌ফরেসেন্ট ডায়ালে চোখ রাখল রানা। ‘আটটা দশ। তুমি নামবে কখন?’

‘দেরি আছে, দশটার দিকে। কেন?’

‘তুমি দরজা খুলে দেখো করিডরে কেউ আছে কিনা, আমি একটু বেরুব।’ শিরির ঠোঁটে একটা আঙুল চেপে ধরল রানা। ‘লক্ষ্মীটি, কোন প্রশ্ন নয়। আমি বেরিয়ে গেলেই তুমি দরজা বন্ধ করে দেবে। ফিরতে খুব বেশি হলে আধ ঘণ্টা লাগবে আমার। তিনবার নক করব, কেমন?’ অন্ধকারে হাতড়ে বিছানা থেকে বোমাসহ চেরা ব্রিফকেস, রিমোট কন্ট্রোল, সিগনাল রিসিভিং মেকানিজমের উপকরণ ইত্যাদি তুলে নিল।

আধ ঘণ্টা মানে ত্রিশ মিনিট, অথচ শিরির মনে হচ্ছে ত্রিশ ঘণ্টা। রানা চলে যাবার পর বিশ মিনিট চুপচাপ অন্ধকারে বসে থাকল সে, বাকি দশ মিনিট পায়চারি করে কাটিয়ে দিল।

আধ ঘণ্টা পার হলো। তারপর চল্লিশ মিনিট। এক সময় এক ঘণ্টা। রানা ফিরল না।

মুখে হাত চাপা দিয়ে কাঁদতে শুরু করল শিরি। ওর মন বলছে, কোনদিনই আর ফিরবে না দুঃসাহসী লোকটা।

শিরির স্যুইট থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ছ'তলায় উঠল রানা। ল্যাপটপটা ব্যবহার করার জন্যে নিজের স্যুইটে ফিরতে হবে ওকে। আর সিজারের কামরায় ঢুঁ মারতে হবে অতিরিক্ত একটা ব্রিফকেসের খোঁজে।

সামনে পড়ল ৭২১ নম্বর কামরা। এই কামরার তালা চাবি ছাড়া আগেও একবার খুলেছে রানা, দ্বিতীয়বার খুলতে প্রথমবারের চেয়ে কয়েক সেকেন্ড কম সময় লাগল। ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করল। পেন্সিল টর্চ জ্বালা মাত্র চোখের সামনে সমাধানটা দেখতে পেল–বিছানার ওপর পাশাপাশি দুটো ব্রিফকেস পড়ে রয়েছে। একই রঙ, একই আকৃতি। দুটোরই তালা খোলা, ভেতরে কিছু নেই।

সিজারের একটা ব্রিফকেসে বোমাটা ভরল রানা, ভরার পর ওটার সঙ্গে সিগনাল রিসিভিং মেকানিজম জোড়া লাগাল। এখন এটা জ্যান্ত বোমা, রিমোট কন্ট্রোলের নির্দিষ্ট একটা বোতামে চাপ লাগলেই বিস্ফোরিত হবে। সেরকম যদি কিছু ঘটে, সাততলা এই হোটেল পুরোটাই সম্ভবত ধুলোর সঙ্গে মিশে যাবে। রিমোটের একটা বোতামে চাপ দিয়ে যন্ত্রটাকে 'অফ' করে রাখল রানা, যাতে কোন দুর্ঘটনা না ঘটে।

সিজারের কামরা থেকে বেরিয়ে এল রানা। করিডর ফাঁকা নয়, সিঁড়ির দিকে তরুণ এক দম্পতি হেঁটে যাচ্ছে। তবে পিছন ফিরে তারা তাকালই না।

নিজের স্যুইটের দরজা চাবি দিয়েই খুলল রানা। ভেতরে ঢুকে অন্ধকারে পথ চিনে বেডরূমের দিকে এগোচ্ছে, দুই বগলের নিচে দুটো ব্রিফকেস।

খুট!

আওয়াজটা বোমার মতই আঘাত করল কানে। সেই সঙ্গে চোখ কানা করে দিল আলোর বন্যা। 'হ্যান্ডস আপ, রানা!' কিম

উনের গলা, চেষ্টা করেও উল্লাস গোপন রাখতে পারল না। 'কোন রকম চালাকি নয়, ধীরে ধীরে সাবধানে ঘোরো।'

রানা মাথার ওপর হাত তোলেনি, তবে ধীরে ধীরে ঘুরল। 'হাই!' কে বলবে হাসিটা স্বতঃস্ফূর্ত নয়! উনের মাথায় সাদা ব্যান্ডেজ দেখে আরও চওড়া হলো হাসিটা।

সতর্ক হয়ে গেল উন। 'বগলে কি ওগুলো? যাই হোক, ওই ওটার ওপর নামিয়ে রাখো।' সিটিংরূমে রয়েছে ওরা, হাতের পিস্তল নেড়ে সোফাটা দেখাল।

খালি ব্রিফকেসটা বগল থেকে ছেড়ে দিল রানা। পায়ের পাশে কার্পেটে পড়ল সেটা। পা দিয়ে উল্টে দিতে কাটাটুকু দেখতে পেল উন। 'বলতে পারবে, কি ছিল এটায়?'

কি যেন বলতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল উন, তারপর বলল, 'কোনও চালাকি নয়, রানা। এবার দ্বিতীয় কেসটাও নামাও, তারপর মাথার ওপর হাত তোলো।'

'তুমি কি জানো, লুকাস ডেভেনপোর্টের প্লেন বোমা ফাটিয়ে উড়িয়ে দেয়া হবে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'আর যদি একটাও কথা বলো, আমি গুলি করব!' রানা ভয় পাচ্ছে না দেখে উন আতঙ্কিত।

বগল থেকে হাতে নিল রানা ব্রিফকেসটা। দু'হাতে বুকের কাছে ধরে আছে। 'করো গুলি। দু'জনেই মারা যাই।'

উনের চোখ এক চুল বড় হলো।

আবার হাসল রানা। 'হ্যাঁ, উন, আমার হাতে সিজারের বোমা। ছেড়ে দিলেই ফাটবে।'

উনের হাতে রিভলভার নড়ে উঠল, রানার বুক বাদ দিয়ে হাঁটুর ওপর তাক করল সেটা। গুলি করবেই, বুঝতে পেরে ব্রিফকেসটা তার দিকে ছুঁড়ে দিল রানা।

একেবারে শেষ মুহূর্তে বোমাতঙ্ক পরাস্ত করল উনকে। ব্রিফকেসটাকে এড়াবার জন্যে লাফ দিল সে, ঠিক যেদিকে লাফ দিয়েছে রানাও। পর পর চারটে ঘুসি আর তিনটা লাথি খেয়ে দেয়ালে ছিটকে পড়ল উন, কার্পেটে হাঁটু গেড়ে সিধে হবার সময় দেখল রানার হাতে বেরিয়ে এসেছে পিস্তল, নিজের অস্ত্র পড়ে রয়েছে নাগালের বাইরে।

আঘাতটা আসছে দেখে চোখ বুজল উন। থ্যাচ করে যে আওয়াজটা হলো সেটা তার শুনতে পাওয়ার কথা নয়। ব্যান্ডেজ থাকলেও, মাত্র কয়েক ঘণ্টার পুরনো ক্ষতে দ্বিতীয়বার কেউ যদি গায়ের জোরে মারে, জ্ঞান হারানোটা তার জন্যে আশীর্বাদ।

ব্রিফকেসটা রানা হিসাব করেই ছুঁড়েছিল। উনের গায়ে না লাগলে যেখানে পড়ার কথা সেখানেই পড়েছে–সোফার নরম ফোমে।

খুব যত্ন করে উনের কাপড় খুলল রানা। বুদ্ধিটা মগজে আসায় লজ্জার মাথা খেয়ে বেহায়ার মত নিজের খানিকটা প্রশংসাও করল মনে মনে। ব্রিফকেস থেকে সিগনাল রিসিভিং মেকানিজম সহ বোমাটা বের করে উনের পেটে বসাল ও। বেডকাভার ছিঁড়ে আগেই কয়েকটা লম্বা ফালি তৈরি করেছে, সেই ফালি পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে পেটের সঙ্গে ভাল করে বাঁধল বোমাটা। তারপর আবার তাকে কাপড় পরাল। তার জ্ঞান ফিরতে এখনও দেরি আছে ভেবে জরুরী কাজটা সেরে নিতে চাইল রানা। ল্যাপটপটা খুঁজছে, দেখল নড়ে উঠল উন। তাড়াতাড়ি তার হাত দুটো পিছমোড়া করে বাঁধল ও।

রানার মনে আছে ল্যাপটপটা ব্যাগেই রেখেছিল, অথচ সেটা পাওয়া গেল মিনি কিচেনের একটা টেবিলে। পাসওয়ার্ড টাইপ করে ইন্টারনেটের সংযোগ নিল রানা, তারপর দা টাইমস-এর

ওঅর করেসপন্ডেন্ট রবসনকে একটা মেসেজ পাঠাল: 'জরুরী! জরুরী! জরুরী! সিআইএ আর এফবিআইকে বিশ্বাস কোরো না, কারণ ওদের অনেক অফিসার পচে গেছে। তুমি সরাসরি নুমা হেডকোয়ার্টার, ওয়াশিংটন ডি.সি.-র সঙ্গে যোগাযোগ করো। প্রাইভেট লাইনের নম্বর দিচ্ছি, নুমার ডিরেক্টর অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনকে চাইবে। তাঁকে না পাওয়া গেলে কম্পিউটর সেকশনের চীফ ল্যারি কিং কিংবা অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর জর্জ রেডক্লিফকে চাইবে। বলবে, মাসুদ রানা খুব বিপদে আছে, তার জরুরী সাহায্য দরকার। সাহায্য মানে যথেষ্ট ফায়ারপাওয়ার, প্রচুর সশস্ত্র লোকজন। লেটিসের ব্ল্যাকহোলে নির্মাণাধীন দুটো হোটেল কমপ্লেক্সে যে কংক্রিট পিলার আছে ওগুলো আসলে দানব ট্রিপলহেডারের বাসা। লুকাস ইনে বিজ্ঞানীরা বন্দী, সৈয়দ মনিরুল হক সহ। মি. ডেভেনপোর্ট এর সঙ্গে জড়িত নন। কালপ্রিট হলো তাঁর ম্যানেজার সেল সি সা জুসাইও।'

পাল্টা কোন মেসেজ এল না। তারমানে নিজের কম্পিউটরের সামনে এই মুহূর্তে নেই রবসন। অবশ্য পাসওয়ার্ড দিয়ে ইন্টারনেট ওপেন করলেই মেসেজটা পেয়ে যাবে সে। তবে চিন্তার কথা হলো, কখন সে কম্পিউটরের সামনে আসবে রানার তা জানা নেই।

জ্ঞান আগেই ফিরে পেয়েছে উন, ইতিমধ্যে পরিস্থিতি সম্পর্কে খানিকটা ধারণাও পেয়ে গেছে। রানা তাকে শার্ট তুলে প্রথমে বোমাটা দেখাল, তারপর রিমোট কন্ট্রোলটা, সবশেষে বলল, 'কাল সকালে তুমি আমাকে জুসাইওর কাছে পৌঁছে দেবে। যদি পারো ছ'টা পর্যন্ত ঘুমাও।'

উন সম্পূর্ণ শান্ত। মৃত্যুর নিকটতম সান্নিধ্যে পৌঁছে তার মাথা অন্য যে-কোন সময়ের চেয়ে ভাল কাজ করছে। 'সবাই ধরে

নিয়েছে তোমার দ্বিতীয় মৃত্যু হয়েছে। একমাত্র আমারই সন্দেহ ছিল তুমি বেঁচে আছ। বস্ মানা করেছিলেন, তবু আমি এখানে লুকিয়ে অপেক্ষা করছিলাম। রাত বারোটার মধ্যে না ফিরলে লোকজন আমাকে খুঁজতে আসবে।'

'সেক্ষেত্রে বারোটার দিকে রওনা হব আমরা।'

'কোথায় যাব?' জানতে চাইল উন।

'লুকাস ইনে।'

'গার্ডরা আমার সঙ্গে তোমাকে দেখলে প্রশ্ন করবে। কি জবাব দেব আমি?'

'আমার কাছে সাদা আলখেল্লা আছে, পরলে মনে হবে সৌদি প্রিন্স, চেহারাও ভালভাবে দেখা যাবে না। গার্ডদের তুমি বলবে আমি ট্রিপলহেডারের একজন সম্ভাব্য ক্রেতা, জুসাইওর সঙ্গে আলাপ করতে চাই।'

'অত রাতে? গার্ডরা জানে বস্ এগারোটায় ঘুমাতে যান।'

'সেক্ষেত্রে বলবে, আমি তোমার মেহমান হয়েছি, রাতটা তোমার রুমেই কাটাব।'

'বোমাটা ফাটলে তুমিও মারা যাবে,' বলল উন। 'আমি যদি তোমার নির্দেশ মত কাজ না করে গার্ডদের আসল কথাটা বলে দিই?'

'গার্ডরা তখন তোমার বিরুদ্ধে চলে যাবে।' রানা হাসছে। 'কারণ বোমা ফাটলে তারাও কেউ বাঁচবে না।'

'কিন্তু তুমিও মারা যাবে।'

'জানি। তবে না-ও মরতে পারি। 'রিমোট কন্ট্রোলটা দেখাল রানা। 'এতে টাইম ডিলে বাটন আছে। ওই বাটনে তিনবার চাপ দিলে পনেরো সেকেন্ড পর বোমাটা ফাটবে। পনেরো সেকেন্ডে অনেক দূর সরে যাওয়া যায়। কিন্তু বোমাটা এমনভাবে বাঁধা

হয়েছে, খুলতে দশ মিনিট লাগবে তোমার।'

কিছুক্ষণ আর কিছু বলল না উন। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি। যদি পারো জানে মেরো না, প্লীজ।'

'আসলে তুমি বেঁচে থাকতে চাও না,' বলল রানা। 'কারণ বেঁচে থাকলে মৃত্যুর চেয়ে অনেক বেশি কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে তোমাকে। মার্কিন সেনাবাহিনীর ইন্টারোগেশন টীম আগুনে ফেলে একটু একটু করে অন্তত একশোবার পোড়াবে তোমাকে।'

'কিন্তু আমি যদি রাজসাক্ষী হই?'

গম্ভীর হলো রানা। 'হ্যাঁ, তাহলে হয়তো তোমাকে ক্ষমা করার প্রস্তাবটা বিবেচনা করা যায়।'

'ধন্যবাদ, রানা।'

'তবে আমি তোমাকে কোন কথা দিচ্ছি না। আমাকে হিসাব করে দেখতে হবে তোমাকে বাঁচিয়ে রাখাটা আমার জন্যে লাভজনক কিনা। তোমার আচরণের ওপরও অনেক কিছু নির্ভর করবে।'

দুশ্চিন্তাটা মন থেকে রানা তাড়াতে পারছে না। সময় মত নুমার সাহায্য আসবে তো? ও খুব ভাল করেই জানে গণহত্যা না করে একার চেষ্টায় এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার সত্যি কোন উপায় নেই।

পনেরো

সকাল ছ'টায় ঘুম ভাঙল জুসাইওর। দু'জন কোরিয়ান তরুণী বাথটাবে শুইয়ে গোসল করাল তাকে। আধ ঘণ্টা পর টেবিলে বসল সে, গোলমরিচের গুঁড়ো দিয়ে চারটে সেদ্ধ ডিম খেল, সেই সাথে এক কাপ কফি। টেবিলের ওপরই রাখা হয়েছে খাঁচাটা, সেটার ভেতর দুধ ভর্তি একটা পেয়ালা ঢোকাল সে। কালো সাপটা দুধ খেলো কি খেলো না, তাকে ধরে খাঁচা থেকে বের করে গলায় জড়াল জুসাইও। ইতিমধ্যে একজন গার্ডকে পাঠানো হয়েছিল কিম উনকে ডেকে আনার জন্যে, একটু পরই গার্ডের পিছন পিছন হাজির হলো উন।

উন তার পেটটা দু'হাতে চেপে ধরে আছে। সেটা খেয়াল না করে জুসাইও হাসল। 'আজ থেকে আমরা স্বাধীন এবং সব কিছুর মালিক হয়ে যাচ্ছি। একবার বলা হয়েছে, তবু ইনার সার্কেলের সবাইকে আরেকবার বলে দাও মি. ডেভেনপোর্টকে শেষ বিদায় জানাবার জন্যে ঠিক সাতটায় এয়ারস্ট্রিপে হাজির থাকতে হবে। আর, হ্যাঁ, যারা ট্রিপলহেডার বায়না করেছে তারাও ওখানে থাকবে। আমার ক্ষমতা সম্পর্কে খানিকটা আঁচ পাক তারা।'

'বস্!' চোখ-মুখ বিকৃত করল উন! 'আমার রক্ত-আমাশা!'

'রক্ত-আমাশা! তাহলে তুমি আমার সামনে এলে কোন বুদ্ধিতে। ওটা তো ছোঁয়াচে!'

‘আমি তাহলে যাই...’

‘যাই মানে? দৌড়াও!’ খেঁকিয়ে উঠল জুসাইও। দুই তরুণীর দিকে তাকাল সে। ‘জলদি ঘরের মেঝেটা ডেটল দিয়ে ধুয়ে ফেলো।’

ব্যথায় কাতরাতে কাতরাতে নিজের কামরায় ফিরে এল উন। সব মিলিয়ে তার সময় লেগেছে চার মিনিট। রানা তাকে পাঁচ মিনিট বরাদ্দ করেছিল। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে না ফিরলে বোমাটা ফাটিয়ে দেয়ার হুমকি ছিল।

সারারাত না ঘুমিয়ে অন্ধকার ঘরে পায়চারি করে কাটাল শিরি। নাচ শেষ করে বারোটার কিছু পরে স্যুইটে ফিরেছে সে, ফিরেও রানাকে দেখতে পায়নি। তবে তার অনুপস্থিতিতে রানা যে স্যুইটে ঢুকেছিল তার অন্তত দুটো প্রমাণ দেখতে পেল ও। এক, তলা কাটা একটা ব্রিফকেস পড়ে আছে বিছানার ওপর। দুই, সাদা আলখেল্লাটা কার্পেটের তলা থেকে গায়েব হয়ে গেছে।

সকাল ছ'টায় নক হলো দরজায়। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল শিরি, ‘কে?’

‘আমি সিজার, ফারাহ। দরজা খোলো।’

দরজা খুলল শিরি, তবে পথ ছাড়ল না। ‘কি ব্যাপার?’

‘বস্ পাঠালেন। সাতটার কিছু আগে সবার সঙ্গে তোমাকেও লুকাস ইন থেকে এয়ারস্ট্রিপে যেতে হবে।’

‘কেন?’ শিরি কিছু না জানার ভান করল।

‘বস্ তা আমাকে বলেননি। তবে জানি ঠিক সাতটায় মি. ডেভেনপোর্টের প্লেন টেকঅফ করবে।’

‘কিন্তু আমার শরীরটা যে খুব খারাপ করছে?’

‘শরীর খারাপ করলে চলবে না, ফারাহ। হুকুম!’

‘আচ্ছা, ঠিক আছে।’

সিজার চলে যেতে দরজা বন্ধ করে দিল শিরি। কবাটে পিঠ ঠেকিয়ে প্রবল উত্তেজনা নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করছে। রানা কি কি করতে বলে গেছে ভোলেনি ও। কিন্তু আসলে কি ঘটতে চলেছে জানে না। তবে ভাগ্য ভাল, লুকাস ইনে যাবার একটা সুযোগ পাওয়া গেছে। বাবার সঙ্গে দেখা করার এটাই হয়তো ওর শেষ সুযোগ। হাত ব্যাগটা নিয়ে স্যুইট থেকে বেরিয়ে পড়ল ও।

ছ’টা পনেরো মিনিটে এয়ারস্ট্রিপে পৌঁছাল ক্যারলিন। লুকাস ইনের একদল পোর্টার রয়েছে তার সঙ্গে, লুকাস ডেভেনপোর্টের লাগেজ প্লেনে তুলে দিতে এসেছে তারা। ক্যারলিনের হাতে একটা ব্রিফকেস দেখা যাচ্ছে।

লুকাস ডেভেনপোর্টের প্রাইভেট প্লেন বারো সীটের একটা অ্যাপাচি। পাইলট থেকে শুরু করে ক্রুরা সবাই ক্যারলিনকে চেনে। প্রতিবারের মত এবারও হোল্ডে লাগেজ তোলার কাজটা তদারক করতে এসেছে সে। স্টুয়ার্ডরা হ্যান্ডশেক করল তার সাথে, তাদের গালে নিজের রাঙা ঠোঁট ছোঁয়াল ক্যারলিন। হোল্ডে লাগেজ তোলা শেষ হতে প্লেনে বসে পাইলটের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিল সে। গল্পের ফাঁকে হাতব্যাগ খুলে রিমোট কন্ট্রোলটা একবার দেখে নিল।

ছ’টা পঞ্চাশ মিনিট। গেট দিয়ে এয়ারস্ট্রিপে ঢুকল তিনটে ক্যাডিলাক ও একটা মার্সিডিজ। ক্যাডিলাকে ইনার সার্কেলের বাদামী সুট পরা সদস্যরা রয়েছে, তাদের পাশে বসেছে আমান মোহাম্মদ সহ আরও কয়েকজন ক্রেতা।

মার্সিডিজে রয়েছেন লুকাস ডেভেনপোর্ট। তাঁর পাশে গেরুয়া বসনে আবৃত হয়ে বসে রয়েছে জুসাইও, মালিকের কি একটা

কথায় দুলে দুলে হাসছে।

প্লেনের পাশেই থামল মার্সিডিজ। তিনটে ক্যাডিলাক প্লেনের আরেক দিকে থামল। ওগুলো থেকে নিচে নামল শুধু ইনার সার্কেলের সদস্যরা। প্লেনটাকে ঘুরে মার্সিডিজের দিকে হেঁটে যাচ্ছে তারা। পালা করে সবার সঙ্গেই হ্যান্ডশেক করছেন লুকাস ডেভেনপোর্ট।

লুকাস বললেন, 'কি ব্যাপার, জুসাইও? আমার প্রিয় বন্ধু সৈয়দ হককে দেখছি না যে?'

'ওহ্-হো, আপনাকে বলা হয়নি, স্যার!' হাত কচলে বলল জুসাইও। 'মি. হক দুঃখ প্রকাশ করে বলেছেন হঠাৎ তাঁর শরীর খারাপ হওয়ায়...'

'কাল অত রাত পর্যন্ত সবাই মিলে গল্প করলাম। তখন তো দিব্যি সুস্থ ছিল...'

'আজ সকাল থেকে শুরু হয়েছে, স্যার।'

'ওকে আমার কথা বলবে—এর পরের বার এসে যেন ট্রিপলহেডার দেখতে পাই।'

'ইয়েস, স্যার!'

লুকাস ডেভেনপোর্ট সিঁড়ি বেয়ে প্লেনে উঠছেন, এই সময় ক্যারলিনকে নেমে আসতে দেখা গেল। ডেভেনপোর্ট তার সঙ্গেও করমর্দন করলেন।

প্লেনের দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

এয়ারস্ট্রিপের এক ধারে সরে এল সবাই, সবার মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে জুসাইও। ট্রিপলহেডারের সাত ক্রেতা এতক্ষণে গাড়ি থেকে নেমে সেদিকে এগোল।

রানওয়ে ধরে ছুটছে প্লেন। লীয়ার জেট একপাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে, সেটাকে পাশ কাটাল অ্যাপাচি। হাত দুটো এক করে

ঘষতে ঘষতে ক্যারলিনের দিকে তাকাল জুসাইও।

হ্যান্ডব্যাগ খুলে ভেতর থেকে প্লাস্টিকের একটা বাক্স বের করল ক্যারলিন। 'স্যার, মি. জুসাইও,' আবদারের সুরে বলল সে, 'আমি ভেবেছিলাম বোমাটা ফারাহকে দিয়ে কাটাব। কিন্তু সে যখন আসেনি, রিমোট কন্ট্রোলের বোতামে চাপটা আমি দিই?'

'হারামজাদী, বলিস কি!' প্রায় বিস্ফোরিত হলো জুসাইও। 'এতবড় আনন্দ থেকে তুই আমাকে বঞ্চিত করতে চাস? দে!' বাক্সটা ক্যারলিনের হাত থেকে কেড়ে নিল সে।

এয়ারস্ট্রিপ থেকে শূন্যে উঠল প্লেন। সামনেই সাগর।

রিমোট কন্ট্রোল বের করে বাক্সটা ফেলে দিল জুসাইও। হাতটা প্লেনের দিকে লম্বা করল সে, তারপর সহাস্যে উচ্চারণ করল, 'বুম!' পরমুহূর্তে চাপ দিল লাল বোতামটায়।

এক এক করে তিন সেকেন্ড পার হলো। কিছুই ঘটছে না। বোতামটায় আবার চাপ দিল জুসাইও। একবার, দু'বার, তিনবার–দিতেই থাকল।

কিন্তু প্লেন ক্রমশ দূরে চলে যাচ্ছে। কিছুই ঘটছে না।

তারপর শোনা গেল প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ। শুধু শব্দ নয়, শব্দের সঙ্গে থরথর করে কেঁপে উঠল গোটা লেটিস।

ষোলো

প্রথমে মনে হলো ব্ল্যাকহোলের ওপর আকাশে কালো মেঘ জমেছে, মেঘের পেট থেকে প্রসব হচ্ছে লম্বা ও কালো বজ্র।

সবাই একযোগে ঘুরে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছে ওদিকে। চোখের ভ্রম দূর হতে দু'তিন সেকেন্ডের বেশি লাগল না। মেঘ নয়! মেঘের গায়ে কি 'নুমা–স্পেশাল ফোর্স' লেখা থাকে? ওগুলো এক ঝাঁক হেলিকপ্টার গানশিপ। ব্ল্যাকহোলের ছোট্ট সৈকতে একসঙ্গে দশটা হাজার পাউন্ডের বোমা ফেলে জানান দিল ওদের উপস্থিতি।

'আমার হেলিকপ্টার!' হুঙ্কার ছাড়ল জুসাইও। 'কে চালাচ্ছে ওটা? জলদি...'

লুকাস ইনের ছাদ থেকে আকাশে উঠল জুসাইওর হেলিকপ্টার। দ্রুত এয়ারস্ট্রিপের দিকে ছুটে আসছে!

'আমাদের কি হবে?' লী সুং জানতে চাইল। তার দেখাদেখি জুসাইওর দিকে এগিয়ে এল ইনার সার্কেলের সাত সদস্য, ক্যারলিন সহ। এমনকি ট্রিপলহেডারের সাত ক্রেতাও ঘিরে ধরল তাকে। সবাই একযোগে কথা বলছে, ফলে কারও কথাই বোঝা যাচ্ছে না।

বাঘের মত গর্জে উঠল জুসাইও। 'সবাই চুপ! মনে রেখো, আমি বাঁচলে তোমরা বাঁচবে। কেউ একজন বেঈমানী করেছে। লুকাস তো মরলই না, বেদখল হয়ে যাচ্ছে এখন আমাদের ব্ল্যাক

হোল। কিন্তু ট্রিপলহেডার আবার বানাব আমরা!' কটমট করে চাইল সবার দিকে। 'শুধু তাই নয়, আমেরিকাকে আমরা একহাত দেখে নেব। তোমরা মেহমানদের নিয়ে আন্ডারগ্রাউন্ডে গা ঢাকা দাও। তারপর সুযোগ মত পালিয়ে যেয়ো।' আকাশে তাকিয়ে হেলিকপ্টারের উদ্দেশ্যে হাত নাড়ল সে, পাইলটকে নিচে নামার নির্দেশ দিচ্ছে।

জুসাইওর কপ্টারে পাইলটের আসনে বসে রয়েছে রানা। খোলা দরজার সামনে হাত-পা বাধা অবস্থায় কিম উনকে ফেলে রেখেছে ও। 'এখনও সময় আছে, উন। জুসাইওর অ্যাকাউন্ট নম্বরটা বলে ফেলো।'

'দেখো,' বলল উন, 'আমি সরল মনে স্বীকার করেছি অ্যাকাউন্ট নম্বরটা আমি জানি। কিন্তু...,' কথা শেষ না করে হাঁপাচ্ছে সে, আসলে রানার অজান্তে হাতের বাঁধন খোলার চেষ্টা করছে।

'শুধু নম্বরটা জানো? ওই অ্যাকাউন্টের টাকা তুমি তুলতেও পারবে–জুসাইওর অবর্তমানে।'

'কিন্তু, রানা, ওই টাকা আমি যদি ভোগ করতে না পারি, তাহলে আমার বেঁচে থাকার কোন মানে হয় না। প্লীজ, ভাই! আমি কথা দিচ্ছি জেল থেকে ছাড়া পেয়ে তোমাকে আমি অর্ধেক ভাগ দেব...'

'এই তোমার শেষ কথা?' রানা দেখল নিচে যারা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে তাদের মধ্যে শিরি বা মনিরুল হক নেই।

'প্লীজ, রানা! অর্ধেক মানে কয়েকশো মিলিয়ন ডলার...'

ঘুরে বসে উনকে ঝেড়ে একটা লাথি মারল রানা। খোলা দরজার মুখে চলে গেল সে। আরেকটা ধাক্কা খেলেই খসে পড়বে নিচে। হামাগুড়ি দিয়ে সরে যাচ্ছে এখন দরজার কাছ থেকে।

নুমার একটা হেলিকপ্টার গানশিপ থেকে ল্যারি কিং রানাকে বলল, ‘হাই, রানা! এমন জরুরী মেসেজ পাঠিয়েছ, কম্পিউটর ছেড়ে যোদ্ধাদের সঙ্গে আমিও না এসে পারলাম না। সত্যি, রানা? এই দ্বীপে পিলারের ভেতর সত্যি মিসাইল আছে?’

হাসল রানা। ‘তোমার সঙ্গে আর কে কে আছে, ল্যারি?’ ওয়ায়্যারলেসের মাউথপীসে কথা বলছে।

‘তোমার শত্রু-বন্ধু আমরা সবাই, পুরো ব্যাচ, দোস্ত,’ এবার ববি মুরল্যান্ডের কণ্ঠস্বর ভেসে এল ওয়ায়্যারলেসে। ‘গোটা ব্যাপারটা হেডকোয়ার্টার থেকে মনিটর করছেন অ্যাডমিরাল, নেতৃত্ব দিচ্ছেন অ্যাসিসট্যান্ট ডিরেক্টর জর্জ রেডক্লিফ।

‘তোমাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ,’ বলল রানা। ‘এয়ারস্ট্রিপেই বেশিরভাগ কালপ্রিট দাঁড়িয়ে আছে, বুঝলে? সবাইকে অ্যারেস্ট করতে হবে, একজনও যাতে পালাতে না পারে। তবে আমার সঙ্গে একটা ‘হিউম্যান বম্’ আছে, কাজেই হুট করে কেউ কাছাকাছি চলে এসো না। আগে আমি ল্যান্ড করি, তারপর তোমরা...’

তড়াক করে লাফ দিয়ে সিধে হলো উন, হাত বাড়িয়ে হ্যাঁচকা টানে হেড গিয়ার সহ ওয়ায়্যারলেসের মাউথপীসটা কেড়ে নিল, তারপর ভাঁজ করা হাত দিয়ে পিছন থেকে রানার গলাটা পেঁচিয়ে ধরল। ‘রিমোট কন্ট্রোল! কোথায় সেটা?’

অকস্মাৎ ঝাঁকি খাওয়ায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলল রানা, হেলিকপ্টার গোত্তা খেয়ে নিচে নামছে। ওর দুই হাত ব্যস্ত হয়ে উঠল, দ্রুত আবার সোজা করল ’কপ্টারের নাক। ইতিমধ্যে ওর বেল্ট থেকে ওয়ালথারটা বের করে নিয়েছে উন, এই মুহূর্তে জ্যাকেটের পকেটে হাত ভরে রিমোট কন্ট্রোল ডিভাইসটাও বের করে নিচ্ছে। ‘আমি ভেবেছিলাম তুমি রাজসাক্ষী হতে চাও,’ শান্ত

গলায় বলল রানা, ওর গলা ছেড়ে দিয়ে পিস্তলটা মাথায় ঠেকিয়ে রেখেছে উন। 'তা তোমার প্ল্যানটা কি, উন? কি ভাবছ? এতগুলো হেলিকপ্টার গানশিপকে ফাঁকি দিয়ে তুমি কি পালাতে পারবে?'

'তোমাকে জিম্মি করা হয়েছে শুনলে গানশিপ থেকে আমাদের হেলিকপ্টারকে ওরা গুলিও করবে না, পিছুও নেবে না,' বলল উন। 'এখন আমার প্রতিটা নির্দেশ পালন করতে হবে তোমাকে। ওরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, ওদের কাছাকাছি ল্যান্ড করো, রানা। মি. জুসাইওকে আমরা 'কপ্টারে তুলে নেব।'

নিচের জটলা থেকে অনেক দূরে চলে এসেছে ওরা। বাঁক নিয়ে আবার সেদিকে 'কপ্টার ছোটাল রানা।

ওয়ায়্যারলেসের ঝুলন্ত মাউথপীসটা ধরে রানার মুখের সামনে আনল উন। 'তোমার বন্ধুদের জানাও, 'হিউম্যান-বম্'-এর হাতে এখন তুমি জিম্মি। গুলি করতে বা পিছু নিতে নিষেধ করো। ওরা কি বলে তা তোমার শোনার দরকার নেই।'

'কিন্তু নিচে ওদেরকে দেখছ? কাছে চলে এসেছি, ল্যান্ড করব না?' জিজ্ঞেস করল রানা, আসলে সময় নিচ্ছে।

'ওদের মাথার ওপর স্থির হও,' বলল উন। 'বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলার পর ল্যান্ড করো।'

উনের এক হাতে পিস্তল, অপরহাতে ওয়ায়্যারলেসের মাউথপীস। রিমোট কন্ট্রোলটা কোথায় রেখেছে, রানা জানে না। জানার জন্যেই ঘাড় ফেরাল ও। 'ধরো, জুসাইওকে নিয়ে পালাতে তোমাকে আমি সাহায্য করলাম। তারপর? আমাকে নিয়ে কি করবে তোমরা? ডিভাইসটা শার্টের বুক পকেটে রেখেছে উন, নীল বীকনসহ মাথার দিকটা পকেটের বাইরে একটু বেরিয়ে আছে।

'আমি তো চাইব এই বোমাটা তোমার পেটে বাঁধা হোক,' হেসে উঠে বলল উন। 'তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন আমার বস্,

মি. জুসাইও।’

জটলার সরাসরি ওপরে হেলিকপ্টার স্থির করল রানা। উন ওর মুখের সামনে আবার ধরল মাউথপীসটা। ‘ববি, আমাকে জিম্মি করা হয়েছে,’ বলল রানা। ‘গুলি করো না। পিছুও নিয়ো না।’ কথা শেষ করেই কন্ট্রোল ছেড়ে দিল রানা, ডান হাতের কনুই চালাল পিছন দিকে, বাম হাত দিয়ে উনের চুল ধরার চেষ্টা করল।

পেটে গুঁতো খেয়ে গুঙিয়ে উঠল উন, সেই সঙ্গে কুঁজো হয়ে গেল। রানা তার চুল ধরে মাথাটা সীটের হাতলের সঙ্গে ঠুকে দেয়ার চেষ্টা করছে। তুমুল ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে গেল ছোট্ট জায়গার ভেতর। পিস্তল নিয়ে কাড়াকাড়ি চলছে, কেউ ওটা ছাড়তে রাজি নয়। রানা উনকে মারছে ঠিকই, তবে অত্যন্ত সাবধানে; মারার পর ধরে রাখছে–কারণ জানে, চাপ লেগে রিমোট কন্ট্রোলের সেফটি বাটন অন হয়ে যেতে পারে। তা যদি হয়, এরপর দরকার হবে রেড বাটনে আরেকটা চাপ বা ধাক্কা–ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে ফাটবে ওটা। বোমাটা ফাটলে উন একা বিস্ফোরিত হবে না, রানাকে নিয়ে হেলিকপ্টারও পরিণত হবে অগ্নিকুণ্ডে।

তবে এত সাবধানতা সত্ত্বেও, উনকে রানা ধরে রাখতে পারল না। সম্ভবত ধস্তাধস্তির কারণেই কন্ট্রোলের কোনও লিভারে ধাক্কা লাগল, অমনি সবেগে চরকির মত পাক খেতে শুরু করল হেলিকপ্টার। ছিটকে খোলা দরজার দিকে চলে যাচ্ছে উন, দেখতে পেয়ে হাত বাড়িয়ে ধরার চেষ্টা করল, কিন্তু নাগাল পেল না। দরজার কিনারা থেকে খসে পড়ল সে।

দূরে সরে গিয়ে আবার ফিরে আসছে জুসাইওর হেলিকপ্টার। এবার খুব নিচে দিয়ে আসছে। এসে স্থির হয়ে ভেসে থাকল শূন্যে, ওদের মাথার ওপর। ল্যান্ড করার কোন লক্ষণ নেই।

জুসাইও রাগে হাঁপাচ্ছে। পাইলটের উদ্দেশে ঘুসি ছুঁড়ছে। এই সময় হেলিকপ্টারের খোলা দরজা দিয়ে নিচে খসে পড়ল এক লোক। লোকটা মরেনি। শরীরটা মোচড় খাচ্ছে। ক্যারলিনই সবার আগে চিনতে পারল তাকে। 'মি. উন!'

তার দেখাদেখি ছুটল সবাই। উনকে ঘিরে দাঁড়াল তারা। এক-আধজন উপরে তাকিয়ে দেখল সাঁই-সাঁই করে সোজা ওপরে উঠে যাচ্ছে হেলিকপ্টারটা।

উপুড় হয়ে শুয়ে গোঙাচ্ছে উন, মাথা একটু তুলে উঠে বসার চেষ্টা করছে। কংক্রিটের সঙ্গে ঘষা খাচ্ছে বুক। কথা বলতে পারছে না, চোখ দুটোও বন্ধ। ঘষা খাওয়ায় রিমোট কন্ট্রোলের কয়েকটা বোতামের ওপরই চাপ পড়ল।

মুহূর্তে সবাইকে নিয়ে বিস্ফোরিত হলো কিম উন।

জুসাইওর কপ্টার শেষ পর্যন্ত ল্যান্ড করল। তবে এয়ারস্ট্রিপের একেবারে শেষ প্রান্তে। 'কপ্টার থেকে বেরিয়ে এল রানা। তবে ওকে দেখার জন্যে এয়ারস্ট্রিপে ওরা কেউ বেঁচে নেই।

***

মাসুদ রানা

বাঘের খাঁচা

কাজী আনোয়ার হোসেন

'শেষ পর্যন্ত আল্লাহ যদি মুখ তুলে তাকান, সত্যি যদি ট্রিপলহেডার হাতে পাই, ইনশাল্লাহ আমার প্রথম টার্গেট হবে সাভারের স্মৃতিসৌধ।' ভাষাটা বাংলা, অর্থাৎ কথা বলছে রাজাকারপুত্র আমান মোহাম্মদ। 'আর যেখানে যত ভাস্কর্য ও মূর্তি আছে, সব গুঁড়িয়ে দেব। আমীর হবেন আব্বাজান, বাংলা হবে তালেবান, আর আমি...'
এবার মাসুদ রানার যুদ্ধ দেশী শত্রুর বিরুদ্ধে। রূপকথার সেই রাজপুত্রের মত দানব আর রাক্ষসদের আস্তানায় হানা দিতে হবে ওকে, সব তছনছ করে দিয়ে উদ্ধার করে আনতে হবে রাজকন্যাকে।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
শো-রূম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
শো-রূম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০